পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২ সংখ্যা।] জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৯৫। / [১১ শ খণ্ড।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ৪৮/১১

মনুষ্যজাতির তত্ত্ব।

গত প্রকাশিতের পর।

আমরা দেখিতে পাই ভূমণ্ডলের সকল স্থানেই মনুষ্য বসতি করে। অসহ্য শীতপ্রধান দেশ, অতি উষ্ণদেশ, নাতি শীতোষ্ণ প্রদেশ, সকল স্থানেই মানুষের বাস। যেখানে এত শীত যে জল বরফ হইয়া যায়, তুষার বর্ষণ হয়, উপর হইতে বৎসরের ছয় মাস সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, সেখানেও মানুষ আছে, আবার যেখানে অসহ্য সূর্য্যোত্তাপ মরুভূমি অনাবৃষ্টি সেখানেও মনুষ্যের বসতি। দেশের প্রকৃতি ভেদে অবস্থার তারতম্যে মনুষ্যেরও আকৃতি প্রকৃতির নানা প্রভেদ দেখা যায়। এক এক দেশের এক এক জাতির স্বভাব এক এক রূপের।

যদি ইংরাজজাতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বীপনিবাসী না হইত, এত ভ্রমণশীল এবং বাণিজ্যপ্রিয় কখনও হইত না। তাহাদের দেশে যদি কয়লা, লৌহ ইত্যাদি এত প্রকারের খনিজ পদার্থ উৎপন্ন না হইত, এত প্রকারের যন্ত্র কল সেখানে সৃষ্টি হইত কি না সন্দেহ। তাহাদের দেশের এত উন্নতি সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধি ক্ষমতা অনেকটা দেশের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া স্বভাবতঃ ইংরাজেরা ভ্রমণপ্রিয়। ভ্রমণপ্রিয় বলিয়া বহু দূর দেশে যাতায়াত করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করে, এবং নানা নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, নানা দেশে উপনিবাস স্থাপন করে, নানা দেশ আপনাদের আয়ত্ত করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করে। ককেসিয়ান অথবা শ্বেতাঙ্গ জাতিগণ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল সুশ্রী এবং সভ্য জাতি। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, ইহারাই প্রাচীন কালের আধুনিক সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতম বুদ্ধিমান্ এবং শ্রেষ্ঠ জাতি। সকল বিষয়ে ইহারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ আসিরিয়া প্যালেষ্টাইন, মিসর, ফিনিসীয়া, গ্রীস, রোম ইত্যাদি যে যে দেশ প্রাচীনকালে বিক্রম, বিদ্যা, শিল্প, কৌশল এবং সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে, সেই সকল দেশবাসিগণ ককেসিয়ান। ককেসিয়ানগণ যে দেশে বসতি করিয়াছে, তথাকার আদিমবাসিগণ সেই

দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া গিয়াছে। ককেসিয়ানগণের প্রকৃত এবং উপযুক্ত বাস স্থান পৃথিবীর মধ্যভাগ। বর্ত্তমান কালেও ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মেণি, ফান্স, উত্তর আমেরিকা কানেড়া এবং অন্য অন্য স্থান যেখানে ককেসিয়ানেরা উপনিবাস স্থাপন করিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। ককেসিয়ানগণের দেহ উন্নত, গৌরবর্ণ, ললাট প্রশস্ত, সুগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কেশ ও শ্মশ্রু ঘন কুঞ্চিত ছোট বাদামি ধরণের মুখ, হাঁ ছোট, চক্ষু এবং নাসিকা সুশ্রী। আমাদের দেশীয় বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পারসী, মহারাষ্ট্রীয় এবং ইয়ুরোপীয় সকলেই ও আরব, মিসর দেশীয়েরা ককেসিয়ান শ্রেণীর অন্তর্গত।

মঙ্গোলিয়ানগণ এসিয়ার উত্তর এবং মধ্য ভাগে অবস্থিতি করে। অর্থাৎ চীন, জাপান, বর্ম্মা, শ্যাম, কোচিন চীন ইত্যাদি। ইয়ুরোপের পূর্ব্ব ভাগে তুরস্ক, ফিনল্যাণ্ডে এবং উত্তর মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জেও ইহারা বাস করে। মোগল, তুরস্কীয়, তিব্বতবাসী, চীনবাসী জাপানী, আমেরিকার উত্তরে দ্বীপসমূহের অসভ্য এসকুইমো জাতি ঐ মঙ্গোলিয়ান শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ঈষৎ পীত অথবা পিঙ্গলবর্ণ, ইহাদের কেশ অল্প, অথচ অচিক্কণ এবং সোজা, মস্তক খানিকটা চতুষ্কোণ, শ্মশ্রু কম, মুখ চ্যাপটা, চক্ষু ক্ষুদ্র, কোটরপ্রবিষ্ট, ক্ষুদ্র এবং চ্যাপটা নাসিকা, স্থূল ওষ্ঠ। কপোলের অস্থিদ্বয় উচ্চ। মঙ্গোলিয়ানেরা সচরাচর ককেশিয়ানগণ অপেক্ষা খর্ব্বাকার কিন্তু ইহাদের মধ্যে তুরস্কীয় তাতারদেশীয় এবং চীনদেশীয়গণ উন্নত বলিষ্ঠকায়। এই জাতীয়দের মধ্যে চীন জাপান এবং তুরস্কীয়গণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

আমেরিকানগণ আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আদিম নিবাসী। ১৪৯২ খৃঃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (ঐ সময়ে কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন) সমগ্র আমেরিকায় ইহাদের বসতি ছিল। এই শ্রেণীর লোকদের বর্ণ তাম্র, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, সোজা এবং মোটা মোটা। শ্মশ্রু অল্প, ললাট ক্ষুদ্র, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু চক্ষুর কোণ বাহিরের দিকে, কপালের অস্থি উচ্চ, নাসিকা উন্নত, দেহ দীর্ঘ, কৃশ এবং বলিষ্ঠ, ইহারা অত্যন্ত শ্রমপটু কষ্টসহ এবং শীকার প্রিয়। উত্তর আমেরিকা এখন ককেশিয়ান জাতির নিবাস হইয়া উঠিয়াছে, দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন স্থান এখনও উহাদের অধিকৃত। ইথিয়োপিয়ান বা নিগ্রোজাতি, মিসর আবিসিনিয়া নিউবিয়া টিউনিস্, ট্রিপোলি মরক্কো কেপকলনি ইত্যাদি কয়েকটি স্থান ব্যতীত অফ্রিকার সমুদয় স্থানে বিস্তৃত। ইহারা আবার অনেক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং পরস্পরের সহিত শত্রুতা করে; তাহাদের আচার ব্যাবহার স্বভাব পরস্পর হইতে

বিভিন্ন। ইহারা সাধারণতঃ অতি কৃষ্ণ বর্ণ ইহাদের কেশ কৃষ্ণ, কুঞ্চিত এবং পশমের ন্যায় অতি স্থূল। মস্তক দুই দিকে চাপা, সম্মুখে উচ্চ; ললাট সঙ্কীর্ণ, কপোলের অস্থি অতি উচ্চ। নাসিকা প্রশস্ত চ্যাপটা, দন্ত উচ্চ, ওষ্ঠ অতি স্থূল।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী দীর্ঘাকায় হৃষ্ট পুষ্ট, কেহ বা খর্ব্বাকার ও কৃশ। ইহাদের অবস্থা অসভ্য ও হীন। সেই কারণে উহাদের মধ্যে এক-জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য করে। এবং শ্বেতাঙ্গগণ বহুকাল ইহাদিগের উপর রাজত্ব করে। যেরূপ দেখা যায় তাহাতে বোধ হয় নিগ্রোজাতির সামাজিক এবং মানসিক উন্নতির বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই।

মালয়জাতি প্রধানতঃ প্রশান্ত ও ভারতসাগরের দ্বীপবাসী। তাহারা মালয়োরিয়া অষ্ট্রেলিয়া এবং পলিনেসিয়া ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। স্থান ভেদে ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি পৃথক প্রকার। কেহ মঙ্গোলিয়ানদের সদৃশ। অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ, কেহ অধিক কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের তুল্য। কোন শ্রেণী অধিক সাহসী চতুর ও পরিশ্রমী, কোন শ্রেণী অতি হীন অবস্থায় পতিত। ইহারা আজ পর্য্যন্ত সভ্যতার অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কোন কোন দ্বীপে সভ্য জাতিদের চেষ্টায় ও শিক্ষায় কিছু কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহা অতি অল্প। এইরূপে নানা শ্রেণীর নানা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জাতির মনুষ্য পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যেখানেই প্রাণধারণের উপায় আছে, সেখানেই মনুষ্য অবস্থান করে, এবং ক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। কোথাও বা এক জাতি অপর জাতির সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করে। কোন কোন জাতি পরস্পরের সহিত আদান প্রদান বাণিজ্যব্যবসায় করিয়া দেশের শ্রী বৃদ্ধি সম্পন্ন করে। শ্বেতাঙ্গ জাতিরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। মঙ্গোলিয়ানগণের মধ্যেও চীন জাপান ইত্যাদি কোন কোন জাতি শিল্প বিদ্যাতে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ককেসিয়ানদের অপেক্ষা ইহারা নিকৃষ্ট, এবং অল্প উন্নত। দেশভেদে আহারাদিও স্বতন্ত্র প্রকারের হয়। শীত প্রধানদেশে মাংস প্রধান আহার, গ্রীষ্ম প্রাধান দেশে নিরামিষ প্রধান খাদ্য এবং সমমণ্ডল অর্থাৎ যে সকল স্থানে শীত গ্রীষ্মের প্রাবল্য কম উভয় রূপ খাদ্য প্রচলিত। আমরা দেখিতে পাই দেশভেদে ভাষা আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, আকৃতি, প্রকৃতি, রুচি, বুদ্ধি, বিদ্যা, সকলই স্বতন্ত্র প্রকার হয়। সকলেই সেই এক হস্ত রচিত হইয়াও নানা রূপে নানা ভাবে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সময় ভেদে কোন জাতির পতন, কোন

জাতির উত্থান, শ্রীবৃদ্ধি ও গঠন ; কোন জাতি প্রতাপান্বিত, কোন জাতি হীনবল হইতেছে মনুষ্যজাতির তত্ত্ব অতি বিচিত্র, ইহা আলোচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

রূপকথা।

কোন সময়ে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সাত জন রাণী। কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে তিনি সন্তানবিহীন। এক দিন অতি প্রত্যূষে তিনি বাটীর বাহির হইতেছেন এমন সময় এক জন নীচবংশীয়া স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। সে রাজাকে দেখিবামাত্র মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল এবং আপন মনে বলিতে লাগিল, "ছি, আজ সকাল বেলা অপুত্রক রাজার মুখ দেখিলাম, না জানি আজ দিনটা কি রকমে কাটে" এই কথা রাজার কর্ণে গেল। তাঁহার মনে ভারি ঘৃণা হইল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। পাত্র মিত্র মন্ত্রী সভাসদগণ সকলেই বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, রাজা আর বাহিরে আসেন না। অবশেষে রাজ্ঞীদের কর্ণে এই কথা গেল যে, মহারাজা ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আছেন। তাঁহারা মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্বারে গিয়া তাঁহার অভিমানের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুরোধ অনুনয় বিনয়ের পর রাজা বলিলেন "আমার মনে ভারি ঘৃণা হইয়াছে, সামান্য ডোমের স্ত্রীলোক আমাকে দেখিয়া দুর্ভাগা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল, কারণ আমার সন্তান হয় নাই। আমি আর লোককে মুখ দেখাইব না।" রাজ্ঞীগণ অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ছোট রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বাহিরে আসুন, মুখ হাত ধুইয়া সভায় যান, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার যাহাতে পুত্র লাভ হয় তাহাই করিব।" এই আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা দ্বার খুলিলেন, এবং রীতিমত কার্য্যাদি করিতে লাগিলেন, ও দিকে ছোট রাণী গৃহত্যাগ করিয়া বহু দূরে এক পর্ব্বত-শিখরে সাত বৎসর কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করিতে লাগিলেন। অনেক সাধনের পর ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, "রাজার অদৃষ্টে সন্তান নাই বলিয়া হয় নাই তাঁহাকে ধন দিয়াছি এ জন্য পুত্র লাভ হয় নাই। ষষ্ঠী এবং কমলা উভয়ে এক জনের ভাগ্যে প্রসন্ন হন না।" রাণীর অনেক সাধ্যসাধনার পর বিধাতা বলিলেন "তোমার সন্তান লাভ হইবে যদি তুমি অনেক ক্লেশ সহ্য কর।" রাণী বলিলেন, "ভগবান্, আমি পুত্র পাইবার জন্য সকল কষ্টই লইতে পারি।" বিধাতা বলিলেন, "তুমি এই পর্ব্বতে আরও সাত বৎসর পড়িয়া থাক, তোমার বুকে সাত মোন ভারি প্রস্তর চাপান

যাই, দেখি কে ফুল ধরিতে পারে।" সকলেই জলে নামিয়া ফুল ধরিতে গেলেন, জবা ফুল কাহাকেও ধরা দেয় না। ছয় রাণী জানু পর্য্যন্ত গভীর জলে গিয়া ফুল ধরিতে যান, ফুল হয় ডুবিয়া যায়, না হয় ত দূরে ভাসিয়া চলিয়া যায়। তখন ছোট রাণী গিয়া এক পদ জলে এক পদ স্থলে রাখিয়া হাত বাড়াইবামাত্র ফুল আপনি তাঁহার হাতের মধ্যে আসিল, তিনি ফুল তুলিয়া লইয়া তীরে আসিলেন। সেই দিনে তিনি গর্ভবতী হইলেন। অপুত্রক রাজার সন্তান হইবে, রাজ্যে আনন্দোৎসবের সীমা রহিল না। যথাসময়ে শুভক্ষণে সূতিকা ঘর আলো, পূর্ণচন্দ্র তুল্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। রাজ্যমধ্যে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। শিশুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই মোহিত হইল। তাহার ললাটে রাজদণ্ড এবং পূর্ণ চন্দ্র।

ক্রমশঃ—

নববিধানের আদর্শ নারীপ্রকৃতি।

(১) আমি পুরুষকে ব্রহ্মসন্তান জানিয়া প্রীতি এবং সম্মান করি; ও তৎসম্বন্ধে কোন কুচিন্তা কি কুকামনা হৃদয়ে পোষণ করি না।

(২) আমি ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে দমন করি।

(৩) আমি পরসুখে সুখী হই; লোভ কি হিংসা করি না।

(৪) আমি মোহমদে মত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলি না।

(৫) ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহা হইতে অন্ন বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া আমি বৈরাগ্যকে বিদায় করিয়া দিই না।

(৬) আমি আমার সন্তানদিগের চরিত্র ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যত্নবতী।

(৭) আমি সরল সত্য পথে চলি; কুটিলতাকে ঘৃণা করি।

(৮) দয়া আমার নিত্য ব্রত।

(৯) আমি সীতা, সাবিত্রী ও মৈত্রেয়ীর ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করি।

(১০) সে সকল নারী নববিধান বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যে একটী স্বর্গীয় ভগ্নীমণ্ডলী স্থাপনের জন্য আমি বিশেষ ব্যাকুলা ও যত্নবতী। ব্রহ্ম আমার সহায়।

ভক্তিকুসুম।

ফুলের সৌন্দর্য্য সকলেরই মন হরণ করে। ফুলের সৌরভ সকলকেই আমোদিত করে। বন উপবন এবং উদ্যানের ফুল সকলেই ভোগ করিতে পারে; কিন্তু মনের ফুল অতি অল্প লোকেই দেখিতে পায়। সাধারণ লোকের অদৃষ্ট-রূপে গহন মনোবনের ভিতরে যে কত সুগন্ধ ও বিচিত্র সুন্দর ফুল সকল ফুটে তাহা কেবল ভাবুক কবি এবং প্রেমিক ভক্তেরাই দেখিতে পান। হৃদয় বাগানের পুষ্পচয় ভোগ করিতে পারিলে

যাই, দেখি কে ফুল ধরিতে পারে।" সকলেই জলে নামিয়া ফুল ধরিতে গেলেন, জবা ফুল কাহাকেও ধরা দেয় না। ছয় রাণী জানু পর্য্যন্ত গভীর জলে গিয়া ফুল ধরিতে যান, ফুল হয় ডুবিয়া যায়, না হয় ত দূরে ভাসিয়া চলিয়া যায়। তখন ছোট রাণী গিয়া এক পদ জলে এক পদ স্থলে রাখিয়া হাত বাড়াইবামাত্র ফুল আপনি তাঁহার হাতের মধ্যে আসিল, তিনি ফুল তুলিয়া লইয়া তীরে আসিলেন। সেই দিনে তিনি গর্ভবতী হইলেন। অপুত্রক রাজার সন্তান হইবে, রাজ্যে আনন্দোৎসবের সীমা রহিল না। যথাসময়ে শুভক্ষণে সূতিকা ঘর আলো, পূর্ণচন্দ্র তুল্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। রাজ্যমধ্যে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। শিশুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই মোহিত হইল। তাহার ললাটে রাজদণ্ড এবং পূর্ণ চন্দ্র।

ক্রমশঃ—

নববিধানের আদর্শ নারীপ্রকৃতি।

(১) আমি পুরুষকে ব্রহ্মসন্তান জানিয়া প্রীতি এবং সম্মান করি; ও তৎসম্বন্ধে কোন কুচিন্তা কি কুকামনা হৃদয়ে পোষণ করি না।

(২) আমি ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে দমন করি।

(৩) আমি পরসুখে সুখী হই; লোভ কি হিংসা করি না।

(৪) আমি মোহমদে মত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলি না।

(৫) ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহা হইতে অন্ন বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া আমি বৈরাগ্যকে বিদায় করিয়া দিই না।

(৬) আমি আমার সন্তানদিগের চরিত্র ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যত্নবতী।

(৭) আমি সরল সত্য পথে চলি; কুটিলতাকে ঘৃণা করি।

(৮) দয়া আমার নিত্য ব্রত।

(৯) আমি সীতা, সাবিত্রী ও মৈত্রেয়ীর ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করি।

(১০) সে সকল নারী নববিধান বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যে একটী স্বর্গীয় ভগ্নীমণ্ডলী স্থাপনের জন্য আমি বিশেষ ব্যাকুলা ও যত্নবতী। ব্রহ্ম আমার সহায়।

ভক্তিকুসুম।

ফুলের সৌন্দর্য্য সকলেরই মন হরণ করে। ফুলের সৌরভ সকলকেই আমোদিত করে। বন উপবন এবং উদ্যানের ফুল সকলেই ভোগ করিতে পারে; কিন্তু মনের ফুল অতি অল্প লোকেই দেখিতে পায়। সাধারণ লোকের অদৃষ্টরূপে গহন মনোবনের ভিতরে যে কত সুগন্ধ ও বিচিত্র সুন্দর ফুল সকল ফুটে তাহা কেবল ভাবুক কবি এবং প্রেমিক ভক্তেরাই দেখিতে পান। হৃদয় বাগানের পুষ্পচয় ভোগ করিতে পারিলে

মানুষের মনে ইন্দ্রিয়-বিকার থাকিতে পারে না। আবার ইহাও সত্য যে মানুষের মন কিয়ৎ পরিমাণে নির্ম্মল না হইলে হৃদয়-বাগানে প্রবেশাধিকার জন্মে না। আজ আমরা আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে একটী ফুলের কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। সেই ফুলটীর নাম ভক্তি কুসুম। জগতে এই ফুল কোথায় ফুটিয়াছে? ইহার সৌন্দর্য্যে জগত মুগ্ধ। ইহার সৌরভে জগত মেতেছে। এই জগতমোহন পদ্ম কোন্ সরোবরে ফুটেছে? জগতের উচ্চতম স্থান যোগ-গিরিরূপ হিমাচলের শৃঙ্গে মানস-সরোবরে এই জগন্মোহিনী ভক্তি বিকসিতা। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের পতি শ্রীহরি এই আশ্চর্য্য কুসুমের সৌন্দর্য্যরস পান করিতেছেন, এবং ইহার সৌরভে আমোদিত হইতেছেন। যে ফুল ভগবানের প্রিয় এবং তাঁহার বিহারস্থান তাহা সামান্য নহে। পাঠক, কিম্বা পাঠিকা, তুমি কি এই ফুল দেখিতে চাও? ফুল দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়; কিন্তু কোথায় গেলে এই ফুল দেখিতে পাইবে? বাহিরে জড় জগতে এই ফুল ফুটে না; সাধারণ মানবপুঞ্জের মধ্যেও এই ফুল দেখা যায় না। সত্য সত্যই যদি এই ফুল দেখিতে চাও তবে ভগবানের অসাধারণ অথবা বিশেষ প্রেম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে হইবে। ঐ অতীন্দ্রিয় অজ্ঞেয় প্রেম-বৃন্দাবনে পবিত্র প্রেম-সূর্য্যোদয়ে এই দুর্ল্লভ ভক্তি-কুসুম প্রস্ফুটিত। দিব্য চক্ষুই কেবল ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়; এবং দিব্য নাসাই কেবল ইহার সুঘ্রাণ গ্রহণ করে। পৃথিবীর বন উপবন ও বাগানে যে সকল মধুময় ফুল ফুটে নানা জাতির মধুকর সকল আসিয়া সেই মধুপান ও আহরণ করে। বিষয়ের কীট অথবা পৃথিবীর পোকা স্বরূপ সংসারাসক্ত পুরুষ এবং সংসারপরায়ণা নারীসকল এই স্বর্গীয় ভক্তিকুসুমের মধুপান করিতে পারে না। ইহার পবিত্র মধু ভগবানের ভোগ্য। এবং স্বয়ং ভগবান দয়া করিয়া তাঁহার যে সকল প্রিয় ভক্ত পুত্র এবং প্রিয়া সতী কন্যাদিগকে এই কুসুমের রসামৃত পান করিতে অধিকার দেন তাঁহারাই ঐ অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। ভক্তিফুলের মধু না খাইলে কেহই অমর হইতে পারে না। বিষয়বিষ খাইয়া যাহারা হতচেতন হইয়াছে, এই মৃতুঞ্জয় নবজীবন ভক্তি কুসুমের মধুপান ভিন্ন তাহাদের চৈতন্য লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।

কাব্যকাহিনী।

পোর্সিয়া।

গত প্রকাশিতের পর।

তদনন্তর পোর্সিয়া এণ্টোনিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি য়িহুদিকে কতদূর ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন।

এণ্টোনিও—য়িহুদি যদি তাহার জামাতা ও কন্যাকে তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের উত্তরাধিকারী করে এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হয় তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। অন্য দণ্ড লইতে চাহি না। সে যেন ঐরূপ দানপত্র লিখিয়া দেয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে সাইলকের কন্যাকে গোপনে একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী যুবক বিবাহ করে। সাইলক অনিচ্ছাসত্ত্বে ও দানপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। ডিউক ছদ্মবেশধারী সুবিচারককে সমাদর প্রদর্শনার্থ সেই দিবস আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু পোর্সিয়া স্বামীর পূর্ব্বে গৃহে উপস্থিত হইবার মানসে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন ডিউক এণ্টোনিওকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এণ্টোনিও আমার বিবেচনায় তুমি এই যুবকের নিকট অত্যন্ত উপকৃত এবং ঋণী। অতএব যাহাতে ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার এরূপ চেষ্টা কর।" এই বলিয়া ডিউক প্রস্থান করিলেন। বেসানিও অগ্রসর হইয়া পোর্সিয়াকে বলিলেন—"মহাশয় আজ আমি এবং আমার বন্ধু আপনার সুবিবেচনার জন্য কঠোর দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে য়িহুদির প্রাপ্য, এই তিন সহস্র ডুকেট আপনার গ্রহণের জন্য আমরা অর্পণ করিতেছি।"

এণ্টোনিও—এবং আমরা চিরদিনের জন্য আপনার নিকট ঋণী রহিলাম।

পোর্সিয়া—যে কার্য্যে সন্তোষ হয় সেই সন্তোষই যথেষ্ট পুরস্কার। আমি আপনাদিগকে য়িহুদির হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া যথেষ্ট সুখী হইয়াছি সুতরাং আমাকে আমি পুরস্কৃতও জ্ঞান করিতেছি। আমি কখন অর্থ লালসা করি না। আমরা এই অনুরোধ ভবিষ্যতে যখন সাক্ষাৎ হইবে আমাকে ভুলিবেন না। আপনাদের মঙ্গল হউক। আমি বিদায় লই।"

বোসানিও—"প্রিয় মহাশয় আমি আবার অনুরোধ করিতেছি অর্থ যদি না লইতে ইচ্ছা করেন, অন্ততঃ স্মরণ চিহ্ন স্বরূপও কিছু গ্রহণ করুন অস্বীকার করিবেন না।"

পোর্সিয়া—বারবার অনুরোধ করিতেছেন অবশ্যই আপনার অনুরোধ রাখিতে হইল। আপনার হস্তের দস্তানা জোড়া আমাকে দিন। বন্ধুতার চিহ্ন স্বরূপ তাহা আমি পরিব, এবং আপনার অঙ্গুলিতে যে অঙ্গুরীটি আছে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ ঐটি গ্রহণ করিব—হাত টানিয়া লইবেন না। এইটি ছাড়া অন্য কিছু আমি লইব না।

বেসা—এই অঙ্গুরীয় আপনি লইতে চান? এইটি অতি সামান্য আপনাকে দিতে লজ্জা বোধ হয়।

পো—না না আমি ইহা ছাড়া আর কিছুই লইতে চাই না। এইটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।

বেসানিও—"ভেনিস্ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অঙ্গুরীয় আপনাকে আমি দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এইটি দিতে পারি না ক্ষমা করিবেন।"

পো—বুঝিয়াছি মহাশয় আপনার দানের ইচ্ছা কেবল মৌখিক। আপনি প্রথমে আমাকে চাহিতে শিখাইলেন, এখন বুঝি ভিক্ষুকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় শিখাইতেছেন।"

বে—"এই অঙ্গুরীয় আমাকে আমার স্ত্রী দিয়াছিলেন। দিবার সময় তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে আমি কখনও ইহা হারাইব না, এবং বিক্রয় বা দান করিব না।

পো—অনেক লোক এইরূপ ওজর করিয়া দান হইতে অব্যাহতি পায়। আমি ইহার কত দূর উপযুক্ত ইহা শুনিলে আপনার পত্নী কখন আমাকে দিয়াছেন বলিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় আপনার উপর বিরক্ত হইবেন না। ভাল—"আপনাদের মঙ্গল হউক" এই বলিয়া পোর্সিয়া নেরিসার সহিত প্রস্থান করিলেন। তখন এণ্টোনিও বেসানিওকে অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন "অঙ্গুরীয়টি যুবককে দাও। যুবকের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আমার ভালবাসার অনুরোধে একবার তুমি স্ত্রীর অনুরোধ ভঙ্গ কর।

বেসানিও তখন বন্ধুর অনুরোধে শীঘ্র গ্রেসানিওর হস্তে অঙ্গুরীয়টি প্রেরণ করিলেন, এবং দুই বন্ধু এণ্টোনিওর গৃহে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে পোর্সিয়ার গৃহে গমন করিবেন এরূপ স্থির করিলেন। পোর্সিয়া পথিমধ্যে বেসানিও দত্ত অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া অতি হৃষ্ট হইলেন। ছদ্মবেশধারী নেরিসা এই অবসরে গ্রেসানিওর অঙ্গুলির একটি অঙ্গুরীয় চাহিয়া লইল। সেটি গ্রেসানিওর স্ত্রী নেরিসার প্রদত্ত।

যথাসময়ে পোর্সিয়া এবং নেরিসা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরে বেসানিও এণ্টোনিও এবং গ্রেসানিও তথায় উপস্থিত হইলেন।

পোর্সিয়া যথোচিত কথায় স্বামীকে এবং স্বামীর বন্ধুকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গ্রেসানিও এবং তাঁহার পত্নী নেরিসার বচসা বিবাদ আরম্ভ হইল। পোর্সিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে? ইহার মধ্যেই কলহ?"

গ্রেসানিও—আমার স্ত্রীর দত্ত একটা সামান্য অকিঞ্চিৎকর আঙ্গটীর জন্য এত ঝগড়া। তাতে লেখা ছিল, "আমাকে ত্যাগ করিও না।"

নেরিসা—আঙ্গটির মূল্যের জন্য নয়, কিন্তু যখন আমি তোমাকে সেটি দিয়াছিলাম তুমি বলিয়াছিলে মরণ পর্য্যন্ত তুমি তাহা ছাড়িবে না। আমার জন্য না হউক, তোমার প্রতিজ্ঞার জন্যও সেটা রাখা উচিত ছিল। জজের কেরাণীকে দিয়াছ? তাহা আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় কোন স্ত্রীলোককে দিয়াছ।"

গ্রে—নিশ্চয় আমি বিচারকের সঙ্গে যে একটি যুবা আসিয়াছিল তাহাকেই দিয়াছি। সে বার বার চাহিতে লাগিল আমি অস্বীকার করিতে পারিলাম না।"

পো—"স্ত্রীর প্রথম উপহার অপরকে দেওয়া তোমার বড় অন্যায় হইয়াছে। তুমি শপথ করিয়া যাহা লইয়াছিলে এত সহজে তাহা ত্যাগ করা উচিত হয় নাই। আমি আমার স্বামীকেও একটি অঙ্গুরীয় দিয়াছিলাম আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি সমুদয় পৃথিবীর ধনের বিনিময়েও তিনি তাহা দিবেন না। গ্রেসানিও তুমি যথার্থই তোমার স্ত্রীর প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছ। আমি হইলে অত্যন্ত রাগ করিতাম।"

গ্রেসানিও তখন বলিলেন যে, বেসানিও তাঁহার আঙ্গটী সেই বিচারককে দিয়াছেন—পোর্সিয়া তখন কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বেসানিওকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও তাচ্ছিল্য জন্য অনেক অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং নেরিসার ন্যায় বলিলেন যে হয় ত কোন রমণীকে তাঁহার স্বামী ঐ অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন। বেসানিও এই অপবাদ অস্বীকার করিলেন এবং অনেক অনুনয় করিয়া বলিলেন আর ভবিষ্যতে কখনও কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। এন্টোনিও আপনাকে এই বিবাদের কারণ জানিয়া ...চিত্তে বলিলেন "আমিই এই ...দের মূল। যেমন একবার আমি ... স্বামীর বেসানিওর অর্থঋণের বিনিময়ে দান করিতে প্রস্তুত ছিলাম, তেমনি আমার প্রাণ পণ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি বেসানিও কখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না।

পোর্সিয়া তখন বেসানিও প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি এন্টোনিওকে দিয়া বলিলেন "তবে আপনি দায়ী হইয়া এইটি বেসানিওকে দিন তিনি যেন ইহা অন্যটির অপেক্ষা অধিক যত্নে রক্ষা করেন।"

বেসানিও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "এইটি সেই অঙ্গুরীয় কোথা হইতে আসিল?" অনন্তর কিছুক্ষণ গোপনের পর যথার্থ কথা পোর্সিয়া প্রকাশ করিয়া বলিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবৃত করিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন, এবং বেসানিও পত্নীর সদ্বিবেচনা এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় মোহিত হইলেন। এই সময় সংবাদ আসিল দৈবযোগে এন্টোনিওর জাহাজ সকল ও (যাহা বিনষ্ট হইয়াছে এরূপ সংবাদ আসিয়াছিল) নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছে। তখনই সকলের আনন্দ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল।

এইরূপে বুদ্ধিমতী ও গুণবতী নারী বুদ্ধিসদ্বিবেচনার প্রভাবে মৃত্যুমুখ হইতে স্বামীর প্রিয়তম বন্ধুকে রক্ষা করিলেন, এবং অর্থপিশাচ নৃশংস য়িহুদির উচিত দণ্ড দিলেন।

বিবাহ সাধন।

যখন জনতা করি, উভয়ে উভয়ে ধরি,
করে করে করে পুষ্প দামের বন্ধন।
প্রতিজ্ঞা বচন কয়ে, উভে সম্মুখীন হয়ে
সশরীরে পতি পত্নী মিলে দুই জনে॥

(১)

বন্ধু জন সুখে ভাষে, নৃত্য গীত মহোল্লাসে
দৃঢ় হল বলে এই বিবাহ বন্ধন।
কিন্তু সেই শেষ নয়, কেবল আরম্ভ হয়,
সেই দিনে এইরূপে বিবাহ মিলন॥

(২)

প্রতিদিন সযতনে, পতি পত্নী এক সনে,
দৃঢ় মনে করে যদি বিবাহ সাধন।
প্রাণে প্রাণে হলে বিদ্ধ, বিবাহ হইবে সিদ্ধ,
নৈলে সার হবে শুদ্ধ প্রতিজ্ঞা বচন॥

(৩)

পুরোহিত বুধ জন, শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ,
করে যদি সাবধানে বিবাহ বাসরে।
সিদ্ধ না হইবে তায়, বিবাহের অভিপ্রায়,
না হলে অধ্যাত্ম যোগ দম্পতি অন্তরে॥

(৪)

যদি অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য, পুরোহিত এই তূর্য্য,
সাক্ষী রাখি হয় কোন বিবাহ নির্ব্বাহ।
না হইলে ধর্ম্ম যোগ, সার হয় কর্ম্ম ভোগ,
ভুঞ্জিবে কেবল নিশি দিন অন্তর্দাহ॥

(৫)

মহাধন মহাজন, করি শুভ আগমন,
উপস্থিত থাকে যদি বিবাহ সভায়।
পতি পত্নী এক মন, না হইলে কদাচন,
সিদ্ধ না হইবে সেই বিবাহ তাহায়॥

(৬)

করি বহু আয়োজন, করাইলে সুভোজন,
নিমন্ত্রিত জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয় সকলে।
নামিলিলে পরস্পর, বিবাহ অতি দুষ্কর,
জল যথা মিলে নাক পঙ্কজের দলে॥

(৭)

লক্ষ্মী তুল্য রূপবতী, গুণে তুল্যা সরস্বতী,
রমণীয় হইলেও হয় না বিবাহ।
রূপেতে পশুর মোহ, রূপান্তে কেবল দ্রোহ,
বারণ মানে না সেই বিবাদ প্রবাহ॥

(৮)

পতি যদি রূপবান, হয় শিষ্ট মতিমান,
তাহাতেও বিবাহের প্রমাণ না পাই।
সংসারে বৈষম্য নিত্য, না হইলে সমচিত্ত,
বিবাহ বন্ধনে কভু বিশ্বস্ততা নাই॥

(৯)

তোমার হৃদয় দেও, আমার হৃদয় নেও,
মিলাইয়া দুই বস্তু করি একঠাই।
উজ্জ্বল পুণ্যের বর্ণে, প্রেমের বিশুদ্ধ স্বর্ণে,
মনের মতন করি যতনে সাজাই॥

(১০)

প্রেমপুণ্য সুবলিত, একঠাঁই সম্মিলিত,
উভয় হৃদয় যোগে অর্চ্চিব শ্রীহরি।
সাধিয়া অকাট্য যোগ, করিব অমৃত ভোগ,
সমুদয় বিয়োগ বিচ্ছেদ পরিহরি॥

(১১)

না হইলে যোগপাত্র, শুধু এই বাক্য মাত্র,
বলিলে কি সিদ্ধ হয় বিবাহ সাধনা।
সাধন করিলে যত্নে, পাওয়া যায় এই রত্নে,
না সাধিলে সার হয় কেবল বঞ্চনা॥

(১২)

কুসুমের কোমল কান্তি, সুগন্ধ মিষ্টতা শান্তি,
বাড়ে যদি দিন দিন উভয় জীবনে।
উভয়ের পুণ্য বলে, উভয়ে নির্জ্জিত হলে,
মিশে যায় আপনা আপনি দুইজনে॥

(১৩)

শুভ্র পুষ্প দাম সম, হলে চিত্ত নিরুপম,
নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেম ভূষণে ভূষিত।
আপনিই পরস্পর, টানে অন্তরে অন্তর,
উভয়ের প্রতি হয় উভয়ে তৃষিত॥

(১৪)

পুণ্যেতে হইয়া শুচি, আপনার অভিরুচি—
আত্মসুখ দুখ চিন্তা করিয়া বর্জন।
গুণবতী সতী নারী, গুণবান সদাচারি—
সৎ পতির করে সদা চিত্ত বিনোদন॥

(১৫)

পতিও পত্নীর জন্য, আপনাকে মানে ধন্য,
তাই সব স্বতন্ত্রতা করি বিসর্জন।
পত্নীর মনের মত, সাধিয়া জীবন ব্রত,
ইচ্ছায় ইচ্ছায় যোগ করেন স্থাপন॥

(১৬)

ঈশ্বর পূজার যোগ্য, জগতের উপভোগ্য,
পুণ্য প্রেমময় শুদ্ধ জীবন যুগল।
যুগল কুসুম সম, হয়ে শুদ্ধ নিরুপম,
শোভিত করিবে হরি চরণ-কমল॥

(১৭)

এইরূপে নিরন্তর, সাধি যোগ পরস্পর,
বিবাহের বিধি পূর্ণ করিবে জীবনে।
কথায়ত বিয়ে নয়, জীবনে বিবাহ হয়,
বিবাহ সাধিয়া যাবে ঈশ্বর সদনে॥

সিয়ানস্থ সেণ্ট ক্যাথারাইণ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

এ দিকে ক্যাথারাইণের মাতা লাপা দেখিতে পাইলেন যে, পুণ্যের প্রতিমা-স্বরূপা তাঁহার সাধ্বী কন্যার সম্বন্ধে চারি দিকে অশ্রোতব্য জঘন্য অপবাদ সকল প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, সকলেই সেই অসম্ভব কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছে, এবং তাঁহার প্রিয়তম কন্যাকে ধিক্কার দিতেছে। তিনি এই বিষম কথা শুনিবামাত্র একেবারে উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুতবেগে কন্যার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমা আমি কত বার তোমাকে বলিয়াছিলাম যে ঐ দুষ্টা নারী এণ্ড্রিয়ার ত্রিসীমায় যাইও না, তখন আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়াছ বলিয়া তোমার এখন এই বিপদ হইল। চারি দিকে যে কাণপাতা যায় না? তপস্বিনী-গণ যে কি ভয়ানক কথা সকল কহিতেছে তাহা কি শুন নাই? তোমার এত অপমান এত লজ্জা আমি যে আর সহিতে পারি না। এখন আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি এখন হইতে যদি তুমি সেই হতভাগিনীর নিকট পুনর্ব্বার গমন কর, আমি তোমাকে আর কখন কন্যা বলিয়া সম্বোধন করিব না।" ক্যাথারাইণ এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, অবশেষে মনের আবেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া মাতৃসমীপে জানু পাতিয়া বসিয়া উত্তর করিলেন "প্রিয়-তমা জননী, মনুষ্যদিগের অকৃতজ্ঞতায় কি কখন ঈশ্বরের দয়া শুষ্ক হইয়া যায়? তিনি কি আমাদিগের প্রতি দিন এত অপরাধ সত্ত্বেও অপূর্ব্ব দয়া করি-তেছেন না? আমাদিগের প্রভুঈশা কি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অশেষ অপ-মান ও নিন্দা সহ্য করিয়া জগতের পাপভার গ্রহণ করিয়া শত্রুর পরমো-পকার সাধন করেন নাই? মাতঃ তুমি অত্যন্ত দয়ালু, তুমি জান আমি যদি এখন সেই অসহায় এণ্ড্রিয়াকে পরি-ত্যাগ করি, আর কেহ তাহার নিকট গমন করিবে না, সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু গ্রাসে পতিত প্রায় হইবে। সে অসহা-য়াবস্থায় মরিলে তাহার মৃতুর কারন কি আমি দায়ী হইব না এবং সে জন্য আমাদের কি মহা বিচারপতির নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে না? সে এখন ভ্রান্ত হইয়া আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু ভগবান কি কোন মূহুর্ত্তে তাহার ভ্রম তিরোহিত করিয়া দিয়া তাহাকে পুণ্যবতী করিতে পারেন না।" ক্যাথারাইণের মাতা এই সমস্ত কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার সকল দুঃখ চলিয়া গেল, তিনি অত্যন্ত সান্ত্বনা পাইলেন।

অসাধ্য সাধন হয়, প্রেমে পাষাণ বিগলিত হয় ও বনের পশু পর্য্যন্ত বশীভূত হয়। এক প্রেমের ও ক্ষমারই দ্বারা জগৎপতি ধর্ম্মরাজ পাপী কঠোর-

চিত্ত মনুষ্যের হৃদয়কে বশ করেন। জগাই মাধাই প্রেমেতেই পরাজিত হইয়াছিল। প্রেম সকলি করিতে পারে, ক্যাথারাইণের প্রসন্নতা এণ্ড্রিয়ার প্রতি পতিত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার মঙ্গলের জন্য কত প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, কত অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা ও অশ্রুজল যে বিফল হইবে এরূপ কখন সম্ভব-পর নয়। সাধুর প্রসন্নতায় যে পাপীর মঙ্গল হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? সচারাচর দেখিতে পাওয়া যায় যখন মানুষের পাপের ভরাপূর্ণ হয় তখনই তাহার সুভদিনের অভ্যুদয় হইবার সময় উপস্থিত হয়। এণ্ড্রিয়ার মন ক্রমে বিগলিত হইতে আরম্ভ হইল, অনুতাপ আসিয়া তাহার কঠোর চিত্তকে আক্রমণ করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিল। সে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। এমন গুণবতী পুণ্যবতী উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে অকারণ যে সমস্ত শত্রুতা করিয়াছিল ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ প্রচার দ্বারা তাঁহার সর্ব্বনাশের যে চেষ্টা করিয়াছিল, একে একে সকল চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল এবং অনুতাপ দুঃখ তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। যে সমস্ত সন্ন্যাসিনী ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট সে ক্যাথারাইণের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা রটনা করিয়া ছিল এণ্ড্রিয়া তাহা-দিগকে ডাকাইয়া একত্র করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া বলিয়া উঠিল যে, "ক্যাথারাইণের চরিত্রের বিরুদ্ধে আমি এতকাল আপনা-দিগের সমক্ষে যে ভয়ানক কথা সকল প্রচার করিয়াছি সে সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ অসত্য ও অমূলক। ক্যাথারাইণ যে কেবল নির্দ্দোষী তাহ নহে তিনি স্বর্গের দেবী ও মহাসাধ্বী, তিনি সর্ব্বদাই পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত ও পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। আমি নিজে সয়তান দ্বারা অধিকৃত ও চালিত হইয়া উক্ত কুকার্য্য করিয়াছি।" সে ক্যাথারাইণের পদ-তলে পতিত হইয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্যাথা-রাইণ কখন এণ্ড্রিয়ার প্রতি বিরক্ত বা রাগান্বিতা হন নাই, প্রেম ও স্নেহের ব্যবহার সর্ব্বদাই করিয়াছেন। তিনি এণ্ড্রিয়াকে আবার ক্ষমা করিবেন কি? তাহার মন শুদ্ধ হইল তাহাতেই তিনি পরম লাভ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তির পক্ষে নিন্দা ও স্তুতিবাদ, সুখ দুঃখ বাস্তবিক সমান হইয়াছে, তাহার চিত্তকে মনুষ্যের প্রসন্নতা ও মিষ্ট বাক্য কি বিচলিত করিতে পারে? ইতি পূর্ব্বে যখন নিন্দা অখ্যাতি ও অপবা-দের ঘন মেঘ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করি-য়াছিল, তখন তাঁহার মনের যেরূপ অবিচলিত অবস্থা ছিল, এখন লোকে তাঁহাকে নির্দ্দোষী এবং বিভ্রান্ত লোক কর্ত্তৃক অকারণ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন জ্ঞান করিতে লাগিল ও তাঁহার সহিষ্ণুত

ও পুণ্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল, এখনও তাঁহার সেইরূপ অবিচলিত অবস্থা দেখা গেল। তিনি প্রস্তরের ন্যায় অটলভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ সুন্দর ও স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী স্বর্গের দেবী জ্ঞান করিতে লাগিল। ক্যাথারাইণ সম্পূর্ণরূপে আত্মবিনাশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অপর এক দিন তিনি এণ্ড্রিয়ার ক্ষত ধৌত করিয়া দিতে ছিলেন, তাহা হইতে যে ভয়ানক দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল তদ্দ্বারা তাঁহার মনে ঘৃণার উদয় হইল তাঁহার বমনের উদ্রেক হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবাব্রতের শিথিলতা হইবার উপক্রম হইল। তিনি একটি মৃন্ময় পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে এণ্ড্রিয়ার ক্ষত ধৌত করিতেছিলেন উক্ত জল দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। ক্যাথারাইণ আত্মনিগ্রহ জন্য এই সময়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, যখনই দুর্ব্বলতা ও পাপের আশঙ্কা দেখিতেন তখনই তিনি আত্মনিগ্রহ দ্বারা তাহা নিবারণ করিতেন। এই সময়ে ক্যাথারাইণ আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে জল দর্শন করিয়া "তোমার মনে বিভৎস ভাবের উদয় হইতেছে এবং যাহার দুর্গন্ধে এত ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে, সেই জল তোমার এই পাপমুখে অদ্য পান করিতে হইবে" এই বলিয়া সেই মৃন্ময় পাত্র হস্তে লইয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে পার্শ্বস্থিত গৃহে তিনি প্রবেশ করিলেন, এবং অনুরাগের সহিত সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন। ক্যাথারাইণ তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকটা পরে এরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে সেই জল হইতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ অনুভব করা দূরে থাক, তিনি অমৃতের ন্যায় তাহা পান করিয়াছিলেন।

স্মৃতি।

যে দিন গিয়াছে তাহার ন্যায় মধুর দিন আর কি আছে, যে দিন গিয়াছে সে দিনের কথা ভাবিতে কাহার না ভাল লাগে? জীবনের পুরাতন কাহিনী সকল মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখা কি মধুর। স্মৃতি পুরাতনের সহিত নূতনকে বাঁধে, বর্ত্তমানের সহিত অতীতকে যুক্ত করে। মধুময় স্বপ্ন তুল্য অতীত দিনের সুমিষ্ট স্মৃতি প্রাণকে আকুল করে, প্রাণের ভিতর ভাবের উচ্ছ্বাসে কেমন করে। যে দিন গিয়াছে স্মৃতি পটে তাহার এক একটি ছবি বড়ই সুন্দররূপে অঙ্কিত আছে। যত দেখি তত দেখিতে ইচ্ছা করে। যত ভাবি ততই আরো ভাবিতে ইচ্ছা করে। মহা দুঃখের সময় কাহার না মনে অতীতের স্মৃতি আসিয়া ক্ষণিক সৌভাগ্যের আলোক দেখাইয়া যায়? মাতা পিতার অমূল্য অতুল স্নেহ বাল্য-প্রণয় বন্ধুতা সকলই সেই পুরাতন

স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধা, কত বিচিত্র কাহিনী স্মৃতি পুস্তকে লেখা আছে। কত লোক আপনার ছিল পর হইয়াছে, কত লোক বন্ধু ছিল শত্রু হইয়াছে, কত লোক ছিল এখন আর নাই, ভবের হাট হইতে তাহাদের দোকান পাট উঠিয়া গিয়াছে, কত পুরাতন মুখ অদৃশ্য হইয়াছে, নূতন মুখ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে,—কত কণ্ঠরব শুনিতাম এখন তাহা নীরব, কত বিষয় যাহা ভাবি নাই ঘটিয়াছে, কত বিষয় যাহা ঘটিবে ভাবিয়াছিলাম ঘটিল না, কত আশা অপূর্ণ রহিল, কত বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় সুর হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিল, আবার নীরব হইল। কত সুখস্বপ্ন প্রাণে মিশাইল। যে দিন গিয়াছে, তাহার তুল্য অপূর্ব্ব বিচিত্র আর কি আছে। কত কাহিনী অতীত স্মৃতিপটে লেখা, কত চিত্র অঙ্কিত, কোনটি সুন্দর কোনটি মন্দ, কোনটি মনোহর কোনটি ভয়ানক—যখন আর কিছু থাকে না তখনও স্মৃতি থাকে। যে দিন গিয়াছে সে দিনের স্মৃতি আসিয়া মনকে অতীত জগতে লইয়া যায়। যাহা ভুলিয়াছিলাম মনে করাইয়া দেয়, যাহা ছিল না আবার যেন হয়, যাহা দেখা যায় না আবার যেন দেখি, যাহা চলিয়া গিয়াছে আবার যেন ফিরিয়া আসিয়া প্রাণকে বহু দূরে সেই অদৃশ্য অতীত জীবনে রাখিয়া আসে।

বিচিত্র বিশ্ব।

এজগত সৃষ্টির বিচিত্র ব্যাপার। আমরা যত দর্শন করি ও মনোযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করি, দেখিতে পাই, ইহা অতি আশ্চর্য্য গভীরতর জ্ঞান ও গুণের আধার। এই যে পৃথিবী, ইহা জড়, ইহা হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন সকলই জড়। ইহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার সকল অতি অদ্ভুত। এই জড় বিশ্বরাজ্য কোথা হইতে আসিল? কে সৃজন করিল? এই যে প্রকাণ্ড ভূমি ইহা সর্ব্বদা আমরা সামান্য জ্ঞানে পদ দ্বারা দলন করি, এবং ইহার উপর অন্যায় অত্যাচার করি। কিন্তু ইহা কি? আমাদের জননীর ন্যায় কি ইহা আমাদিগকে লালন পালন করিতেছে না? ওহে ধরা, তুমি যে অশেষ গুণে পোরা। আমরা সমুদ্রকে রত্নাকর বলি, কিন্তু তুমি যে সকল প্রকার রত্নের আধার। সমুদ্র মুক্তা প্রবাল শম্বুক শঙ্খ প্রভৃতি প্রসব করিয়া বিখ্যাত ও সকলের নিকট পরিচিত, তুমিওতো সেইরূপ নানাবিধ রত্ন দিবা নিশি প্রসব করিতেছ, বিশাল সাগর, গগনভেদী পর্ব্বত, পুষ্প ফলে সজ্জিত তরু লতা, সুমিষ্ট রসাল সুস্বাদু দ্রব্য, স্বচ্ছ সুশীতল জল সকলই তুমি প্রসব করিলে। এ সকল তোমা হইতে আমরা লাভ করিয়া থাকি। এমন সুন্দর বিশ্ব তুমি। কত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মণিমাণিক্যপূর্ণ খনি, কত তোমা

হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে, আরও কত গুপ্ত আছে, সময়ে প্রকাশ করিবে। আমি তোমাকে ধন্যবাদ করি। তুমিই কি এই সকল নর নারী প্রসব কর নাই? হাঁ করিয়াছ। ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম তোমাতে আছে। ইহাতেই মানব জীবিত গঠিত এবং নিঃশেষিত হয়। তবে কি এই পর্য্যন্তই আমাদের শেষ? ইহাই কি আমাদের পরিণাম। সন্তান যেমন শুধু মাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। সে মার দয়া সেবা স্নেহ কার্য্য প্রণালী দেখিয়া তৃপ্ত হইল না। সে বলে এইকি শেষ? কিন্তু তাহার মন বলে না, আরও কিছু আছে। যাহা দেখিতে এখনও পাই নাই। তাহা কি—জন্মদাতা পিতা। আমরা তেমনি এই সুন্দর বিশ্ব দর্শন করিয়া ইহার যত্ন দ্বারা প্রতিক্ষণ লালিত পালিত হইয়া কত সুখ সম্ভোগ করিয়া ভাবি, এই কি পরিণাম? মন বলে, না. আসল জন্মদাতা পিতা মাতা কৈ? বিশ্বাস বলে ঐ যে দেখা যায়। এই "বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ," অনন্ত নক্ষত্র রাজি চারু চন্দ্র তেজঃপুঞ্জপূর্ণ সর্ব্বশুদ্ধ প্রকাণ্ড জগত্, জড় ও প্রাণীতে পূর্ণ। মৃত্তিকা দেখিতে সামান্য কিন্তু ইহার বিচিত্র গুণ শক্তি দেখিয়া আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হই। ভূতত্ত্ব বিদ্যা যাঁহারা জানেন তাঁহারা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন। এক মৃত্তিকা হইতে কত প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। এক ক্ষুদ্র ভূমি খণ্ডের উপরে নানাবিধ উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়। তাহার গুণ, রস বহু বিচিত্র ভাব প্রকাশ করে। যে ভূমি হইতে একটি সুমিষ্ট আম্র গাছ উৎপন্ন হয় সেই মৃত্তিকা হইতেই আবার উচ্ছা ফল ফলে, আবার অম্ল ফল ফলে, এই প্রকার কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা প্রতিক্ষণ দেখি এবং আহার করি কিন্তু কিছু ভাবি না বুঝি না। এক মাতার গর্ভজাত সন্তান পুত্র কন্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি পায়, যেমন শ্রী সৌন্দর্য্য ভাব এবং বুদ্ধি প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভাব ইহাও সেই প্রকার। আমরা যখন একটি সুন্দর উদ্যান দেখি সরোবর সহিত নানাজাতির বৃক্ষ ফল ফুলে সজ্জিত দেখিয়া ক্ষণকালের জন্যও আশ্চর্য্য হই, যখন আমাদের প্রতিদিনের আহারীয় ফল মূলাদি দর্শন করি তখন মন দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি কি সুন্দর তরি তরকারি ও সুমিষ্ট ফল সকল আহারের জন্য বিধাতা সৃজন করিয়াছেন, এই সময় আমাদের দেশেই ফলের বেশী প্রাদুর্ভাব। কেমন দেখিতে কেমন খাইতে। একটি ডালিতে সজ্জিত জাম জামরুল, নিচু গোলাপজাম আম্র তালশাঁস আনারস ও তর্ম্মুজ পেয়ারা খর্ম্মুজ প্রভৃতি কত নাম বলিব; দয়াময়ের দান দেখে জুড়াইল তৃষিত প্রাণ। এই প্রকারই মানবজীবন। সকল আত্মা একই। যত প্রকার মানব তত ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভক্তিও শক্তি। একই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু মূলে এক। যিনি এই বিচিত্র সুন্দর জগত প্রসব করিয়াছেন তিনি বিশ্বজননী আমরা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

ঘরকন্নার কাজ।

ঘরকন্নার কার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্য রন্ধন। সকল গৃহিণীরই রন্ধন কার্য্যে নিপুণ হওয়া উচিত। আমাদের দেশে চিরকাল এই কার্য্যের আদর হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে রন্ধন স্ত্রীসমাজের একটি প্রিয়-কার্য্য। আমরা পুরাণ পাঠে জানিতে পারি, দ্রৌপদী সীতা দময়ন্তী ইত্যাদি রাজকুলোদ্ভবা সাধ্বী নারীগণ স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া সহস্র সহস্র অতিথি ভোজন করাইয়াছেন, স্বামিপুত্রের পরিতোষ সম্পাদন করাইয়াছেন। এখনও এ দেশের বড় রাজরাণীগণ রাজার আহার সামগ্রী আপন আপন হস্তে রন্ধন করিয়া থাকেন। এ দেশের কেন বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া আপনি রন্ধনশালায় গমন করিয়া স্বয়ং কন্যাদিগকে রন্ধনকার্য্যে শিক্ষা দিতেন, এবং সকল গৃহকার্য্য উত্তমরূপে শিখাইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠকন্যা (যিনি এক্ষণে বিস্তীর্ণ জার্ম্মেণি সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী) তিনি স্বহস্তে পীড়িত স্বামীর নিমিত্ত মাংসের যূষ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। রন্ধনকে নীচকার্য্য যেন কেহ না মনে করেন। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ইহাতে সুদক্ষ হওয়া কর্ত্তব্যের বিষয় জ্ঞান করা উচিত। জীবন রক্ষার প্রধান উপায় ভাল আহার। সেই আহার যাহাতে ভালরূপে হয়, তাহার তত্ত্বাবধান করা গৃহিণীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। পিতা মাতা স্বামী পুত্র ইত্যাদির আহার যে রন্ধনের সাহায্য বিনা হয় না সেই রন্ধনকার্য্যে অপটু এবং অশিক্ষিত থাকা কোন নারীর উচিত নহে। তবে সকলকে যে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিতেই হইবে তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু রন্ধন-বিদ্যায় পারদর্শিনী হওয়া সকল নারীর কর্ত্তব্য। কারণ তাহা না হইলে তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের হইবে না। রন্ধন বিদ্যার তত্ত্ব জানিলে পাচক পাচিকাদিগকে শিখাইয়া দিতে পারিবেন, এবং সময়ে সময়ে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া গৃহস্থ সকলের পরিতোষ সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা যেন সকলের মনে থাকে, বিদ্যা বুদ্ধি রূপ গুণ সত্ত্বেও গৃহিণী যদি ঘরকন্নার কার্য্যে অজ্ঞ থাকেন, কখনও তিনি স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারেন না। রন্ধন এবং অন্য সকল গৃহকর্ম্মে সকল স্ত্রীলোকের নিপুণ হইতে যত্ন করা উচিত। স্ত্রী একটি সুন্দর পুতুলের মত আলমারিতে সাজাইয়া রাখিবার ও কেবল দেখিবার বস্তু নহে যে, স্বামী স্ত্রীর বিদ্যা ও রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকি-

বেন। সংসারের বিশৃঙ্খলা দেখিলে গৃহকর্ম্মে ও সন্তানপালনে পত্নীর অমনোযোগ এবং তাচ্ছিল্য দেখিলে কোন স্বামী সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। যেমন সকল বিদ্যা শিক্ষার জন্য চেষ্টা করা উচিত, গৃহকর্ম্মকেও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা জানিয়া তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইতে যত্ন কর উচিত। নিজে অজ্ঞ হইলে দাসদাসী দ্বারা সুশৃঙ্খলা সহকারে কার্য্য করানও সম্ভবে না, কারণ যে নিজে অক্ষম ও অজ্ঞ সে অপরকে কিরূপে শিক্ষা ও উপদেশ দিবে? অতএব অন্য জ্ঞান উপার্জ্জনের সহিত সংসারকার্য্যের জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইবে? যেমন স্ত্রীলোকেরা ছুঁচের কাজ, পশমের কাজ, গীত বাদ্য, চিত্রবিদ্যা শিখিবেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন ও অন্যান্য ঘরকন্নার কার্য্যও শিক্ষা করিবেন। ভিক্টোরিয়া কলেজ এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলের প্রশংসনীয় হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, এ বিষয়ে উক্ত কলেজ কৃতকার্য্য হইবেন। এই পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে আমরা রন্ধনপ্রণালীর সহজ শিক্ষা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সুলোচনা।

৩৪ বৎসর হইল বর্দ্ধমান প্রদেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই সময়ে একটি ভদ্রলোক পশ্চিম প্রদেশ হইতে সপরিবারে কলিকাতাভিমুখে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের খাদ্যাদির অভাব হওয়াতে এবং আরও কোন গুহ্য প্রয়োজন বশতঃ তাহারা রামপুরহাট ষ্টেসনের নিকটের একটি ষ্টেসনে অবতরণ করেন। নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ছিল তাঁহারা সেই পুষ্করিণীর তটে একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গীয় লোকেরা গ্রামের ভিতরে খাদ্যাদি অন্বেষণের জন্য গমন করিল, সঙ্গে খাদ্য নাই যাহারা খাদ্য ক্রয় করিতে গমন করিয়াছে তাহারা খাদ্য লইয়া আসিলে আহারাদি হইবে, ইত্যবসরে বাবুটি স্নান করিলেন, তাঁহার পত্নী ও পুত্র কন্যাসহ স্নান করিলেন. লোক ফিরিয়া আসিলেই আহারাদি করিবেন। ফাল্গুণমাস, সুতীব্র রৌদ্র, বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইতে চলিল. কিন্তু খাদ্য লইয়া ভৃত্যেরা প্রত্যাবৃত্ত হইল না। ছেলে মেয়ের অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, অথচ ভৃত্যেরা ফিরিয়া আসিতেছ না। বাবুটি তখন কিছু বিষণ্ণ ও মলিন মুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং একবার এদিক্ আবার ওদিক্, অগ্রসর হইয়া ভৃত্যের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; প্রথমতঃ ছোট, তার পর কিছু উচ্চ, তার পর অতিশয় চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নাই। ছেলে মেয়ের মলিন মুখ, ক্ষুধার কষ্ট ধৈর্য্যচ্যুত করিল, তাহার চক্ষু হইতে

জল পড়িতে লাগিল। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। একে বিদেশ, তাহাতে চতুর্দ্দিকে জনপ্রাণী নাই, কাহাকেও যে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু অবগত হইবেন তাহার উপায় নাই। তার পর নিরুপায় হইয়া তিনি পত্নীকে বলিলেন, "তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর—আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখি।" পত্নী বলিলেন, "এটা বুদ্ধিভ্রংশের লক্ষণ, এই জনশূন্য স্থানে আমাকে একাকিনী ফেলিয়া কোথাও যাইবার চেষ্টা কেবল বিপদ ডাকিয়া আনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" পত্নীর কথাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিল, তিনি আর অধিক দূরে যাইবার উদ্যম পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু মনের উদ্বেগ কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। একটু অল্প অগ্রসর হইয়া দেখিলেন কিঞ্চিৎ দূরে গৃহস্থের বাড়ী ও গৃহপালিত বৃক্ষাদি শোভা পাইতেছে। বাড়ীর বাহ্য চিহ্ন দর্শনে বোধ হইল যেন সে বাড়ী খানি ভদ্র লোকের হইবে। বাবুটি ধীরে ধীরে সেই গৃহের অভিমুখে চলিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হন, আবার পশ্চাদ্ভাগে স্ত্রী পুত্রদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সেই গৃহে উপনীত হইলেন। গৃহের বাহিরে জনমানব নাই যেন দুই এক মাসের মধ্যে সে গৃহে কেহ বাস করে নাই। গৃহের চারিদিক্ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া আছে। কোথাও জঞ্জাল, কোথাও ছিন্ন বসন খণ্ড সকল, পতিত রহিয়াছে। এই শ্রীভ্রষ্ট গৃহের ভিতর দিকে অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে সহসা যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলেন, অনেক চেষ্টাতে তাহা নিবারণ করিলেন।

ক্রমশঃ

সিন্ধুদেশ ও সিন্ধুরমণী।

(৩)

কয়েক বৎসর অতীত হইল রাজপুতনা প্রদেশেস্থ মিস বিল্‌বি নামে একজন বিবি—ডাক্তার, ইংলণ্ডস্থ বড় বড় লোক ও শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর নিকট গিয়া এই কথা প্রচার করেন যে ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা পীড়িত হইলে অত্যন্ত অসহায় হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ তাহারা সন্তান প্রসব করিলে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হয় তাহাতে তাহাদিগকে জলজীয়ন্ত হত্যা করা হয় বলা যায়। মিস বিল্‌বির কথাগুলি আমরা অত্যন্ত অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিতাম। অনেক অসার লোক ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ বিলাতে বর্ণনা করিবার সময় অসম্ভব ও অসত্য কথা যে বলিয়া সাহেব বিবিদিগের মনে কেবল করুণারসের উদয় করিয়া দিয়া বাহাদুরী লইয়া থাকে, আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, মিস

বিল্‌বির কথাগুলি সেই শ্রেণীস্থ. কিন্তু সিন্ধুদেশ ভ্রমণ করিলে উক্ত ডাক্তার-বিবির কথা যে সমস্তই ঠিক বরং অপ্রচুর হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বঙ্গদেশে নবপ্রসূতির প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার হয় তাহা আমরা সকলে জানি। আঁতুড়ঘরগুলি যেরূপ ভয়ানক স্থান তথায় প্রসূতিকে অন্ততঃ আট দিন পর্য্যন্ত যেরূপ অগ্নিকুণ্ডের নিকট কঠোরভাবে থাকিতে হয়, ভিজে স্থানে প্রায় শয্যাহীন হইয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় শয়ন করিতে হয়, এবং যেরূপ অনর্থক কষ্টকর আহারাদি গ্রহণ করিতে হয় তাহা ভাবিলে বাস্তবিক বিস্ময় হইতে হয়, কিন্তু সিন্ধু রমণী সন্তান প্রসব করিলে তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার হয় তাহা শুনিলে হয়তো পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বোধ হইবে না। অসহায়ের সহায় ভগবান নিতান্তই আছেন, তাই তত্রস্থ স্ত্রীগণ সেই সঙ্কট সময়ে অত অত্যাচার, অত অনিয়ম সহ্য করিয়া আবার বাঁচিয়া উঠেন। সিন্ধু নারী সন্তান প্রসব করিবার সময় হইলে ধাত্রীর নিকট সংবাদ দেওয়া হয়, সেইযম-কিঙ্করী গৃহে আসিলে সকলেরই মনে আনন্দ হয় কিন্তু বোধ হয় কেবল প্রসূতিরই আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। ধাত্রীগণ সকল দেশেই সমান। তাহারা সচরাচর অতি নীচ জাতির লোক হইয়া থাকে, কিন্তু মেজাজটা দেখিলে বোধ হয় তাহারা কুইনভিক্টোরিয়ার যেন পিস্তুত ভগিনী। তাহাদের গৃহে অন্ন থাকুক বা না থাকুক, জজমানের বাটীতে সন্তান প্রসব হইবার কথা শুনিলে, তাহাদের অহঙ্কারে আর মাটিতে পা পড়ে না। পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসব হইলে গৃহে তাহাদের জুলুম দেখে কে? যদি অতি গরিব জজমান হয়, তাহা হইলেও তাহারা প্রথমেই রূপার ঘড়া ও গরদের কাপড় এবং নগদ ষোল টাকা না হাঁকিয়া ক্ষান্ত থাকে না। অবশেষে রফা করিতে করিতে হয় তো একটি আদুলী ও এক খানি ছেঁড়া কাপড় বিদায় লইয়া "গজর" "গজর" করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া যায়। আমরা বঙ্গদেশে জানি "ধাইমা" দের দর্পে গৃহস্তের গৃহ কম্পিত হয়। আজ কালকার নূতন রকমের শিক্ষিতা "ধাইমা" যাহারা হইতেছে তাহারা যদি এসম্বন্ধে একটু উন্নত হয় তাহা হইলেও দেশের অনেক উপকার হয়। সিন্ধুদেশের রমণীর প্রসব বেদনা হইলেই "ধাইমা" গৃহে আসিয়া, কতই আস্ফালন করে, নিজের গুণপনার ব্যাখ্যা করিয়া কতই গল্প করে তাহার স্থিরতা নাই। অমুকের কন্যা প্রসব হইবার সময় তাহার গায়ে দৈব বাতাস লাগিয়াছিল, সে প্রসব হইতে পারিতেছিল না, অমুক ডাক্তার সাহেব আসিয়া হার মানিয়া চলিয়া গিয়াছিল কিছুই করিতে পারে নাই শেষে এই তোমাদের "তুরে মা" ধাই গিয়ে দুইটা দুই স্থানে করিয়া দিল, একটি আঁচড়ও কাহার গায়ে লাগিল না ইত্যাদি গল্প করিয়া গৃহস্থের মনে সাহস দেয়। শয়ন গৃহের মেজের উপর ফোয়ারা বিশেষের মত আজব রকমের একটী হুকা চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাতে যে দীর্ঘ নল লাগান থাকে সেই নলে অম্লানবদনে "ধাইমা" মুখ লাগাইয়া খানিকটা তামাক পান করেন। বঙ্গদেশের মত আঁতুড়ঘরের কুৎসিত প্রথা তথায় নাই, এসম্বন্ধে সিন্ধুদেশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা প্রশংসনীয়। প্রসব কালে প্রসূতিকে বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে শয়ন ঘর তাহাতেই আনা হয় এবং তথায়ই প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রসব করাইবার সময় প্রসূতির প্রতি যে প্রকার অত্যাচার ও কঠোর ব্যবহার হয় তাহা বলা যায় না। প্রসবান্তে প্রসূতি এবং নবজাত সন্তানকে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় তৎপরেই দুই জন "ধাইমা" পদদ্বয় দ্বারা দুই দিক হইতে প্রসূতির কোমর ও উরত প্রাণপণ বলে চাপিতে থাকে। প্রসূতি সেই সঙ্কট ও মরণাপন্ন অবস্থায় তখন অবসন্ন ও প্রায় সংজ্ঞাহীন তাহার উপর দুই জন যমকিঙ্করীর ন্যায় পা দিয়া দুই দিক হইতে তাহাদিগকে সজোরে ঠেলিতেছে এবং এই চাপটি সুদৃঢ় হইবে বলিয়া ঘন ঘন পদাঘাত করিতেছে, এ অবস্থায় সেই অবলা অসহায় প্রসূতি অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া হয় তো মনে মনে ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে থাকেন। এই ভয়ানক ক্রিয়াটি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বা একঘণ্টা চলিয়া থাকে, তাহার পর পাঠিকা বিশ্বাস করিবেন কি? সেই "ধাইমার পদদ্বয় ক্রমে প্রসূতির উদরের উপর উঠিতে থাকে। প্রসবের পর স্ত্রীলোকের উদরের মধ্যে যে প্রকার বিপ্লোট হইয়া থাকে এবং ইহা যেরূপ বেদনার আধার হইয়া পড়ে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। "ধাইমা" সেই পীড়িত উদরের উপর অম্লান বদনে দণ্ডায়মান হন এবং পদদ্বয় দ্বারা কিয়ৎক্ষণ তাহা মাড়াইতে থাকেন। দুঃখিনী প্রসূতি হতজ্ঞান প্রায় হইয়া বেদনার জ্বালায় সময়ে সময়ে যে কত প্রকার মুখভঙ্গী করেন, কত কাতর মৃদুঃধ্বনি বাহির করেন এবং সকরুণস্বরে "আমায় আজ ছাড়িয়া দেও," "আমি আর পারিব না," "আমাকে দয়া কর" "তোমার পায়ে পড়ি" প্রভৃতি কত অনুনয় বিনয় যে করেন তাহা কে গণনা করে?

ক্রমশঃ—

সংবাদ।

আমাদের বিলাতের মহারাণীর ঊনসত্তোর জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২রা জুন ইংলণ্ডে ধুমধাম হইয়া গিয়াছে। মহারাজ্ঞীর জন্মদিন ২৪ শে মে তারিখ।

সম্প্রতি ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন মিত্রকে খুন করার অপরাধী তাহার পুত্রের বিপক্ষে মোকর্দ্দমা লইয়া কলিকাতায় ভারি গোল হইতেছিল, পিতৃহন্তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর সাজা হইয়াছে। নরপিশাচ অর্থের লোভে পিতাকে হত্যা করে, এবং তাহাকেও বধ করিতে উদ্যত হয়। সৌভাগ্য ক্রমে ভ্রাতা রক্ষা পায়। পিতার মৃত্যু হইয়াছে। শুনা যায় পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া যান যাহাতে পুত্র রাজ বিচারে প্রাণ দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়। দোষী কর্ত্তৃক প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করিবার কথা শুনা যাইতেছে।

মহারজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তারযোগে কুচবিহারের মহারাণীর এবং তাঁর নবজাত শিশুর তত্ত্ব লইতেছেন।

বড়লাট বাহাদুর লড ডফারিণ ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ একটি সুন্দর মূল্যবান রৌপ্য মেডেল পুরস্কার স্বরূপ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছাত্রি ঐ পারিতোষিক লাভ করিবে।

স্বর্ণরেণু।

প্রকৃত শিক্ষা-তাহাই যাহা জীবনের উপযোগী। প্রকৃত গুণ তাহা যাহা কোন সময় কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দেয়।

সকলবস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সকল জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রীতিজ্ঞান, এবং সকল বিদ্যা অপেক্ষা মহৎ ঈশ্বর তত্ত্ব লাভ।

যে মনে করে আমাতে দোষের বিষয় কিছু নাই তাহার উন্নতির সম্ভাবনা অল্প।

অধিক থাকিলেই যে অধিক আশক্তি হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যাহার মনে আসক্তি থাকে সে অল্পতেই জড়িত হইয়া পড়ে, যাহার মন নির্লোভি তাহার অধিক ধনেও আসক্তি থাকে না।

যাহার হৃদয় শূন্য তাহাকে বাহিরে সম্পদ ঐশ্বর্য্য সুখদিতে পারে না। যাহার হৃদয় পূর্ণ এবং সুখী তাহার পক্ষে বাহিরের অভাব ক্লেশকর নহে।

সকল বস্তুই পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু ভালবাসা কখনও পুরাতন হয় না, সকলের মনই কঠিন হইতে পারে কিন্তু মাতার স্নেহ কখনও কঠোর হয় না, ইহা চির নূতন।

বিবাহ অর্থ কেবল প্রেম ও সুখ নহে ইহার অর্থ ত্যাগস্বীকার ও আত্মসমর্পণ এবং জীবন উৎসর্গ। সেই বিবাহই যথার্থ বিবাহ যাহা উভয়কে ধর্ম্মের পথে ও পবিত্রতার পথে উন্নত করে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৩ সংখ্যা।] আষাঢ়, সন ১২৯৫। [১১ শ খণ্ড।

ভিক্টোরিয়া কলেজ।

ভিক্টোরিয়া কলেজ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার বহুকাল স্থাপিত স্ত্রীবিদ্যালয় পরিবর্ত্তিত হইয়াই এই আকারে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য ঐ স্ত্রীবিদ্যালয়ে এ দেশে বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বীজরোপণ বা সূত্রপাত হয়। উহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষা সম্বন্ধে উচ্চ পদ পাইয়া তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের পরিচয় দিয়াছেন ও বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। তাহার জন্য অবশ্যই তাঁহারা এ বিদ্যালয়ের এবং উহার সংস্থাপকের প্রতি কৃতজ্ঞ আছেন। যখন শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের দ্বারা এ দেশে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা পুরুষদের অনুরূপ হইয়া স্থাপিত হইল, তাহার কিছু পরে ভিক্টোরিয়া কলেজের জন্ম হয়, স্ত্রীলোকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, অথচ ঠিক যে প্রণালীতে পুরুষেরা শিক্ষিত হন সে প্রণালীর শিক্ষা না করেন। সংস্থাপক এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হইবার আশুফল দেখা গেল। কলেজ স্থাপনের এক বৎসরের মধ্যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীগণ উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন, পুরস্কার লাভ করিলেন।

এই গুলির শিক্ষার বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিল্প, চিত্রবিদ্যা, বাদ্য, রন্ধন রীতি, আর্য্যজাতির পুরা বিবরণ, সৃষ্টিতে ঈশ্বরের জ্ঞানকৌশল দর্শন, ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে কলেজের প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত। অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যক্তিগণ পক্ষান্তে বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষা দিতেন। ফাদার লাফেঁ প্রফেসার টমসন সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ইহাঁরা দুই বৎসর কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কলেজে সিনিয়ার জুনিয়ার দুই শ্রেণী। একটি বালিকাবিদ্যালয়ও ইহার সহিত সংযুক্ত। তাহার কার্য্য প্রত্যহ হয়, তাহাতে ছাত্রীগণ শিক্ষিত হইয়া কালে কলেজ শ্রেণীর উপযুক্ত হইতে পারিবেন। সিনি-

য়ার ক্লাশের ছাত্রীগণ ইংরাজীতে সেক্সপিয়ার বাইবেল গ্রন্থ পর্য্যন্ত, এবং জুনিয়র ক্লাশে ইমিটেসনঅপক্রাইষ্ট অবধি পরীক্ষা দিয়াছিলেন, সুবিদ্বান গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইত্যাদি, ব্যক্তিগণ পরীক্ষক হইয়াছিলেন। পরীক্ষায় সুফল হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় সংস্থাপক মহাত্মার পরলোকগমনের পর বিদ্যালয় সুশৃঙ্খলায় চলিতেছিল না। গত দুই বৎসর হইতে কুচবিহারের মহারাণী ইহার ভার গ্রহণ করিয়া বিধিমতে ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্ন করিয়াছেন, এবং অনেকটা কৃতকার্য্য হইতেছেন। এখন বালিকাবিদ্যালয়ে এক শতের অধিক ছাত্রী। বর্ত্তমানকালে বলিকাবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা জুনিয়র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বড়লাট এবং ছোটলাট বাহাদুরের পত্নী এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। ছাত্রীগণ সময়ে সময়ে রন্ধন কার্য্যেও শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে স্কুল বন্দ ছিল এখন হইতে প্রতি শনিবারে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। পরীক্ষার্থিনীগণ বক্তৃতার সার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন, এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। কেবল যে এখানকার ছাত্রীগণ পরীক্ষা দিবেন তাহা নহে, ইচ্ছা করিলে বিদেশস্থ মহিলাগণও পরীক্ষা দিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আবার স্বতন্ত্র পরীক্ষা এবং তদুপযুক্ত পারিতোষিক নির্দ্ধার্য্য হইবে। রন্ধন চিত্র এবং রচনা এই তিন বিষয়েও পৃথক পৃথক পরীক্ষা হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রীগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন, ইতিপূর্ব্বে যে পরিক্ষা হইয়াছিল তাহাতে বিদেশ হইতে কয়েকটি নারী পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এবারেও যাঁহারা বিদেশ হইতে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে আবেদন করিবার নিয়ম আছে। আগামী বৎসরের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের বক্তৃতা দিবার কথা আছে।

ফাদার লাফোঁ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, প্রফেসর টমসন্ সাহেব, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত। ডাং লেডি সুপিরিয়রেস্।

একজন লেডি সুপারিণ্টেডেণ্ট অর্থাৎ স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি কলেজ গৃহে বাস করিবেন এবং সমুদয় তত্ত্বাবধান করিবেন। বালিকা স্কুলের ইংরাজি শিক্ষার এবং গীত, বাদ্য, শিক্ষার ভার লইবেন। তদ্ভিন্ন শিক্ষাকার্য্য স্কুলের ভদ্র মহিলাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহারা প্রায় সকলে স্ত্রীবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্বছাত্রী এইটিই প্রশংসার বিষয়। স্কুলের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি বা সভা স্থাপিত হইয়াছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত বিদ্যালয় পুনর্জ্জীবিত করিয়া এবং তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া এবং উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য করিয়া কুচবিহারের মহারাজ ও মহরাণী এদেশের সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অনেক ব্যয়সাপেক্ষ, তাহার ভারও মহারাণী অকাতরে বহন করিতেছেন। ঈশ্বরপ্রসাদে এই প্রশংসনীয় কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হউন এবং তাঁহার সাধু মহাত্মা পিতার মনোরথ পূর্ণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। আমাদের অনুরোধ দেশ বিদেশস্থ সকলে এই বিদ্যালয়ের উৎসাহবর্দ্ধন করেন।

সুলোচনা।

গতপ্রকাশিতের পর।

দেখিলেন কি; দেখিলেন একটি বালক ও একটি বালিকা রোদন করিতেছে। রোদন করিবার শক্তি নাই মুখে বাক্যস্ফূর্ত হয় না, গলনলী শুষ্ক, তাহা দ্বারা শব্দ নির্গত হয় না, কেবল কাতর চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুমোচন করিতেছে। সম্মুখে একটি মৃত দেহ পতিত, আর একটি নারীমূর্ত্তি গলদেশে রজ্জুবদ্ধা হইয়া ঝুলিতেছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিয়া তিনি অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ ভাবে রহিলেন সেই বালক বালিকা দুটি অতি সুন্দর। তাহাদিগকে দাবদগ্ধ অরণ্য স্থিত গোলাপের ন্যায় অথবা হেমন্ত সমাগমে ভ্রষ্টশ্রী সরোবরস্থিত মলিন পদ্মযুগলের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

বালিকাটির বয়স কিঞ্চিৎ অধিক, সে তাঁহাকে নিকটে সমাগত দেখিয়া বলিল "তুমি কি আমার মার দেবতার বাড়ী থেকে আমাদের খবর নিতে এসেছ"।

আগন্তুক বলিলেন "তোমার মা কৈ? তাঁর দেবতার নাম কি?"

বালিকা বলিল, "আমার মা এই যে দড়ী গলায় দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, পিতা পীড়িত ছিলেন। ঘরে বস্ত্র অলঙ্কার বিছানা পত্র যা ছিল সমুদয় বিক্রয় করিয়া খাইলেন, পরিশেষে পিতা রোগ যন্ত্রণাতে ও অন্নকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিলেন, এই তাঁর মৃত দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে মা বলিলেন, "আমি আর এ দেহ ধারণ করিব না, আমি বাঁচিয়া থাকিলে ধর্ম্ম থাকিবে না, এ দুঃসময়ে কোন দুর্বৃত্ত লোকের হাতে পড়িলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে অতএব আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব।" এই বলিয়া এই রজ্জু গলায় বান্ধিয়া মরিলেন, আমরা দুইটি ভাই বোন বড় কাঁদিতে লাগিলাম তখন তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "কাঁদিও না, দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন" মা আমার বড় দেবতা ভাল বাসিতেন, সর্ব্বদাই দেবতার নাম করিতেন কিন্তু তাঁহার দেবতাকে আমরা কখন দেখি নাই, চিনি না, তাঁহার নাম কি, তাহাও জানিনা।'

আগন্তুক বালিকার কথা শুনিয়া প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন "হাঁগো আমি তোমার মার দেবতার লোক। সেই দেবতা তোমাদিগকে নিয়ে যেতে বলেছেন; তোমরা আমার সঙ্গে চল।"

বালিকা বলিল, "বাবা! কি করে যাব? আমি যে চলিতে পারিতেছি না। আজ প্রায় দুই দিন হইতে চলিল কিছু আহার করি নাই। ভাইটি আমার আর কাঁদিতেও পারিতেছে না। কত দূরে যেতে হবে?"

আগন্তুক বলিলেন, "তোমার ভাই টিকে আমি কোলে করে নিয়া যাই, তুমি একটু হেঁটে হেঁটে আমার সঙ্গে এস, অধিক দূরে নয়, ঐ দেখা যাচ্ছে।"

এই বলিয়া তিনি সেই বালক বালিকাকে সঙ্গে করিয়া পত্নীর নিকটে লইয়া গেলেন এবং পত্নীকে সমুদয় বিবরণ খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার পত্নী তখনি জলে চিনি মিলাইয়া সরবত করিলেন, তদ্দ্বারা বালক বালিকার ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবারণের চেষ্টা করিলেন তাহারা দুই দিন পরে পানীয় পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। ইতি মধ্যে যে সকল ভৃত্যেরা খাদ্যান্বেষণে গমন করিয়াছিল তাহারাও প্রতিনিবৃত্ত হইল। দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত স্থান, খাদ্য দ্রব্যের বড়ই অপ্রতুল। চতুর্গুণ মুল্য দিলেও খাদ্য সামগ্রী পাওয়া দুর্ঘট। তাই তাহাদিগের অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছিল। যা হউক তাহাদিগকে পাইয়া ইহাঁরা আশ্বস্ত হইলেন এবং যাহা কিছু খাদ্য পাওয়া গিয়াছিল তাহা দ্বারাই কোনরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তাঁহারা ট্রেণের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলা প্রায় ৩৷৷০ টার সময় ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই ট্রেণে উঠিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২য় অধ্যায়।

কলেজ ষ্ট্রীটের নিকটে একটি প্রশস্ত বাটীর দ্বারে একটি ভদ্রলোক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি প্রশান্ত, মূর্ত্তি সৌম্য, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, বয়স পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ বৎসর হইবে। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল তিনি যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন।

ইতি মধ্যে দুই খানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। একটি বাবু সত্বরে গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দ্বারস্থিত ব্যক্তির পদে অবনত মস্তকে প্রণাম করিল। দ্বারস্থ আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি হরিহর! পথেত কোন আপদ বিপদ হয়নি?"

হরি। আজ্ঞা আপদ বিপদ নহে কিন্তু অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা আছে, পরে বলিব।

যিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তিনি হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর। হরিহর পূর্ব্বে তারে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার অগ্রজন্মা সহোদর কনিষ্ঠের আগমনবার্ত্তায় হৃষ্টান্তঃকরণে দ্বারের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ ভাই স্নেহের পাত্র, বিশেষ তিনি কর্ম্মস্থান হইতে বহুদিন পরে গৃহে আগমন করিতেছেন, এ সংবাদ সকলেরই আনন্দবর্দ্ধক।

হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নরহরি গুপ্ত। নরহরি হরিহরকে বুকে চেপে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভাই অপেক্ষা আদরের ধন ভ্রাতুষ্পুত্র ও কন্যাদিগকে সস্নেহ সম্বোধনে ডাকিলেন। প্রসন্ন "জ্যেঠ মহাশয়!" বলে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে প্রণাম করিল। নরহরি সকল দলবল সহ হাসিতে হাসিতে উপরে গিয়া বৈঠক খানায় বসিলেন। হরিহরের পত্নী কন্যাপুত্র সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নরহরি নূতন বালকবালিকা দুইটিকে দেখিয়া হরিহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহারা কে?"

হরিহর দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থানে যে প্রকারে তাহাদিগকে যে অবস্থায় পাইয়াছিলেন, সমুদয় বর্ণন করিলেন। তাহাদের দুঃখের বৃত্তান্ত শুনিয়া নরহরির চক্ষু দুটি জলপূর্ণ হইল, হৃদয় আর্দ্র হইল। তার উপর তাহাদিগের মনোহর রূপমাধুর্য্য আরও তাঁহার চিত্তকে অধিকৃত করিল।

নরহরি হরিহর দুই ভ্রাতা বৈ সংসারে অন্য সরিক কেহ নাই। পৈতৃক বিষয় প্রচুর, তার উপর হরিহর চাকরি করেন। নরহরি নিঃসন্তান, বালক বালিকা দুইটিকে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্তান সন্ততি জনিত সুখভোগের লালসা হইল। কিন্তু সংসার অতিদুঃখের স্থান। এখানে সুখের ভিতরেও দুঃখ জন্মে। অথবা মানুষ সুখে থাকিলেও ডাকিয়া আনিয়া দুঃখকে আপনার সঙ্গী করিয়া লয়। নরহরির পত্নী এই ঘটনাতে অত্যন্ত বিরক্তি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিনের পর দেবর ও জাকে পাইয়া কোথায় আনন্দিত হইবেন, না তাহার বিপরীত ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সন্তান সন্ততি নাই, অথচ প্রচুর সম্পদ আছে। এই সম্পদ ভোগ করিবার তাঁহার কেহ নাই। দেবরের সন্তান সন্ততি সকলই তাহা ভোগ করে ও ভবিষ্যতে করিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। তার উপর আবার রাস্তার লোক ডাকিয়া আনা তিনি কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত কোপকষায়িত লোচনে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নরহরি আনন্দের সময়ে সেই কৃপণা ও কোপনা নারীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চলিলেন। হরিহরও তাঁহার পত্নী ঘটনা দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। চিত্র পুত্তলীবৎ নীরব ও নিষ্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিশেষে হরিহর নিরু-

পায় হইয়া পত্নীকে ইঙ্গিত করিলে তিনি রন্ধনাদি করিয়া অন্ন পরিবেশন করিলেন সে দিন আহারাদি করিয়া কোন ক্রমে কাটাইলেন। ক্রমশঃ

আসামদেশীয় স্ত্রীলোক।

বঙ্গীয় নারীর সঙ্গে আসামদেশীয় নারীর অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য নাই। বঙ্গদেশে যেমন কৃষ্ণবর্ণ কদাকার অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, সচরাচর আসামদেশীয় স্ত্রীলোক সেরূপ কাল কুৎসিত দৃষ্ট হয় না। অনেক আসামীয় নারী বিলক্ষণ সুশ্রী। সুনীল সুদীর্ঘ কেশভার আসামদেশীয় নারীগণ মস্তকে বহন করিয়া থাকে, এরূপ কেশশ্রী অন্য কোন জাতির যুবতীর ভাগ্যে বড় ঘটেনা। সুচিক্কণ সুদীর্ঘ কেশ লাভ করিয়াও আসামীয় নারীদিগের তৎপ্রতি যত্ন নাই। তাহাদের প্রায় কহাকেও বেণী গাঁথিয়া খোপা বাঁধিতে দেখা যায় না। পশ্চিম বাঙ্গলার মহিলারা এরূপ সুকেশী হইলে খোপার উপর খোপা স্তরে স্তরে কত বিচিত্র খোপাই ধারণ করিতেন। কেশদরিদ্রা ইয়ুরোপীয় সুন্দরীগণ যাহারা নকচুলা পরিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা আসামদেশীয় যুবতীদিগের স্বাভাবিক কেশ ভাগ্য দেখিয়া হয়ত অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিতা হন। আসামীয় সীমন্তিনীদিগের শিরোদেশ কেশপুঞ্জের ভার বহন করে মাত্র, কিন্তু তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অভরণভার বড় ভারাক্রান্ত হয় না। সচরাচর সকলেরই হস্ত পদ ও কটীদেশ অলঙ্কারশূন্য, সাধারণ যুবতীদিগের মণিবন্ধ আভরণশূন্য হওয়াতে কে সধবা কে বিধবা অনেক সময় নির্ব্বাচন করা কঠিন। কদাচিৎ কেহ কেহ মণিবন্ধে স্থূল আভরণ বিশেষ ধারণ করেন। সকলেরই কর্ণলতিকায় বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রবিষ্ট হইতে পারে এরূপ বৃহৎ ছিদ্র, সেই ছিদ্রের ভিতরে লোহিত বা পীতবর্ণের একপ্রকার প্রস্তর শলাকা প্রবিষ্ট থাকে. এই অপূর্ব্ব কর্ণাভরণের নাম থুরিয়া, থুরিয়া বালিকা হইতে বৃদ্ধানারী পর্য্যন্ত সকলেই আদর পূর্ব্বক পরিধান করেন, এই থুরিয়া পরিধান করিবার জন্য কর্ণে প্রকাণ্ড ছিদ্র করিয়া তাঁহাদিগকে কত কষ্টই না সহ্য করিতে হয়। অনেকে সুবর্ণময়ী থুরিয়া পরিধান করেন. কেহ কেহ সেই প্রস্তর খণ্ড স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া নানা কারুকার্য্য করিয়া থাকেন। তাহারা কণ্ঠদেশে তাবিজ বা মাদুলির হার, গরিব স্ত্রীলোকেরা পুঁতির মালা পরিধান করে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন অঙ্গ, অভরণ দ্বারা সজ্জিত হয় না। সভ্যা মহিলাদিগের ন্যায় তাহারা পদে মুজা জুতা ধারণ করে না। আসামীয় নারিদিগের পরিচ্ছদ বঙ্গীয় নারীদিগের পরিচ্ছদ অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ও রুচিকর। তাহারা কটীদেশে স্থূল বস্ত্রের মেখলা পরিধান,

এবং কামিজ দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃত করে, কামিজের উপর রেহা তদুপরি খুনিয়া ধারণ করিয়া থাকে। কেবল ব্রাহ্মণ জাতীয় যুবতীগণ কামিজ ব্যবহার করে না। মেখলা বৃহৎ তাকিয়ার খোলের ন্যায় মণ্ডলাকার বস্ত্র বিশেষ, রেহা ৮৯ হাত দীর্ঘ অল্প পরিসর চাদর, ইহা দ্বারা তাহারা পশ্চাদ্ভাগ হইতে সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত কোমর জড়াইয়া বক্ষের উপর দিয়া উভয় স্কন্ধের পশ্চাদ্দেশ আবৃত করে। খুনিয়া শাল বা দোলাইয়ের ন্যায় তাহার দ্বারা আসামীয় যুবতীগণ মস্তক পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া থাকে। সচরাচর তদ্দেশীয় সকল নারীই তসরের রেহাও মেখলা পরিধান করে। অক্ষম দরিদ্রা নারীগণই কেবল নিরবচ্ছিন্ন কার্পাস সূত্রের বস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। গরিব স্ত্রীলোকেরা একমাত্র মেখলা বক্ষের উপর পরিধারণ করে। রেহার ও খুনিয়ার উভয় অঞ্চলে নানা কারুকার্য্য হইয়া থাকে। এই সকল বস্ত্র আসামীয় নারীগণ স্বহস্তে প্রস্তুত করে। তাহারা ভিন্নদেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করে না, বস্ত্রের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে না, প্রত্যেকের গৃহে বস্ত্র বয়ন জন্য তাঁত আছে। ভদ্রাভদ্র ধনী দরিদ্র সকল নারীই বস্ত্র বয়ন করিতে পারে। এক সময়ে আসামের রাজ্ঞী পর্য্যন্ত বস্ত্র বয়ন করিতেন। তাঁহাদের এই পরিচ্ছদ প্রণালীতে যেমন লজ্জা নিবারণ হয়, তেমন ভদ্রতা রক্ষা পায় শরীরেরও শোভা বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকেরা পানের সঙ্গে অতিরিক্ত খয়ের বা অন্য কোন কষায় সামগ্রী ব্যবহার করিয়া দশন পুঁক্তি অতিশয় কাল করিয়া থাকে। আসামীয় নারীদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রায় নাই। ভদ্রাভদ্র সমুদয় স্ত্রীলোক নগরের রাজপথ দিয়া পদব্রজে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকে বঙ্গদেশের ন্যায় অবগুণ্ঠনের প্রথা এদেশে নাই। ভদ্র স্ত্রীলোকেরা রাস্তার বাহির হইতে হইলে ঝাঁপি নামক গোলপাতার ছত্র বিশেষ মস্তকে ধারণ করিয়া বাহির হয়। ঝাঁপি আমাদের দেশের কৃষকদিগের ব্যবহার্য্য মাতলার সদৃশ, কিন্তু উহা মাতলা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ ও সুচিক্কণ কারুকার্য্যযুক্ত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ বাহির হইলে একটি বৃহৎ ঝাঁপি একজন লোক ধারণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে। আসামে স্ত্রীলোকেরই প্রাধান্য স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবল। অথচ বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা যে এদেশীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে চরিত্রদোষ ও ব্যভিচার প্রবল এরূপ বলা যায় না। আসামীয় নারীগণ অত্যন্ত সরল প্রকৃতি, তাহারা কুটিল দৃষ্টি কুটিল ভাবভঙ্গি, উপহাস বিদ্রূপ কুৎসিত আমোদ প্রমোদ এক প্রকার জানে না বলিলেই হয় সচরাচর তাহারা স্বাধীনভাবে পুরুষদিগের সঙ্গে মিশ্রিত হইতেছে, অথচ চরিত্র বিশুদ্ধ আছে, তবে কুচরিত্র বাঙ্গালী

বাবু দ্বারা এবং চা বাগিচার নর পিশাচ সাহেবদিগের দ্বারা প্রমুগ্ধ হইয়া অনেক আসামী নারীর চরিত্র নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

সাধারণ অসামীয় লোক দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা বিরল, কিন্তু নীচ জাতীয় লোকের মধ্যে বিবাহবন্ধন শিথিল। একজন যুবতী রীতিমত বিবাহিতা না হইয়া একজন যুবকের আশ্রয়ে বিশ্বস্ত পত্নীর ন্যায় চিরকাল স্থিতি করে, তাহার সন্তানাদি হয়, তাহাতে সমাজে কোন রূপ দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। কেবল অপর জাতীর পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইলে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মৃত্যুর পুর্ব্বে একবার বিবাহ হওয়া চাই তাহা না হইলে অসদ্‌গতি হয়, শরীর শুদ্ধ হয় না, তজ্জন্য সন্তানাদি হইলে পর এমন কি পুত্র পৌত্রাদি হইলে পর বৃদ্ধ বয়সে অনেকে রীতিপূর্ব্বক বিবাহিত হইয়া থাকে। স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অনেক স্ত্রী অবলম্বিত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করে, এইরূপ স্বামিত্যাগের মোকদ্দমা সচরাচর আসামে হইয়া থাকে। কোন কারণে পত্যন্তর গ্রহণ করিলে পূর্ব্ব পতিকে নির্দ্ধারিত কিঞ্চিৎ অর্থ স্ত্রীর দেয় হয়। এই প্রথা যে অত্যন্ত জঘন্য তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা নীচশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই প্রচলিত। ভদ্রলোক দিগের মধ্যে এরূপ প্রথা নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি ভদ্র জাতির মধ্যে যথারীতি উদ্বাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণগণ বাল্যকালে কন্যা দান করিয়া থাকেন কিন্তু কন্যা বয়স্থা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর মুখ অবলোকন করিতে পারেনা। অন্য অন্য ভদ্রলোকের মধ্যে বাল্য বিবাহও হয় এবং কন্যার যৌবন কালেও বিবাহ হইয়া থাকে। বাল্য কালে বিবাহ হইলে কায়স্থ কন্যাগণও যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্বামী মুখ অবলোকনে বঞ্চিত থাকে। কিরূপ প্রণালিতে ইহাদের বিবাহ হয় তাহা একবার পরিচারিকাতে বিবৃত হইয়াছে, তজ্জন্য তদ্বিবরণ আর লিপিবদ্ধ হইল না।

আসামীয় নারী সুচতুরা ও অতিশয় শ্রমপরায়ণ, তাহারা দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে। পুরুষগণ তদ্বিপরীত স্বভাবাপন্ন। তাহারা আফিং খাইয়া প্রায় অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। অনেক স্ত্রী অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বামীকে প্রতিপালন করে। সংসারের প্রায় সমুদায় কাজকর্ম্ম স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের মধ্যে পুরুষেরা হলচালন মাত্র করে, ক্ষেত্রের অপরাপর কার্য্য ও শস্যকর্ত্তন সংগ্রহ ও রক্ষা স্ত্রীলোকদ্বারা হয়। শিবসাগর নগরে প্রতিদিন অপরাহ্নে চালডাল তরকারি ও মৎস্যাদির বাজার বসিয়া থাকে, লেখক একদিন সেই বাজারে যাইয়া দেখেন যে তথাকার ক্রেতা বিক্রেতা প্রায় সমুদায়ই স্ত্রীলোক। এরূপ স্ত্রীর

হাট লেখক কোনস্থানে কখন দেখেন নাই। প্রস্তাবলেখক কিয়দ্দিন হইল কিছু কাল উপর আসামের অন্তর্গত শিবসাগরে স্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার আবাসের সম্মুখভাগে মেথর জাতীয় কয়েক জন লোকের বাড়ী ছিল। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আসামের মহারাজের মেথরের কার্য্য করিত, তখন তাহাদের ললাটদেশে মেথর জাতীয় চিহ্নরূপ ঝেঁটা উল্কিযোগে অঙ্কিত থাকিত। এইক্ষণ ইহারা সুবর্ণবণিকের কার্য্য করিয়া থাকে, ভদ্রলোকের ন্যায় ইহাদের আচার ব্যবহার হইয়াছে। এই মেথর জাতীয় এক জন লোকের একটি পরম রূপবতী যুবতী কন্যা আছে। সে তথাকার বালিকা বিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়াছে, অলঙ্কার-নির্ম্মাণে ও বস্ত্রবয়নে সুনিপুণা। এই একটি কন্যার সাহায্যে পিতা ভাগ্যবান্ হইয়াছে। দুই তিনটি পুত্রে যে কার্য্য করিতে পারে না, তাহার এক কন্যা সে কার্য্য করিতেছে। একটি উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যা বিবাহিত হইতে চলিয়াছিল, পিতা মাতা বাধা দেওয়াতে, তাহারা কন্যা সহ জামাতাকে গৃহে রাখিবার ইচ্ছা করাতে বরের অসম্মতি প্রযুক্ত বিবাহ হইতে পারে নাই। তজ্জন্য মকদ্দমা হইয়াছে, বর এক শত টাকা অঙ্গীকার ভঙ্গ জন্য ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিয়াছে। কন্যা অতিশয় গুণবতী ও উপার্জ্জনশীলা স্বার্থপর পিতা মাতা তাহাকে কিছুতেই দূরে বিবাহ দিতে চাহে না। তাহার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইয়াছে, এইক্ষণ তাহার উপযুক্ত পাত্রেরও অভাব।

আসামীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তেমন স্থানে স্থানে দেখা যায় প্রতিদিন নামঘরে অনেকে একত্র মিলিত হইয়া ভগবানের নাম গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। আসামীয় স্ত্রীলোকেরা টেঙ্গা (টক) অত্যন্ত ভালবাসে। শ্রুত হইল আসামে তেঁতুল, চালতে, করংজা ইত্যাদি ৪৯ প্রকার অম্লফল উৎপন্ন হয়। বীচে কলা ও টক দধি সে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ প্রিয়খাদ্য। অনেকে কাঁঠাল পাকিতে দেয় না, লবণসংযুক্ত করিয়া কাঁচা কাঁটালই কচ্ কচ্ করিয়া চিবাইয়া খায়। চৈত্র সংক্রান্তি বা বিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে ১০। ১৫ দিন ব্যাপিয়া আসামীয় স্ত্রীলোক অতিশয় প্রমত্তভাবে বাড়ী বাড়ী যাইয়া অশ্লীল নৃত্য গীত করিয়া থাকে। এই আমোদের ব্যাপারকে তাহারা "বিহু" বলে। ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই সাধারণতঃ এই কুৎসিত আমোদে মত্ত হইয়া উঠে। ভদ্র মহিলারা যে তাহাতে একেবারে যোগ দান করে না, তাহা নয়। পূর্ব্বে সচরাচর ভদ্র স্ত্রীলোকেরাও বিহুর অশ্রাব্য গান সকল করিতেন, এইক্ষণ তাহা অনেক কমিয়াছে। নগাঁও শিবসাগর ছাড়া অন্যত্র বিহুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব নাই।

এই বিহু উপলক্ষে অনেক যুবক যুবতীর চরিত্র কলুষিত হয়। ইহা আমাদের দেশের দ্বিতীয় সংস্কারের আমোদের ন্যায় নীচ জঘন্য আমোদ। এ দেশে প্রবাদ যে বাঙ্গালি যুবা আসামে গেলে তথাকার স্ত্রীলোকেরা তাহাকে ভেড়া করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এ দেশীয় পুরুষগণ তীর্থ পর্য্যটন বা বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে আসামে যাইয়া পথের দুর্গমতা ও ব্যয় বাহুল্যপ্রযুক্ত সচরাচর দেশে বড় ফিরিয়া আসিতেন না। সেখানেই বিবাহাদি করিয়া থাকিতেন। তথাকার স্ত্রীলোকের আকর্ষণও ছিল।

কচ ও দেবযানী।

সুনীতি।

পূর্ব্বে দেবতারা মরিত এবং মরিলে আর বাঁচিত না। কিন্তু অসুরেরা মরিলেও গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের কৃপাতে পুনর্জীবিত হইত। দেবতা এবং অসুর, ইহাদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে, দেবতাদিগের সঙ্গে বিবাদে অসুরেরা পরাজিত হইলেও বিজয়ী, কেন না মরিলেই শুক্রাচার্য্য বিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। দেবতারা মরিলে আর বাঁচিবার উপায় ছিল না। কেন না সঞ্জীবনী বিদ্যা শুক্রাচার্য্য ব্যতীত আর কেহ জানিত না। এই কারণে দেবতাদিগের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল, আর অসুরেরা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বড়ই চিন্তিত হইলেন এবং বৃহস্পতির পুত্র কচকে শুক্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। কচ দেবকার্য্য সাধনের জন্য শুক্রাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি ঋষিরাজ অঙ্গিরার পৌত্র, এবং বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আমাকে আপনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন, আমি আপনার আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া সহস্র বৎসর থাকিব।"

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "হে কচ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার বাক্য গ্রহণ করিলাম, তুমি অর্চ্চনীয়, আমি তোমার অর্চ্চনা করিব। আর তোমার পিতা বৃহস্পতিকেও আমি সম্মান করি।"

তার পর কচ "যে আজ্ঞা" বলিয়া শুক্রের আদেশে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং গুরু শুক্রাচার্য্য ও তাঁহার কন্যা দেবযানীর যাহাতে সন্তোষ হয়, কচ সর্ব্বদা অতি সাবধানে তাহা সম্পাদন করিতেন। কখন আলস্য বা ঔদাস্য করিতেন না। সেই যুবক কচ প্রতি দিন পুষ্প চয়ন করিয়া দেবযানীকে প্রদান করিতেন, বনান্তর হইতে ফল মূল আহরণ করিয়া অর্পণ করিতেন। নৃত্য কিম্বা গীত যাহা দেবযানী করিতে বলিতেন তাহাই করিয়া দেবযানীর মনস্তুষ্টি করিতেন, দেবযানী ও সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী বিপ্রকে গীত বাদ্য ও নৃত্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। কচ যুবক দেবযানী যুবতী হইয়াও নির্জ্জনে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বা সন্দেহ করিতেন না। তৎকালে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি লোকের একান্ত বিশ্বাস ছিল। এই প্রকার নিয়মে ব্রতচারী হইয়া বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রের সেবা করিয়া পাঁচ শত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তৎপর দানবগণ তাঁহাকে চিনিতে ও তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল। পরে একদিন শুক্রের গাভী চরাইতে কচ বনে গিয়াছেন, অসুরেরা (মৃত সঞ্জিবনী বিদ্যা রক্ষা করিবার ইচ্ছাতে) নির্জ্জন বনস্থিত কচকে বধ করিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিল এবং শেয়াল ও বৃক প্রভৃতিকে খাইতে দিল। পরে সূর্য্য অস্তগত হইলে গাভী সকল আপনা আপনি গৃহে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু গোপ কচ আসিল না।

দেবযানী দেখিলেন, গরু সকল আপনি গৃহে আসিল কিন্তু কচ আসিল না। তখনি তিনি পিতাকে বলিলেন, "হে পিতঃ! তোমার অগ্নিহোত্র আহুত হইয়াছে, সূর্য্য অস্ত গমন করিয়াছে, আর গাভী সকল গোপাল (কচ) ব্যতীত গৃহে আসিয়াছে কিন্তু কচকে দেখা যাইতেছে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কচকে কেহ বধ করিয়াছে অথবা অন্য কোন কারণে সে মরিয়াছে। তোমাকে সত্য বলিতেছি, সেই কচ ব্যতীত আমি জীবন ধারণ করিব না।" শুক্র বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা কি? এই এস বলিয়া ডাকিব, আর মৃতকে বাঁচাইব" তৎপর শুক্রাচার্য্য কন্যার অনুরোধে সেই কচকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন কচকে দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি এত বিলম্ব করিয়া আসিলে?" কচ বলিলেন, "অসুরেরা আমাকে একাকী নির্জ্জনে পাইয়া বধ করিয়াছিল। এবং আমার অস্থি মাংস সকল বন্য পশুদিগকে খাইতে দিয়াছিল। "এখন তোমার পিতার কৃপাবলে পুনর্জীবিত হইয়া আসিলাম।"

তার পর আর একদিন, কচ দেবযানী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, বনমধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে পুষ্প চয়ন করিতেছেন। অসুরেরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে একেবারে পেষণ করিয়া সমুদ্র জলে ফেলিয়া দিল। দীর্ঘকাল অতীত হইলে দেবযনী পুনর্ব্বার পিতাকে সেই কথা জানাইলেন। এবং শুক্রাচার্য্য বিদ্যাবলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। তার পর তৃতীয় বারে তাহাকে বধ করিয়া পোড়াইল এবং দগ্ধ করিয়া সুরার সহিত মিলাইয়া শুক্রাচার্য্যকে ভোজন করাইল। পুনর্ব্বার দেবযানী পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ! বোধহয় কচ কোন কারণে হত বা মৃত হইয়াছে

সে ব্যতীত আমি জীবন ধারণে অসমর্থা।"

শুক্র দেবযানীকে বলিলেন, "হে পুত্রি! বৃহস্পতির পুত্র পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যাবলে আমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ বাঁচাই অসুরেরা পুনঃ পুনই তাহাকে বধ করে, আমি আর কি করিব ? হে দেবযানি! এরূপ শোক ও রোদন করিও না, তোমার মত কোন মনুষ্য অনুশোচনা করে না। ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ সকল, ইন্দ্র ও দেবগণ, বসু সকল ও অশ্বিনী কুমার দ্বয়, এবং অসুর প্রভৃতি সমুদয় জগৎ মৃত্যুর অধীন। আমি অবশ্যই বিদ্যাবলে তাহাকে বাঁচাইতে পারি, কিন্তু অসুরেরা পুনর্ব্বার তাহাকে বধ করিবে।"

দেবযানী বলিলেন, "অতিবৃদ্ধ অঙ্গিরা যাহার পিতামহ এবং তপোধন বৃহস্পতি যার পিতা। যিনি ঋষির পুত্র ও ঋষির পৌত্র তাঁহার জন্য শোক করিব না ও রোদন করিব না কেন? তিনি ব্রহ্মচারী, তপোনিষ্ঠ এবং সর্ব্বদা প্রস্তুত ও কর্ম্মেতে দক্ষ। আমিও সেই কচের পথে গমন করিব, আহার করিব না। হে পিতঃ! কচ আমার অতি রমণীয় ও প্রিয়।"

সেই মহর্ষি শুক্র প্রিয়পুত্রী দেবযানী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কচকে ডাকিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন, "নিশ্চয় অসুরগণ আমার প্রতি বিদ্বেষ করে। কেন না তাহারা আমার শিষ্যদিগকে বধ করে। এবং সেই উগ্র অসুরগণ নানা প্রকার ব্যভিচারে ফেলিয়া আমাকে অব্রাহ্মণ করিতে চাহে। এই মহাপাপের এই স্থানেই কি শেষ? ইন্দ্রতুল্য লোক হইলেও ব্রহ্মহত্যা কাহাকে না দগ্ধ করে?" গুরুও তাঁহাকে ডাকিয়া সন্ধান পাইলেন না বলিয়া ভীত হইলেন। তার পরে ক্রমে উদরের ভিতরে শব্দ শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিপ্র! কোন পথ অবলম্বন করিয়া জঠরে উপনীত হইয়াছ, তাহা বল" কচ বলিলেন, "আপনার প্রসাদে আমার স্মৃতি উজ্জ্বল আছে, যে প্রকারে যাহা হইয়াছে সমুদয় আমার স্মরণে আছে। এ ঘটনা দ্বারা আমার তপঃক্ষয় হয় নাই, এই জন্যই আমি অত্যন্ত ভয়ানক ক্লেশ ভোগ করিতেছি। হে কাব্য! অসুরগণ আমাকে বধ করিয়া পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিলাইয়া আপনাকে অর্পণ করিয়াছে, ব্রাহ্মী এবং আসুরী এই দ্বিবিধ মায়া আপনাতে থাকিতে কিরূপে ইহারা তোমাকে অতিক্রম করিল?"

তখন শুক্র দেবযানীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "হে বৎসে! কিরূপে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব? আমার বিনাশ ব্যতীত কচের অন্য জীবনোপায় নাই। হে দেবযানি! আমার কুক্ষিভেদ করিলে আমাতে কচকে দেখিতে পাইবে!"

দেবযানী বলিলেন, "দুইটি অগ্নিকল্প শোক আমাকে দগ্ধ করিতেছে, এক কচের বিনাশ, দ্বিতীয় তোমার উপঘাত। কচের বিনাশেও আমার কল্যাণ নাই, তোমার উপঘাতেও আমি জীবন ধারণ করিতে অসমর্থা।"

শুক্র কচকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বৃহস্পতির পুত্র! তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, যে হেতু দেবযানী তোমাকে প্রিয় ভক্ত জানিয়া ভজিতেছে। যদি কচরূপধারী ইন্দ্র না হও আমার যে সঞ্জীবনী বিদ্যা আছে ইহা তুমি প্রাপ্ত হও। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ আমার উদর হইতে সজীব অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিত না। অতএব তুমি আমার বিদ্যা প্রাপ্ত হও এবং পুত্র হইয়া হে তাত! আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হও এবং আমাকে বাচাও গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া সবিদ্য হইয়া ধর্ম্ম দৃষ্টি রাখিতে ভুলিও না।"

পরে কচ গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া শুক্রের কুক্ষি ভেদ করিলেন এবং শুক্লপক্ষের শেষে পৌর্ণমাসীর চন্দ্রের ন্যায় বাহির হইলেন। কচ সেই ব্রাহ্মণ্যতেজোরাশি শুক্রকে মৃত এবং পতিত দর্শন করিয়া বিদ্যাবলে পুনর্জীবন দান করিলেন এবং উঠাইলেন। তিনি সেই সিদ্ধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া গুরুকে প্রণতি করিয়া বলিলেন, "যিনি শ্রবণদ্বয়ে অমৃত সিঞ্চন করেন, বিদ্যাবিহীনের বিদ্যাদাতা, যিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর মুখ হইতে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহাকে আমি পিতা ও মাতা বলিয়া সম্মান করি, তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহার প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে পারি না, সকল নিধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধিরূপ অতি উৎকৃষ্ট সত্যদাতা গুরুর নিকট বিদ্যালাভ করিয়া যাহারা সেই অর্চ্চনীয় গুরুর সমাদর করে না, সেই অপ্রতিষ্ঠ লোকেরা পাপলোক প্রাপ্ত হয়।"

জ্ঞানী হইয়াও সুরাপান হেতু, চেতনা হারাইয়া কচকে তাদৃশ অভিরূপ (পণ্ডিত বা সুন্দর) দর্শন করিয়াও মোহবশতঃ সুরা সহ পান করিয়াছিলেন, এই জন্য শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণজাতির হিতের জন্য সুধাপানের প্রতি বিরক্ত চিত্তে এই কথা বলিলেন, "অদ্য হইতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া মোহবশতঃ সুরাপান করিবে সেই মন্দ বুদ্ধি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইবে এবং ইহ পর লোকে নিন্দিত হইবে। আমি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এই মর্য্যাদা সর্ব্বলোকে স্থাপন করিলাম; সাধুসজ্জনগণ, ব্রাহ্মণ সকল, গুরু শুশ্রূষাকারী মানব সকলে ও দেবতা সকলে শ্রবণ করুন।" পরিশেষে তিনি দানবদিগকে ডাকিয়া নানা প্রকার তিরস্কার করতঃ বলিলেন "হে পাপাসক্ত দানবগণ! তোমরা শোন, কচ আমার নিকট সঞ্জিবনী বিদ্যালাভ করিয়া আমার তুল্য ক্ষমতাবান হইয়াছে, এই

ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণ আমার শিষ্য, আমার গৃহে বাস করিবে, কেহ পুনর্ব্বার ইহার প্রতি অনাচার করিও না।"

দানবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। কচ তার পর প্রতিজ্ঞাত সহস্র বৎসর গুরু সেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সমাকর্ত্তন করিলেন। গুরুর আজ্ঞা লইয়া দেবভবনে চলিলেন।

যাইবার কালে যিনি কৃপা করিয়া বার বার জীবন দান করিয়াছেন সেই দেবযানীর নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। দেবযানী এত কাল কেবল কচের ব্রতভঙ্গ ভয়ে নীরব ছিলেন, এইক্ষণে সময় বুঝিয়া কচকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন "হে কচ! তুমি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ. এবং বিদ্যা ও তপস্যা বলে বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছ। এখন তুমি সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহে যাইতেছ, অতএব আমায় যথাবিধি বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া চল। আমি তোমার অনুগতা ইহা তুমি জান।"

কচ বলিলেন, "তোমার পিতা আমার সম্বন্ধে যেরূপ পূজ্য ও মাননীয়, সেইরূপ তুমিও আমার পূজনীয়া গুরুপুত্রী, আমাকে ওরূপ কথা বলিও না।"

দেবযানী। তুমি গুরু পুত্রের (বৃহস্পতির) পুত্র কিন্তু আমার পিতার পুত্র নহ। হে দ্বিজোত্তম! সেই জন্য তুমিও আমার মাননীয় ও পূজ্য। হে কচ! অসুরেরা পুনঃপুনঃ তোমাকে বধ করিয়াছিল, তদবধি তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও অনুরাগ কিরূপ তাহা স্মরণ কর। তোমার প্রতি সৌহার্দ্দে ও অনুরাগেতে আমার অচল নিষ্ঠা জানিও। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার ভক্ত ও নিষ্পাপ আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে।" (ক্রমশঃ)

সিন্ধুদেশ ও সিন্ধুরমণী।

গতপ্রকাশিতের পর।

পাষাণহৃদয়া গণ্ডমূর্খ ধাইমার কর্ণকুহরে ইহার একটু শব্দও প্রবেশ করে না, তাহাতে তাহার হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হয় না। তিনি হয় তো তাহাতে আর উৎসাহিত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাকেন এবং "অত্যন্ত অসহিষ্ণু এবং বাচাল" এই সমস্ত অপবাদ দ্বারা তিনি প্রসূতিকে সময়ে সময়ে নিরস্ত করিতে ত্রুটি করেন না। এই সকল দয়ার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে যাইবার সময় প্রসূতির পেটকে একখানি লেপ দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি বার চৌদ্দ সের ভারি একখানি প্রস্তরের জাঁতা চাপাইয়া দিয়া গৃহে শুভ গমন করেন। সেকালে যে শুনিতাম, কংশ প্রভৃতি হিন্দুরাজার জেলখানায় কয়েদীদিগের বুকে জগদ্দল পাথর চাপান হইত, তাহারা নড়িতে চড়িতে পারিত না। জগদল পাথর কি তাহা আমরা জানি না, কিন্তু নবপ্রসূতি সিন্ধু-

রমণীদিগের অবস্থা ভাবিয়া সেই সকল কথা মনে পড়ে। এই জাঁতাখানি তাঁহার পেটের উপর প্রথম দিন দশ পনের মিনিটের অধিক থাকে না। পর দিন প্রাতে ধাইমা আবার শুভাগমন করিয়া চরণদ্বয় দিয়া প্রসূতির পেটের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উপরিউক্তরূপে মাড়াইতে থাকেন, এবং বিদায় কালে পেটের উপর পূর্ব্বমত জাঁতা চাপাইয়া চলিয়া যান। জাঁতাখানি অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ থাকে, এইরূপ শুশ্রূষা তাঁহারা আট দশ দিন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তাহাদের বিশ্বাস যে প্রসব করিলে স্ত্রীলোকের পেটের নাড়ী স্থানভ্রষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ চাপ দিলে সে সমস্ত যথা স্থানে আসিয়া বসে। কিন্তু তাহাদের চিকিৎসায় কত রমণী যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রসবের পর স্ত্রীলোকের ভয়ানক জ্বর রোগ প্রায়ই হইয়া থাকে। আমরা আমাদের প্রস্তাবের প্রথমেই বলিয়াছি যে কেবল ভগবান্ আছেন বলিয়া সিন্ধি-নারীগণ প্রসবের পর আবার বাঁচিয়া উঠেন। সুরা এই সময়ে ঔষধ বলিয়া প্রসূতিকে পান করিতে হয়। স্ত্রীলোক পূর্ণগর্ভা হইলেই তাহার পিতা মাতা ও স্বামী তাহার জন্য মদের জোগাড় করিয়া রাখেন। প্রসূতির একমাত্র পথ্য ঘৃত। সিন্ধুদেশে এইরূপ প্রবাদ যে প্রসব করিলে যে নারী এক মোন ঘৃত ভক্ষণ না করে তাহার শুশ্রূষা হয় না। ভাত রাঁধিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তাহা পেষণ করিয়া ঘৃতে আর্দ্র করিয়া তাহার লাড়ু করা হয়, ইহাই প্রসূতির প্রধান খোরাক, ইহার নাম "কুটি"। খাইতে ইহা জগন্নাথের অটকে প্রসাদের মত! পুরি মালপোয়া কুটি প্রভৃতি নানা প্রকারে খাদ্য দ্রব্যে ঘৃত ব্যবহার হয়। যে গৃহে নবশিশু প্রসূত হয়, তাহাতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের আর আমোদের সীমা থাকে না। প্রসূতির জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহার অংশী তাহারা হয়, সমস্ত দিন "টোল" অর্থাৎ জলখাবার বস্তুতে তাহাদের বদন ভরা থাকে। সন্তান প্রসব হইলে ছয় দিনে তাহার নামকরণ হয়।

সিন্ধুদেশে বঙ্গদেশীয় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম ও দেবদেবী পূজার রীতি প্রায় নাই। কালী দুর্গার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ হনুমানের মূর্ত্তিও বিরল। গুরু নানকের ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে মূর্ত্তিপূজা রীতি তথায় অল্পই আছে। তাহারা শিখধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া থাকে এবং শিখ গ্রন্থের প্রতি যেরূপ সমাদর, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি তদ্রূপ নহে। শিখ "টিকানা" অর্থাৎ ধর্ম্মশালা সকল এদেশীয় কালিবাড়ী দুর্গাবাড়ীর স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এবং শিখ ভাইগণ ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা অধিক সম্ভ্রম লাভ করেন। শিখধর্ম্মের ঈদৃশ প্রাদুর্ভাব হইলেও এদেশীয়

লোকগণ গুরুগোবিন্দ সিংহের কেশধারী ও কড়াধারী সিং নহে। অহংব্রহ্মের মত ও বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্মের এখানে প্রাদুর্ভাব আছে। সিন্ধগণ বিদেশীদিগের বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগের প্রতি অত্যন্ত সদয়। যে কয়জন বঙ্গবাসী হাইদ্রাবাদে ও করাচিতে গমন করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদিগের সিন্ধি ভ্রাতাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখকের প্রতি তাঁহারা যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সহোদর ভ্রাতাও অনেক সময় করে না। সিন্ধুদেশে বঙ্গদেশের মত তরকারী সকল উৎপন্ন হয় না, সুতরাং নিরামিশ তরকারীর ব্যবহার তথায় তত নাই, মাংস তথায় বহু প্রকারে ব্যবহৃত হয়, এবং ঘৃত পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি দিয়া এরূপ উত্তম ও বড়মানুষী রীতিতে তাহা রন্ধন হয় যে নবাব বাদসাদিগেরও তাহাতে লোভ হয়। দেশীয় লোকের অত্যন্ত ভদ্র ও সুন্দরকায়, ছোট ছোট ছেলেরা যেন দেবপুত্র এবং গন্ধর্ব্ব পুত্র বলিয়া বোধ হয়। সিন্ধি স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেরা ভারতবর্ষে সতীত্বের জন্য প্রসিদ্ধ, আমাদিগের বোধ হয় যে সিন্ধীনারীগণ এই পরম ধর্ম্ম সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক পুণ্যবতী। সুরাপান তত্রস্থ নারীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু আমরা অবগত হইলাম, তাহারা তাহা কেবল ঔষধার্থ পান করিয়া থাকে, মত্ততার জন্য নহে—এখনকার নব্য সম্প্রদায়স্থ নারীদিগের মধ্যে সুরাপান প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। হাইদ্রাবাদে দেওয়ান নেবেল রাও নামে একজন দেশহিতৈষী অত্যন্ত সুচরিত্র উচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী ভদ্রলোক আছেন। ইনিই সিন্ধুদেশের জীবনস্বরূপ, যত প্রকার সৎঅনুষ্ঠান তথায় আছে, সকলি তাঁহাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি যদি এপ্রকার নিষ্কাম দেশানুরাগী না হইতেন তাহা হইলে উন্নতিসম্বন্ধে সিন্ধুদেশ হয় তো আর বিশ বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিত। তাঁহার মত লোক সকল দেশেরই শিরোভূষণ। তাঁহারই বিশেষ যত্নে তথায় লেডি ডফরিণের প্রবর্ত্তিত ধাত্রী শিক্ষার বিদ্যালয় হইয়াছে। এই বিদ্যালয় হইতে নূতন ধাইমা সকল শীঘ্রই বাহির হইবে, এখন অনেক স্ত্রীলোক ধাত্রী হইবার জন্য শিক্ষা করিতেছে। তাঁহারা পাস হইলে সিন্ধিরমণীদিগের প্রসব সময়ের দুর্দ্দশার দিন শেষ হইবে। যদি কোন দেশে উক্ত রূপে বিদ্যালয়ের অধিক প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহা সিন্ধুদেশে। এত কুসংস্কার এত অজ্ঞানতা ও স্ত্রীলোকের এত দুঃখ সমস্তই এই শুভ অনুষ্ঠানে দূর হইয়া যাইবে। ভগবান দুঃখী সিন্ধিদিগের মঙ্গল করুন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম সে দুঃখের রজনীর এখনই সুপ্রভাত আরম্ভ হইয়াছে।

অন্বেষণকারীরা রাজকুমারকে প্রাপ্ত হইল, তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজা রাণী কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় দিলেন। বিবাহরাত্রে বর কন্যা যখন নির্জ্জনে ছিলেন রাজপুত্র বলিলেন "রাজকন্যা আমাকে অন্ন রন্ধন করিয়া দাও, আমি সমস্ত দিন অনাহারে আছি আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। রাজকুমারী সত্বর স্বহস্তে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, রাজকুমার আহার করিতে উদ্যত এমন সময় তিনি নিষেধ করিয়া বলিলেন "অপেক্ষা কর আমি ব্যজন করিয়া অন্ন শীতল করি।" ব্যজন করিবামাত্র নিমেষ মধ্যে পাত্রস্থ অন্ন অদৃশ্য হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল। রাজকন্যা স্বামীর মুখের গ্রাস হইতে এইরূপ বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজপুত্রের পরমায়ু শেষ হইয়াছে পৃথিবীতে তাঁহার জন্য আহার উঠিয়া গিয়াছে, তাঁহার অন্ন আর নাই এই জন্যই মুখের গ্রাস অদৃশ্য হইল। রাজপুত্র ক্ষুণ্ণচিত্তে বলিলেন "আমি বিদায় হই। দেখ পৃথিবীতে আমার আর অন্ন নাই, আমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে যদি আজ আমি মরি কাল আমার দুদিন হবে। আমি এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। এই প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া গেলাম যতক্ষণ ইহা জ্বলিবে জানিবে আমি বাঁচিয়া আছি ইহা নিবিলেই জানিও আমার মরণ হইয়াছে।" এই বলিয়া রাজপুত্র পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। পতি প্রস্থান করিবার পর রাজকন্যা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং হস্তে খড়্গ লইয়া এক মনে প্রদীপের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। প্রভাতে কন্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধ অনেক বেলা পর্য্যন্ত রুদ্ধ দেখিয়া রাজা রাণী উৎকণ্ঠিতচিত্তে কন্যাকে বার বার আহ্বান করিতে লাগিলেন কন্যা কিছুতেই দ্বার খুলিলেন না। তখন তাঁহারা বিষন্নচিত্তে ফিরিয়া গেলেন! ওদিকে রাজপুত্র রাজবাটী হইতে নির্গত হইয়া যদৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন। বহুদূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক স্থানে কতকদূর পর্য্যন্ত বৃক্ষ নাই জল নাই—আশ্রয় স্থান নাই, চারি দিকে কেবল ধূ ধূ করিতেছে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, আমিত বাঁচিব না কিছু পুণ্য কর্ম্ম করিয়া যাই। এইরূপ ভাবিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সেই সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তরে বৃক্ষরোপণ, সরোবর খনন এবং পথিকদের আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করাইলেন, পরে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে প্রান্তরস্থ এক পুরাতন দেবমন্দির মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। অন্ন জল বিনা তাঁহার শরীর প্রায় মৃতবৎ হইয়া পড়িল—এই সময় বহু পুণ্যাত্মা ব্রজবাসীগণ ঐ পথে পর্য্যটন করিতে করিতে মন্দিরের নিকটে আগমন করিল, এবং যে পথিমধ্যে পথ ঘাট প্রস্তুত সরোবর খনন এবং বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি

করিয়াছে হস্ত তুলিয়া তাহাকে শত শত বার সাধুবাদ এবং আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সাধু ব্রজবাসীগণ মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলেন তন্মধ্যে এক অনিন্দ্য সুন্দর দিব্য মূর্ত্তি যুবক, মন্দির আলো করিয়া ম্রিয়মাণ ভাবে শয়ান রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, "বৎস, তুমি কে, কেনই বা এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তোমার এখন নবীন বয়স এরূপ সুলক্ষণ সুরূপ কি দুঃখে তুমি ভূমিশায়ী হইয়াছ, আর এই সকল জলাশয় খনন, পথ ঘাট প্রস্তুত, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম তুমিই কি করিয়াছ?" রাজপুত্র ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিলেন আমার শেষ সময় আসিয়াছে, তাই আমি যথাসাধ্য পথিকদের উপকারের জন্য এই সকল কার্য্য করিয়াছি। ব্রজবাসীরা বলিলেন, বৎস, কি দুঃখে তুমি এমন কথা বলিতেছ! তোমার কি মরিবার বয়স হইয়াছে, তুমিত পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছ যাহা চাহিবে আমরা তাহাই দিব, রাজকুমার বলিলেন "বিধাতাপুরুষ আমার ললাটে লিখিয়াছিলেন যে, ১৬ বৎসর বয়সে আমার মরণ হইবে। সেই কথা জানিয়া আমি মনের দুঃখে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বিবাহ রাত্রেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।" আপনারা কি আমার প্রাণদান দিতে পারিবেন? আজ যদি আমি মরি, কাল আমার দুর্দ্দিন হবে। আমার এই একটি ভিক্ষা আপনাদের কাছে। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। অমি অনাহারে আছি কারণ অন্ন আহার করিতে গেলে আমার সম্মুখ হইতে অন্ন উড়িয়া যায়। আমাকে অন্ন দান করুন "তখন ব্রজবসীগণ মহা-উৎসাহে সকলে মিলিয়া আয়োজন করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিলেন। পরে সেই এক শত ব্রজবাসী রাজপুত্রকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন ও তাঁহার সম্মুখে অন্ন দিলেন এবং বলিলেন দেখি কে আমাদের সম্মুখ হইতে রাজকুমারের অন্ন কাড়িয়া লয়, এবং রাজকুমারের আয়ু শেষ করে।" ব্রজবাসীগণের পুণ্যের তেজে শনির দৃষ্টি আর অন্ন উড়াইবার জন্য অগ্রসর হইতে পারে না। তখন বিধাতাপুরুষ দেখিলেন যে পৃথিবীতে তাঁহার বিধি খণ্ডন হইতে চলিল। যাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, যাহার জন্য পৃথিবী হইতে অন্ন উঠিয়া গিয়াছে, সে আবার অন্ন আহার করিতে উদ্যত। তখন তিনি ত্রস্তব্যস্তে সেই স্থানে অবতীর্ণ হইলেন, এবং বলিলেন "হে ব্রজবাসীগণ কেন তোমরা আমার বিধি খণ্ডন করাইতেছ। যদি তোমরা এরূপ কর মানুষের মৃত্যু আর হইবে না, বিধাতার বিধিও আর পূর্ণ হইবে না।" ব্রজবাসীগণ বলিলেন "ভগবান আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই রাজপুত্রকে মরিতে দিব না। অতএব কিরূপে আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি?" বিধাতা বলিলেন "বিধাতার লিপি খণ্ডন হইবার

কল্পনা।

কল্পনা একটি অপূর্ব্ব বস্তু। কল্পনা দ্বারা মানবজগতে কত ব্যাপার ঘটিতেছে। কল্পনা কবির সহচরী, ভাবুকের সঙ্গিনী। কল্পনা দ্বারা মানুষের চিত্তউন্নত হয় প্রশস্ত হয় মহৎ হয়। কল্পনা চক্ষু মানুষকে এমন স্থানে লইয়া যাইতে পারে যাহা সাধারণ লোকের অতীত, সামান্য বুদ্ধির অতীত। কল্পনা যেন মানুষের সম্মুখে এক অভিনব রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়, কত নূতন চিত্র তাহার চক্ষুর নিকট প্রকাশ করে, কত বিচিত্র অপূর্ব্ব ভাবলহরী চিত্তে সৃষ্টি করে, কবির প্রাণ যখন কল্পনা পক্ষে আরোহণ করে তখন কোথায় উড়িয়া যায় এবং কত প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস তাঁহার মনকে পরিপূর্ণ করে, সে উৎস হইতে বাহা স্ফুরিত হয়, সমস্ত পৃথিবীকে মোহিত করিয়া ফেলে। কল্পনার সাহায্যে মানুষ বর্ত্তমান দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া যায়, কল্পনা ভবিষ্যতকে নানা সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া মনুষ্য হৃদয়ের সন্তাপ, মনুষ্য ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা দূর করে। জীবনের দুর্ভাগ্য ক্ষণকালের জন্য ও বিস্মৃত হইতে দেয়। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যে সকল মহা মহাকবি জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অপূর্ব্ব গীতোচ্ছ্বাসে সমগ্র মনুষ্য জগতকে মোহিত স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন কল্পনাই তাঁহাদের প্রধান সহায়। কল্পনা মানুষকে আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলে। কল্পনা ভবিষ্যত অতীতকে এক করিয়া ফেলে। এই কল্পনা দ্বারা আবার মনুষ্য-হৃদয়ের কত অনিষ্ট হয়। কল্পনার অযথা এবং অতিরিক্ত চালনায় মন এক শূন্য কাল্পনিক জগতে নীত হয়, প্রকৃত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত থাকে না, জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের প্রতি ঔদাসীন্য আসিয়া পড়ে। নানা ভ্রম আসিয়া মনকে অধিকার করে। মিথ্যাকে সত্যের ন্যায় প্রতিপন্ন করে। অতিরিক্ত নভেল নাটক পাঠে মন অনেক সময় অযথা, কল্পনাপ্রিয় হয়, কাল্পনিক বিষয়ে আসক্ত হয়, হইয়া জীবনের প্রকৃত অবস্থাতে বিশেষ অনভিজ্ঞ থাকে। কল্পনা মানুষের হিত এবং অনিষ্ট উভয়ই করিতে পারে। অতএব কল্পনা যাহাতে ভাল-দিকে চালিত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ থাকা উচিত। কল্পনার ভূমি প্রশস্ত কল্পনার বিষয় সকল যাহাতে ভাল এবং মহৎ হয় তদ্রূপ চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। নীচ বিষয়সকলেরদিকে কল্পনাকে যাইতে দেওয়া ঠিক নহে। কুকল্পনা ত্যাগ করিয়া সৎচিন্তা দ্বারা মনকে উন্নত এবং সৎকল্পনা প্রিয় করা সকলের কর্ত্তব্য। যে সকল পুস্তক পাঠে কল্পনা অতিরিক্ত এবং অযথা উত্তেজিত হয়, তাহাও পরিহার করা উচিত যাহাতে কল্পনা সৎকল্পনা হয়, কল্পনার সাহায্যে আপনাকে উন্নত করা যায় এবং পরের মঙ্গল সাধন করা যায় সেইরূপ যত্ন করা উচিত।

রূপকথা।

গত প্রকাশিতের পর।

শিশু ছয় দিবসের হইল। ঐ দিবস রাত্রে বিধাতাপুরুষ আসিয়া ললাটের লিখন লিখিয়া যান। শিশুর ধাত্রী প্রিয় শিশুর ভাগ্যে কি লেখা হইবে জানিবার মানসে সূতিকাগৃহের দ্বার-পথে শয়ন করিয়া রহিল। নিশীথ সময়ে বিধাতাপুরুষ আসিলেন। দেখিলেন দ্বারে মনুষ্য শয়ান। সুতরাং ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। বলিলেন "হে নারী তুমি দ্বার-হইতে উঠিয়া যাও আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে চাই।" ধাত্রী বলিল, আপনি কে, কি জন্য ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন?" আগন্তুক বলিলেন, "আমি বিধাতাপুরুষ, শিশুর ললাটে অদৃষ্টলিপি লিখিতে আসিয়াছি।" ধাত্রী বলিল "আপনি শিশুর কপালে কি লিখিবেন যদি আমাকে বলিয়া যান তবেই আমি দ্বার ছাড়িব নতুবা নয়।" বিধাতা প্রথমে এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, অবশেষে নিরুপায় হইয়া অগত্যা ধাত্রীর কথায় সম্মত হইলেন, তখন ধাত্রী দ্বার ছাড়িয়া দিল বিধাতা ভিতর প্রবেশ করিলেন। শিশুর ললাটে লিখিলেন যে ষোড়শ বৎসর বয়সে তাহার পরমায়ু শেষ হইবে। যাইবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা মত ধাত্রীকে ঐ কথা বলিয়া গেলেন। ধাত্রী মহা বিষন্ন হইয়া রহিল। ওদিকে শিশু ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজ্যমধ্যে এবং পিতামাতার মনে মহা আনন্দ। শিশু ক্রমে বড় হইতে লাগিল, নানা বিদ্যা শিখিতে লাগিল, ক্রমে প্রায় ষোড়শ বৎসর নিকটবর্ত্তী হইল। ধাত্রী কেবল মনোদুঃখে অহরহ রোদন করে, রোদন করিয়া করিয়া তাহার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। এক দিন রাজকুমার ক্রীড়া করিতে বাহির হইয়াছেন দেখিলেন তাঁহার ধাত্রী ক্রন্দন করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে ছলনা করিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ভুলাইতে না পারিয়া বিধাতাপুরুষের লিখনের কথা বালকের নিকট প্রকাশ করিল। শুনিবামাত্র রাজপুত্রের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল, তিনি আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ ও দেশ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনেক ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক অপরিচিত রাজ্যে উপনীত হইলেন। সে দেশের রাজকন্যা তৎকালে পতিকামনায় হরগৌরী-পূজা করিতেছিলেন। যে দিবস অজ্ঞাত রাজপুত্র ঐ রাজ্যে আশ্রয় লইলেন, সে রজনীতে রাজকুমারী এই স্বপ্নাদেশ পাইলেন যে রাজ্যমধ্যে এক অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি রাজপুত্র আসিয়াছেন, তাঁহার ললাটে পূর্ণচন্দ্র এবং রাজদণ্ড, ঐ রাজকুমারই তাঁহার স্বামী। প্রভাতে রাজকন্যা এই সংবাদ পিতা মাতাকে অবগত করাইলে তাঁহারা সমস্ত রাজ্য অন্বেষণ করাইলেন এবং অবশেষে এক বৃক্ষতলে

বসন্ত অনিল চির প্রশংসাভাজন,
প্রবাহিত হয় তাহা তবগাত্র বয়ে।

১৩

রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের শ্রেষ্ঠ উপাদান,
নানারূপ অতিচারু কারু সংগঠনে।
মানবের প্রয়োজন পাত্রের নির্ম্মাণ,
উপাদান রয় তার তোমার ভবনে।

১৪

যে করেছে, গিরি, হেন তোমার সৃজন,
জীবের মঙ্গল হেতু বিস্তৃত ধরায়।
ধন্য শক্তি দয়া তাঁর মঙ্গল কারণ,
কেপারে বর্ণিতে তাঁর গুণ সমুদায়।

সমস্তিপুর

প্রেরিত পত্র।

শুভ কামনা।

১

শুভ সমাচার এক ভারতবাসীর
প্রচারিত দেশ দেশে, সুদূর সাগর শেষে,
নব সমাচার নববিধান বাণীর
প্রতিধ্বনি হয় গৃহে জগত বাসীর,

২

আশার সংবাদ ইহা ভারত দেশের
মিলনের সমাচার, ভিন্নতার চিহ্ন আর,
নবশক্তি বলে পুণ্য নববিধানের
রবে নাক—হবে মিল সকল দেশের।

৩

মিলিবে ভগিনী ভ্রাতা জাতি সম্প্রদায়
ভিন্নতার ব্যবধান, হবে চির অন্তর্ধান,
মিলিবে আসিয়া ইয়ুরোপ সমুদয়
ভারতে যে শুভ চিহ্ন হয় অভ্যুদয়,

৪

কি সুন্দর দৃশ্য আজি হয় মিলনের
বঙ্গের গৃহেতে আজি, বঙ্গের মহিলা সাজি,
বিলাসী বিদুষী নারী ইংলণ্ড দেশের
দেখায় অপূর্ব্ব দৃশ্য নব মিলনের,

৫

বিধান ভগিনী সনে বিধান গৃহেতে
বিধান প্রেমেতে মাতি, লেডি ডফারিন সতী,
বিভূষিতা দেশী সাটী, দেশী ভূষণেতে
দেশী ভোজ ভোজনেতে পূর্ণ দেশী মতে,

৬

বঙ্গের বিধান গৃহে এনব দর্শন
বড়ই আশার কথা, বিধানের শুভ বার্ত্তা,
সে দিনে ইংলণ্ডে হয় যে নব মিলন
ঘটিয়াছে আজি তাহা ভারতে দর্শন

৭

গৌরবের কথা ইহা বিধান গৃহের
বিধান ভগিনী সতী, সুনীতি শ্রদ্ধেয়া অতি,
আজি বিধানের পুণ্যে বিধান দেবের
করেন সাধন ইচ্ছা শ্রীআচার্য্যের

৮

পূর্ণ হোক্ ইচ্ছা চির বিধানপতির
পূর্ণ ইচ্ছা বিধানের, পূর্ণ ইচ্ছা আচার্য্যের,
পূর্ণ ইচ্ছা সর্ব্ব বিধান বাদীর
পূর্ণ ইচ্ছা হোক্ চির প্রিয় ভগিনীর।

সমস্তিপুর,
৭ই বৈশাখ, ১২৮৫ শক।

বিনীতা—
সুমতি—

স্বর্ণরেণু।

প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা কখনও ভাল নয়। যে শত্রুর উপর প্রতিশোধ লইবে সে যদি ক্ষমতাশালী হয় তবে প্রতিশোধ লইতে যাওয়া মূর্খতার কার্য্য এবং অনিষ্টকর। সে যদি দুর্দশাগ্রস্ত হয় তখন তাহার উপর প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাওয়া পশুতুল্য নিষ্ঠুরতর কার্য্য।

কল্যকার জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ অদ্যকার জন্য চিন্তিত হওয়াই অদ্যকার পক্ষে যথেষ্ট।

সে বন্ধুতাই প্রকৃত বন্ধুতা যাহা দীর্ঘকাল বিচ্ছেদে ছিন্ন হয় না। সে ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা যাহার বন্ধন দূরে গেলেও শিথিল হয় না।

শিশুর সরলতা এবং নির্ভর যৌবনের উদ্যম, প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য বার্দ্ধক্যের উদাসভাব সমুদয়ের সামঞ্জস্য চরিত্রে থাকা প্রার্থনীয়।

সুরুচি এবং সদভ্যাস এই দুইটি লাভ করিতে সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত।

জীবন এবং চরিত্র দ্বারা মত যাহাতে প্রচারিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য।

কেবল উদ্দেশ্য সৎ হইলে হইবে না দৃষ্টান্তও সৎ হওয়া প্রয়োজন।

নহে তোমরা এই রাজপুত্রকে এক নিমেষ সময়ের জন্য মরিতে দাও তাহার পর আমি ইহাকে আবার বাঁচাইয়া দিব" ব্রজবাসিরা সম্মত হইলেন। তখন তাঁহারা রাজকুমারকে বস্ত্রাবৃত করিয়া ভূমিতে শয়ন করাইলেন, ঐ সময়ে এক নিমেষের জন্য মৃত্যু আসিয়া তাঁহার প্রাণ হরণ করিল। পরক্ষণেই বিধাতা-তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। চেতন পাইয়া রাজপুত্র বলিলেন, "আমার কি হইয়াছিল?" ব্রজবাসীরা বলিলেন "বৎস. তুমি নিদ্রা গিয়াছিলে. এক্ষণে আহার কর!" তখন রাজকুমার তাঁহাদের দ্বারা প্রস্তুত সেই অন্ন পরমানন্দে আহার করিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে ব্রজবাসীগণ বলিলেন "বৎস বল তোমার গৃহ কোথায়, তোমার পিতা মাতা কে? আমরা তাঁহাদের নিকট তোমাকে লইয়া যাই।" রাজপুত্র বলিলেন "আপনারাই আমার পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক, কারণ পিতা মাতা জন্ম দিয়া থাকেন, কিন্তু জীবন দান করিতে পারেন না। আপনারা আমায় প্রাণদান করিলেন অতএব আপনাদের তুল্য আত্মীয় আপনারজন আর আমার নাই, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকিতে চাই যেখানে আপনারা যাইবেন, সেখানে আমাকে লইয়া চলুন।" ব্রজবাসীগণ বলিলেন না বৎস তোমার মত সন্তান বিনা না জানি তোমার পিতা মাতা কত দুঃখে আছেন তোমার পত্নীই বা কি অবস্থায় আছেন, চল আমরা সঙ্গে করিয়া তোমাকে গৃহে লইয়া যাই!" এই বলিয়া তাঁহারা রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন রাজপুত্রের পিতা মাতা এবং ধাত্রী পুত্রের জন্য রোদন করিয়া করিয়া অন্ধ প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা পুত্রের আগমনে মহা আনন্দিত হইলেন। রাজ্যমধ্যে মহা উৎসাহ হইতে লাগিল। ওদিকে রাজকন্যা প্রদীপ সম্মুখে লইয়া একাকিনী উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার উপক্রম হইল তখন তিনি খড়্গ লইয়া গলদেশে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় দেখিলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ পুনরায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন তিনি খড়্গ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া উঠিলেন, এবং রুদ্ধ দ্বার খুলিলেন খুলিয়া পিতা মাতার নিকটে গেলেন, এবং স্নানাহার করিয়া স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজকুমার কিছু দিন পিতা মাতার নিকট থাকিয়া অবশেষে স্বয়ং শ্বশুরালয়ে গিয়া পত্নী রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরমসুখে রাজ্যাদি করিতে লাগিলেন।

মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ কালে এত অনিচ্ছার সহিত আসে কিন্তু পৃথিবীতে আসিলে আর যাইতে চায় না এমনি বিধাতার কৌশল।

প্রাপ্ত।

পর্ব্বত।

১

ভীম অঙ্গ তুঙ্গশৃঙ্গ শূন্য ভেদ করি
উঠিছ আকাশপথে, উন্নত অচল।
দেশ দেশান্তরে চলি লম্বদেহ ধরি,
অবনীর উপকারে নিযুক্ত কেবল।

২

যে দেখেছে একবার, অচল, তোমারে,
সেই জানে গুণরাশি নিশ্চয় তোমার।
পরহিত হেতু শুধু পৃথিবী মাঝারে,
জনম তোমার, গিরি, বিদিত সবার।

৩

কত ভাবে উপকার কর পৃথিবীর,
শীত গ্রীষ্ম ছয় ঋতু তপনগতিতে।
হ্রাস বৃদ্ধি সমতার বিধি প্রকৃতির,
বরষার বারিদের জন্ম তোমাহতে।

৪

বিস্তৃত তুষার রাশি সুশীতল জল,
তাহারও জনম, গিরি, গর্ভেতে তোমার।
দেশধ্বংসকারী পুনঃ অত্যুষ্ণ অনল,
সেও ত জনমে, গিরি, গর্ভেতে তোমার।

৫

নৃমণির শিরঃশোভা হীরক উজ্জ্বল,
বিলাসিনী বনিতার গাত্র অলঙ্কার।
কৃষকের কর্ষণাস্ত্র, সুযন্ত্র সকল,
তবধাতু হতে হয় নির্ম্মাণ তাহার।

৬

সরিতের স্বচ্ছ জল নির্ঝর নিসৃত,
জীবের জীবন রূপে চিরবহমান।
তৃষিতের তৃষ্ণাদূর ভূমিপৃষ্ঠস্থিত,
তরুলতা শস্য যায় হয় বর্দ্ধমান।

৭

তবগর্ভহতে নদী দেশ দেশান্তরে,
যায় চলি তুলি কত তরঙ্গ ভীষণ।
বণিকের পোত তায় বানিজ্য বিস্তারে,
অনায়াসে দেশে দেশে করিছে ভ্রমণ।

৮

তবজাত অরণ্যানী জীবের নিবাস,
আরামে বিহরে কত আকাশ বিহারি—
বিহগ, তুলিয়া গান যথা বার মাস,
প্রকাশে আনন্দ চির বসন্ত প্রচারি।

৯

শার্দ্দূল, ভল্লুক আদি বন্যজন্তু তায়,
গহ্বরে বিচরে তব ভয় শূন্য হয়ে।
বিচরণ করে বনে দিনের বেলায়,
সকলের সুখস্থান তোমার আলয়ে।

১০

যোগীদেরও যোগস্থান তবস্থান হয়,
যোগরত যোগীজন ধর্ম্মের জীবনে।
তোমার আলয়ে গিরি হয়েছে নিলয়,
দেবের বৈকুণ্ঠধাম তব সুখ স্থানে।

১১

অরণ্যানী সমুত্থিত ঘন বাষ্পরাশি,
ঘনরূপে সুবিস্তৃত উচ্চ নভঃস্থলে।
বরষায় বর্ষে-বারি নিয়ত প্রকাশি,
জন্ম তার গিরি চির তব বন স্থলে।

১২

জীব সংরক্ষণ বায়ু স্বাস্থ্য সম্বর্দ্ধন,
সমুৎপন্ন হয় তাহা তোমার আলয়ে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৪ সংখ্যা।] শ্রাবণ, সন ১২৯৫। [১১ খণ্ড।

অভিনয়।

আজ কাল কলিকাতায় অভিনয় এবং রঙ্গভূমির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। অভিনেতারা অভিনয় কার্য্যে খুব নৈপুণ্যও দেখাইয়া থাকেন। বাস্তবিক বিশুদ্ধ আমোদে সময় ক্ষেপণের একটি প্রধান উপায় অভিনয় দর্শন। উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিলে মন যেরূপ সহজে আমোদিত হয় এমন আর কিছুতে নয়। অভিনয় মনুষ্যজীবনের ভাল এবং মন্দ উভয় দিক যেমন সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া লোকের চক্ষুর সম্মুখে রাখে, উত্তম পুস্তকও ততদূর পারে না। পাপ পুণ্যের চিত্র অভিনয় দ্বারা যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় এমন আর কিসে হয়? ভাল অভিনয় দেখিলে মন ভাল হয়, মনের ভাব উন্নত হয়, মন্দ বিষয়ে যেমন ঘৃণা জন্মে, সেইরূপ ভালবিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধি করে—এক দিকে মনুষ্য চরিত্রের সৌন্দর্য্য, মহত্ব, উচ্চতা, অপর দিকে ইহার নীচতা, পাপ জঘন্যতা সুনিপুণ লেখক দ্বারা নাটক কাব্যে অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়া থাকে, সেই সকল নাটক কাব্য উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হইলে আরও কত ভালরূপে মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয়। এমন অনেক ঘটনা হইয়াছে যে কেবল অভিনয় দেখিয়া মনুষ্যের জীবন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যাহা উপদেশে হয় না, শাসনে হয় না, শিক্ষায় হয় না, হয় ত অভিনয়ে হয়। সময়ে সময়ে ভাল অভিনয় এবং ভাল বিষয়ে অভিনয় দেখা সকলেরই উচিত। তাহাতে মন সরস ভাবুক এবং প্রফুল্ল হয়। হৃদয়ের শুষ্কতা জড়তা নীরসভাব চলিয়া যায়।

আমরা এতক্ষণ অভিনয় দর্শনের প্রশংসা করিলাম। অভিনয় দেখিবার উপকারসম্বন্ধে কত কথা বলিলাম, কিন্তু কত সময়ে এই অভিনয় দর্শনে কত বিপরীত ফলফলে তাহা বলা হয় নাই। অভিনয় দ্বারা যেমন মন এবং চরিত্র উচ্চ হইবার সম্ভাবনা, তেমনি অনেক সময় মানুষকে অধোগামী করিবার প্রধান উপায় এই নাট্যাভিনয় দর্শন। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার কোন কোন রঙ্গভূমি তরলমতি যুবাদিগকে নরকগামী করিবার প্রশস্ত স্থল। কুরুচিপূর্ণ বিষয় সকলের অভিনয় যুবাদের পক্ষে বিষতুল্য অনিষ্টকর। সেই সকল দেখা

আর কুসংসর্গ করিয়া অধঃপাতে যাওয়া উভয়ই সমান। কোন কোন রঙ্গভূমিতে মন্দ চরিত্রা স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনয় করাইয়া দেশের এবং লোকের যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। কত যুবকের সর্ব্বনাশ ঐ মায়াবিনীদের দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। লোকের রুচি প্রবৃত্তি এমনি বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে উক্ত রঙ্গভূমির অভিনয়ই ভাল লাগে। ঐ সকল নারীর অভিনয়ই লোকের চিত্ত অধিক আকর্ষণ করে। ভাল অভিনয় দেখিবার লোভে অবশেষ অনেকে আপনারা অধঃপাতে যায়। উৎকৃষ্ট অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, ইহা আমরা স্বীকার করি, তাহাতে যথার্থই মনোরঞ্জন হয়। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া ভাল লোকেরা কুচরিত্রা নারীগণ যে সতী সাধ্বী সাজিয়া অভিনয় করে তাহা দেখিয়া মোহিত হন। আমরা বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া হিন্দুসন্তানগণ আপনাদের দেবদেবীর চরিত্র ঐ সকল স্ত্রীগণ দ্বারা অভিনীত দেখিয়া সহ্য করেন ও মুগ্ধ হন। আমরা বুঝিতে পারি না যে সতীত্ব রত্নের জন্য এ দেশের এত গৌরব, সতী পতিব্রতা নারীগণ যে দেশে আবির্ভূত হইয়া আর্য্যজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই আর্য্যবংশোদ্ভবগণ কিরূপে সীতা সতী সাবিত্রী দময়ন্তী ইত্যাদি পৌরাণিক সাধ্বী আর্য্যনারীগণের চরিত্রের অবমাননা ঐ সকল নারী দ্বারা হয় ইহা দেখিয়া নিরস্ত থাকেন। তাঁহাদের শোণিত কি উষ্ণ হইয়া উঠে না? যাহাদের জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত ধর্ম্ম ও নীতির সাক্ষাৎ অপমান, তাহাদের দ্বারা চৈতন্য প্রহ্লাদ ইত্যাদি ধর্ম্মের আদর্শ-চরিত্র সকল প্রদর্শন এবং পবিত্র হরিনাম কীর্ত্তন করান কত দূর অন্যায়, তাহা বলা যায় না। যাহারা এই কার্য্যের নেতা, যাহার স্বয়ং ঐ কার্য্য করে, যাহারা জানিয়া শুনিয়া ঐ কার্য্যে উৎসাহ দেয় সকলেরই অন্যায় অধর্ম্ম হয়। দর্শক বৃদ্ধি করিয়া আপনাদের ব্যবসায়ের উন্নতি এবং অর্থলোভে যাহারা এইরূপ কার্য্য করাইয়া সমাজের অনিষ্ট, ধর্ম্মনীতির অপমান, হরিনামের পর্য্যন্ত অপমান করাইতেছে তাহাদের কত দূর অন্যায় হইতেছে সহৃদয় ব্যক্তিগণ একটুমাত্র বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন। যদি কুলটারা সতীত্বের গৌরব শিক্ষা করিতে পারিত, অসচ্চরিত্র লোক সচ্চরিত্র হইয়া যাইত তবে ইহার উপকারিতা স্বীকার করা যাইত কিন্তু তাহা কৈ? এযে বিপরীত ঐ সকল নারীগণের কথা আর কি বলিব অভিনয় দ্বারা তাহারা আপনাদের পাপের ভরা আরও পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সৎলোক কেবল ভাল অভিনয় দেখিবার জন্য ঐ সকল রঙ্গভূমিতে গিয়া এরূপ অনিষ্টকর বিষয়ে প্রশ্রয় দেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বলিবার আছে, তাঁহারা হয় ত আপনাদের অহিত করিতেছেন না, কিন্তু পরের ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছেন। কারণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অল্প বয়স্ক চঞ্চলমতিগণ ক্রমে ক্রমে পাপের প্রবাহে পড়িয়া মারা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় দেশের ধনী মানী বিদ্বান্, দেশের মুখপাত যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রকারের রঙ্গভূমি সকলের পক্ষপাতী। এইরূপ নাট্যাভিনয় যত বৃদ্ধি পাইবে ততই দেশের সর্ব্বনাশ হইবে।

আজ কাল দুই একটি রঙ্গভূমিতে ভদ্রসন্তানগণ বিশুদ্ধ অভিনয় দ্বারা লোকের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছেন, আমাদের অনুরোধ সকলে ইহাঁদিগকে যেন উৎসাহ দেন। এই সকল রঙ্গভূমির শ্রীবৃদ্ধি হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। নির্দ্দোষ আমোদে সময় যাপনের ইচ্ছা এই সকল নাট্যসমাজে চরিতার্থ হইবে। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় রচিত প্রহ্লাদ চরিত্র চন্দ্রহাস ইত্যাদি ধর্ম্মরসাত্মক কাব্য সকল তাঁহা দ্বারা স্থাপিত বীণ রঙ্গভূমিতে আর্য্য নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত হইতেছে—ইহার জন্য উক্ত সুলেখক এবং আর্য্যনাট্যসমাজ সকলের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা এই নাট্যসমাজের মঙ্গল এবং উন্নতি কামনা করি। ঐ রঙ্গভূমিতে অভিনয় কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভদ্র মহিলা এবং পুরুষগণ এই থিয়েটারে গিয়া অভিনেতাগণের উৎসাহবর্দ্ধন করেন ইহা আমাদের নিবেদন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা সন্তোষ লাভ করিবেন।

সুলোচনা।

৩য় অধ্যায়।

হরিহর বহুদিনের পর গৃহে আসিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া কোথায় আমোদ আহ্লাদ করিবেন না তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। এই কারণে নরহরি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া মৃত্যুতুল্য ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু সজল মুখশ্রীহীন মলিন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। রজনীতে শয়ন করিয়াছেন কিন্তু দুশ্চিন্তা ও মনোবেদনাহেতু নিদ্রা হইতেছে না।

নরহরির পত্নী স্বামীকে বিমনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন না কিন্তু ক্রমেই ক্রুদ্ধা বিষধরীর ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পারিলেন না। তখন বলিলেন—"হরিহরের স্ত্রী আমা অপেক্ষা মিষ্ট ও ইষ্ট হইয়াছে তোমার নিকটে?"

নরহরি কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রহিলেন। ক্রোধী লোকেরা বরং তিরস্কার সহ্য করিতে পারে কিন্তু উপেক্ষা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইল,

এবং ক্রোধ মুখে বলিলেন—"আমার কথায় উত্তর দেওনা, তুমি কি আমাকে উপেক্ষা করিয়া সুখী হইতে পারিবে?"

এই কথা শুনিয়া নরহরির মনে ভয় জন্মিল, তিনি ভাবিলেন ক্রোধের বশীভূত হইয়া লোকে কত অকার্য্য করে, ইনিও যদি তাহাই করেন তবে আমিই তাহার কারণ হইব। অতএব নীরব থাকা ভাল নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন—

"সুখী হইবার আশাতেইত তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলাম।"

পত্নী। আমি তোমায় কি অসুখে ফেলিয়াছি?

নরহরি। আমাকে অসুখে ফেলিয়াছ বলিয়াত বলি নাই।

পত্নী। আর কি বলিবার অবশিষ্ট রাখিলে?

নরহরি অতি মৃদু ভাবে বলিলেন, "কিঞ্চিৎ শান্ত হও, সর্ব্বদা উগ্রতা ভাল দেখায় না। তুমি আমার স্নেহের কনিষ্ঠ ভাইএর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কর কেন? সে তোমাকে ভক্তি করে, সম্মান করে তুমি তাহার প্রতি অত্যাচার কর ইহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথা পাই। সে বহু কাল পরে বাড়ী আসিয়াছে, কোথায় তুমি তাহাকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবে না ঠিক বিপরীত।"

পত্নী। আমি শত্রুর শ্রীবৃদ্ধি সহ্য করিতে অসমর্থ।

নরহরি। সে আমার ভাই তোমার শত্রু হইল কিরূপে?

পত্নী। আমার পুত্র নাই কন্যা নাই ভাই নাই বন্ধু নাই, নাই বলিতে এসংসারে আপনার বলিবার কেহই নাই আর ওদের দেখ দেখি?

নরহরি। তোমার মনের ভিতরে বিষ পোরা আছে তুমি আপনার বিষে আপনি দগ্ধ হইতেছ, অন্যের কি দোষ? তোমার সন্তান সন্ততি হইতে কি হরিহর বারণ করিয়াছে, না তাঁহার স্ত্রী বারণ করিয়াছে? তুমি পরের পুত্র কন্যাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখ তাই তোমার কর্ম্মানুরূপ ফল তুমি ভোগ করিতেছ আরও করিবে। যদি তোমার চিত্তের পরিবর্ত্তন না হয় আর কত ক্লেশ পাইবে কে জানে?

যাহাদের বুদ্ধি প্রতিনিয়ত কেবল মন্দ চিন্তা করে, তাহারা কোন কথার ভিতরে সদভিপ্রায় দেখিতে পায় না। নরহরির পত্নী এ সকল কথার কিছুমাত্র সদর্থ গ্রহণ করিলেন না। বরং আপনাকে তিরস্কৃত মনে করিয়া আরও বিষণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ সংসারে আমার জুড়াইবার স্থান নাই, এক তুমি আশা ও আরামের স্থান, কিন্তু তুমি কেবল আমাকে দিন রাত তিরস্কার করিতে ভালবাস, তবে আর কার কাছে যাব?"

নরহরি। আমি তোমাকে সর্ব্বদাই তিরস্কার করি, ইহা যদি সত্য হয় তবে

মিথ্যা কি জানি না। তোমার যেমন অন্য আরামের স্থান নাই, আমারই তুমি ভিন্ন আর কে আছে? আমি তোমাকে ভালবাসি ভাল কথা বলি, তুমি কল্পনা করিয়া তাহাতে মন্দভাব আরোপ কর। তোমার সুখে আমার সুখ জানিয়া যাহাতে সুখী হওয়া যায় তাহাই বলি, কিন্তু তোমার মনে তাহা ভাল লাগে না। তোমার পুত্র কন্যা নাই ভাই বন্ধু নাই—হরিহর আমার ভাই তোমারও ভাই—তাহার পুত্র কন্যাই তোমার পুত্র কন্যা যদি মনে করিতে পার, পরম সুখী হইবে। সুখ বাহিরের বস্তুতে থাকে না, সুখ থাকে মনে। মন যদি সুখের হয় তাহাকে কেউ দুঃখ দিতে পারে না। তোমাকে অনেক দিন বুঝাইলাম, তুমি কোনক্রমে বুঝিলে না কি করিব? তোমার পুত্র কন্যাদি নাই—পরের পুত্র কন্যাকে ভালবাস, ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

পত্নী। তুমি যে সকল কথা বল তাহা আমার মনের তৃপ্তিপ্রদ হয় না। যার নিজের পুত্র কন্যা নাই, পরের পুত্র কন্যা দ্বারা কখন সে অভাব দূর হইতে পারে?

নরহরি। শোন, রাগ করিও না, তোমার পুত্র কন্যা নাই, বিধাতার ইচ্ছায়, তাহার জন্য লোকের প্রতি বিরক্ত হইলে, বিধাতাকে বিরক্ত করা হয়, এই জন্য বলি নিরপরাধীর প্রতি অপরাধ করিও না। ঈশ্বর যাহাতে প্রসন্ন থাকেন সর্ব্বদা সেইরূপ যত্ন কর, যদি পরের পুত্র কন্যা লইয়া সুখী হইতে না পার, ভগবানকে লইয়া সুখী হইতে চেষ্টা কর—দেখ তিনি তোমায় দয়া করিয়া সংসারের সমুদয় আবল্য হইতে অবসর দিয়াছেন তুমি সেই অবসরের সময়টা লোকের প্রতি বৈরভাবে না কাটাইয়া ঈশ্বরের ভজন সাধনে কাটাও। তাহাতে তোমার আমারও সমুদয় পরিবারের মঙ্গল হইবে।

পত্নী। অত্যন্ত উগ্রভাবে বলিলেন, "ও গো জানি জানি, আমার কাছে আর ধার্ম্মিকতা ফলাইয়া কাজ নাই, আমি ওসব ঢের জানি।"

৪র্থ অধ্যায়।

কলিকাতার দক্ষিণ দিকে, গঙ্গার ধারে একটি প্রশস্ত উদ্যান মধ্যে, এক জন মনুষ্য উপবিষ্ট। তাঁহার শরীরে ভস্ম, গাত্রে গৈরিক বস্ত্র, প্রকৃতি প্রশান্ত ও গম্ভীর।

অপর একটি ভদ্র লোক তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ মলিন, চিত্ত বিষণ্ণ, চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ, জল পড়ে পড়ে পড়ে না। উভয়ে অনেক ক্ষণ—নীরবে রহিলেন পরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়কে বলিলেন, "হরিহর! আমার নিকটে বসিয়া থাকিয়া কেন সময় নষ্ট কর?"

হরিহর। আপনার নিকটে থাকিলে যদি সময় নষ্ট হয় তবে হোক্ আমি সময় রাখিয়া আর কি করিব?

নরহরি পত্নীকে কোন ক্রমেই সদ্ভাবে আনয়ন করিতে না পারিয়া—গৃহত্যাগী উদাসীনের বেশে বাহির হইয়াছেন, হরিহর পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ তাঁহাকে বৈরাগ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। উভয়েই উভয়কে কথা বলিতে সঙ্কোচ করিতেছেন, সুতরাং দুই একটি কথার পরেই আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া থাকিতেছেন। তার পর নরহরি ধীরে ধীরে বলিলেন, "হরিহর! বাড়ী যাও, আমি যে কল্যাণের পথ আশ্রয় করিয়াছি ইহা আর পরিত্যাগ করিব না।"

হরিহর। গৃহ সংসার পরিত্যাগ করাই কি কল্যাণের পথ।

নরহরি। হ্যাঁ, তৎপক্ষে আর সংশয় কি?

"হিত্বাত্ম পাতং গৃহমন্ধ কূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত।"

গৃহ আত্মবিনাশের নিমিত্ত অন্ধ কূপ-বিশেষ, এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়া হরিকে আশ্রয় করাই কল্যাণ।"

হরিহর। দাদা! আমি আপনার নিকটে কিছু বলিতে ভয় করি পাছে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, কিন্তু না বলিয়াও মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না—

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণো
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।"

যাহারা ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত, বনেও তাহাদিগের প্রতি দোষ সকল প্রভুত্ব করে, আর গৃহে পঞ্চেন্দ্রিয় করিলে তপস্যা করা হয়।

ইহাও শাস্ত্রেই লিখিত আছে—যে প্রকৃত বৈরাগীর পক্ষে গৃহই তপোবন।

"গৃহমেব গৃহস্থানাং
সুসমাহিত চেতসাম্।
শান্তাহঙ্কৃতিদোষাণাং
বিজনা বনভূনয়ঃ॥"

"যাঁহাদিগের চিত্ত, সুসমাহিত, এবং অহঙ্কার উপশান্ত হইয়াছে তাঁহাদিগের পক্ষে গৃহই বিজন বনভূমিতুল্য"

নরহরি। হরিহর! তোমার কথাই তোমার উত্তর প্রদান করিতেছে, যাঁহাদের চিত্ত, সমাহিত হয় নাই, অহঙ্কার কমে নাই তাঁহাদিগের গৃহ কখন বিজন বনভূমিতুল্য নহে। ভ্রাতঃ! আমি ত ইচ্ছায় গৃহত্যাগ করিতেছি না। গৃহে সুখ হইল না তাই গৃহ ত্যাগ করিতেছি, তুমিত সকলই জান।

হরিহর। তাহা হইলে ত গৃহ ত্যাগ করিলেও সুখী হইতে পারিবেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "যদি চিত্ত সমাহিত হইয়া থাকে বনে যাইয়া প্রয়োজন কি? যদি চিত্ত সমাহিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে ও বনে গেলে কেবল মাত্র ক্লেশই সার হইবে" অতএব দাদা! আমি একটি নিবেদন করি, আপনি ফিরিয়া গৃহে চলুন, গৃহে অল্প সহ্য করিতে হইবে, গৃহত্যাগ করিলে অনেক সহ্য করিতে হইবে।

নরহরি। হরিহর! গৃহে সুখী হইতে পারিব যদি অল্পও আশা থাকিত আমি কদাচ গৃহত্যাগ করিতাম না। পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক থাকিলেও যন্ত্রণা নিবারিত হইবে না।

হরিহর। দাদা! বধূ ঠাকুরাণী যে অন্যায় ব্যাবহার করেন, তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া সর্ব্বদা সংযতচিত্তে ঈশ্বরারাধনাতে রত থাকুন, ইষ্ট সিদ্ধ হইবে।

নরহরি। আমি উদাসীন হইয়া উপেক্ষা করিতে চাহিলেও তিনি উপেক্ষা করিতে দিবেন না।

হরিহর। দাদা! আমি মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি। আমাদের যে অর্থ বিত্ত আছে তাহা অল্প নহে সুতরাং আমি আর চাকরি করিতে যাইব না আপনি যদি আজ্ঞা করেন, দুই ভাই মিলিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে নিযুক্ত হই। ইহাতে যদি বধূ ঠাকুরাণী কিছু উৎপাত করেন তাহা সহ্য করিয়া থাকিব।

নর। হরিহর ভাই! তোমার এই কথাটি আমার নিকট অত্যন্ত সুখের সংবাদ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু পত্নী আমার সাক্ষাৎ ব্যাঘ্রী, তাঁহার কথা মনে হইলেই হৃৎ কম্প হইতে থাকে।

হরি। আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি তাহাই বলি। আপনি যদি ফিরিয়া গৃহে না যান, তিনি ক্রোধে আত্মহত্যা করিতে পারেন। সেই মহাপাপের নিমিত্ত না হইয়া তাঁহার কিছু দৌরাত্ম্য সহ্য করা ভাল।

এই কথাটি নরহরির মনে লাগিল, তিনি তখন নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া হরিহরকে বলিলেন, "তুমি সহ্য করিতে পারিবে?"

হরিহর বলিলেন "যখন সহ্য না করিয়া আর উপায় নাই তখন যে প্রকারেই হউক সহ্য করিব।

নরহরি বলিলেন "ভাল উত্তম কথা, তুমি আজ গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি তিনদিন পরে গৃহে যাইব।

হরি। যদি যাইবেন তবে আর বিলম্ব কেন?

নর। যখন সম্বল সংগ্রহের সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছি তখন কিছু সম্বল লইয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত, আমি অদ্য পরমহংসের নিকটে যাইব।

স্ত্রীলোকের সহর।

এক স্ত্রীর একমাত্র স্বামী যেমন স্বাভাবিক ও ঈশ্বরাভিপ্রেত, তদ্রূপ এক পুরুষের এক পত্নী হওয়া স্বাভাবিক ও ঈশ্বরাভিপ্রেত। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন, এবং হিন্দুরাজারা শত শত যুবতীর পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্বাহসম্বন্ধে এরূপ নীচ স্বেচ্ছাচারিতা ভারতবর্ষের নানা স্থানের রাজা

ও বড় মানুষদিগের মধ্যে এক্ষণেও বিদ্যমান। শ্রুত আছি যে জয়পুরের মৃত মহারাজা রামসিংহের অন্তঃপুরে নয় শত যুবতী ছিল। বর্ত্তমান কালেও বঙ্গদেশে এক একটী বিবাহবণিক হতভাগ্য দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ বা চল্লিশ, কিংবা ততোধিক বিবাহ করিয়া থাকে। যে জাতির উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর লোক এরূপ কুৎসিত নীচপ্রকৃতিসম্পন্ন সে জাতির অভ্যুদয় ও কল্যাণ কোথায়? খৃষ্টিয় সমাজে উদ্বাহ সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ শাসন ও উচ্চ নীতি এ প্রকার কোন সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টিয় ধর্ম্মমতে কাহারও এক পত্নী বিদ্যমানসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। এই ধর্ম্মশাসনের অনুরোধে রাজা মহারাজ সম্রাট পর্য্যন্ত বিবাহসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। বাইবেল গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে, যথা—"যে ব্যক্তি আপন পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কাহাকেও বিবাহ করে সে ব্যভিচার করে—এবং যে ব্যক্তি স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও ব্যভিচার করে।"

এই বিবাহাদি সম্বন্ধে মোহম্মদীয় সম্প্রদায়ে যেরূপ ভয়ানক স্বেচ্ছাচারিতা ও নীচতা এরূপ কোন জাতিতে নাই। পত্নীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহার সঙ্গে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে মুসলমান পুরুষদিগের মধ্যে এ প্রকার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। তাঁহাদের শাস্ত্র বহুবিবাহের প্রতিপোষক। পুরুষ ইচ্ছা করিলে চারিটী পর্য্যন্ত নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া সকলকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, কোরাণ গ্রন্থে এরূপ বিধি আছে।

অবস্থা বিশেষে বহু ভোগ্যা পত্নী রাখিবারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ বিধি শুনিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যাহা হউক, মুসলমান বিলাসী ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বড় মানুষগণ এ প্রকার বিধিতেও সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা পশুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সহস্র সহস্র নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বহু বিবাহ দোষে বা অবৈধ পত্নীর গ্রহণ দোষে দূষিত চরিত্র নয়, এমন কোন মুসলমান বড় মানুষ জগতে আছে কি না সন্দেহ। বাদসাহ নবাবদের ত কথাই নাই—সামান্য জমীদার, তালুকদার, ধনী মুসলমানেরও অন্তঃপুর—বহু পত্নী বা অবৈধ পত্নী দ্বারা পরিপূর্ণ, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের নিকট স্ত্রীলোক যেন একটি ক্রীড়া ও আমোদের সামগ্রী বিশেষ। তাঁহার জীবনের যেন কোন মহত্ব ও মূল্য নাই। এক জন নবাব যে কেবল স্ত্রীলোক দ্বারা এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা তদ্বৃত্তান্ত জাঁহাঙ্গীর বাদসাহার জীবনী পুস্তক হইতে এখানে গ্রহণ করিলাম।

মুলতানের নবাব সুলতান মহম্মদের পুত্র সুলতান গয়াস উদ্দীন পিতৃবিয়োগের পর আট চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি নবাবের পদে অভিষিক্ত হইয়া আপন অমাত্য ও প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকটে প্রকাশ করেন যে, "আমি ত্রিশ বৎসর কাল পিতার অধীনতায় থাকিয়া সেনাচালনা করিয়াছি,—পিতৃসেবায় ও আজ্ঞা পালনে প্রচুর যত্ন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে রাজ্য শাসনের ভার আমি প্রাপ্ত হইলাম। রাজকার্য্য ও প্রজাপালন করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। বাসনা যে, অবশিষ্ট জীবন আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিব। রাজকার্য্যের ভার তোমাদের উপর রহিল।" এইরূপ প্রচার যে সুলতান গয়াস উদ্দীন পোনের সহস্র যুবতীকে স্বীয় পরিবার ভুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সকল যুবতী দ্বারা এক নগর স্থাপন করেন, সেই নগরে তিনিই একমাত্র পুরুষ, অন্য পুরুষের সংস্রব ছিল না। গয়াস উদ্দীন সেই নারী নগরের অধিপতি, স্ত্রীলোক সকল কর্ম্মচারী, বিচারক, ব্যবস্থাপক, শান্তিরক্ষক, ব্যবসায়ী, পণ্যজীবী ইত্যাদি। একটি নগর রক্ষা ও শাসনের জন্য যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ও কর্ম্মচারীর প্রয়োজন তৎসমুদায় স্ত্রীলোক ছিল। কোথাও কোন সুন্দরী নারীর সংবাদ পাইলে গয়াস উদ্দীন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিতেন, যে পর্য্যন্ত সেই যুবতী হস্তগত না হইত সে পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতেন না। যে সকল স্ত্রীলোকের বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা ছিল, তিনি তাঁহাদিগকে উচ্চ উচ্চ পদে ও সামান্য নারীদিগকে সামান্য ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। সুলতান গয়াস উদ্দীনের মৃগয়ায় বিশেষ অনুরাগ ছিল, তিনি একটি প্রকাণ্ড পশুশালা স্থাপন করিয় তাহার মধ্যে নানা জাতীয় বন্য পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা আপন পত্নী ও তাহাদিগের পরিচারিকাবর্গসহ শিকার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেন। দুর্ব্বলা অবলা বলিয়াই নারীজাতির প্রতি যথেচ্ছাচারী পুরুষের এরূপ ভয়ানক অত্যাচার ও গর্হিতাচরণ। এই ভাবে তিনি বত্রিশ বৎসর জীবন যাপন করেন। এতাবৎকাল কখনও কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নিজে সৈন্য চালনা করেন নাই, তাঁহার রাজ্যও কোন শত্রু আক্রমণ করে নাই। যে কোন কথায় অন্তরে চিন্তা ও ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে তাঁহার সভায় উহার উল্লেখ হইতে পারিত না। আশী বৎসর বয়ঃক্রম কালে নাসেরুদ্দীন নামক তাঁহার পুত্র তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করে।

এইরূপ বিলাস পরায়ণ ইন্দ্রাসক্ত রাজাদিগের অত্যাচার শ্রবণ করিলে শরীরের শোণিত গরম হইয়া উঠে। দয়াময় ঈশ্বর এই সকল রাজাদের হস্ত হইতে ভারতকে উদ্ধার করিয়াছেন।

আশা।

হে আশা তোমার মহিমা অপার; তুমি দুঃখে সান্তনা, অন্ধকারে আলো দুর্ভাগ্যে শান্তি যন্ত্রণায় আরাম।

হে আশা দূরগামিনী জগদ্ ব্যাপি, সকলের চিত্তেই তুমি বিরাজ কর। তুমি যাহাকে ত্যাগ কর সে দুর্ভাগ্য। তুমি যাহার চিত্তে নাই তাহার সকলি ফুরাইয়াছে। তোমার প্রভাবে মনুষ্য উৎসাহী হয়, সবল হয় সুখী হয়।

সকল প্রকার পার্থিব উন্নতির মূলে তুমি। ধর্ম্মরাজ্যেও তুমি প্রধান সহায়। তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া মানুষ সকল কর্ম্মে অগ্রসর হয়। তুমি যতক্ষণ প্রাণে থাক দুঃখ সন্তাপের তাড়নাতেও মানুষ সম্পূর্ণ ভগ্নোদ্যম ও অবসন্ন হয় না অন্ধকার জীবন আকাশে তুমি তারকা তুল্য।

হে আশা তুমি উচ্চপদবী আরোহণের সঙ্গী। ধর্ম্ম ও সংসার, উভয় পথে তোমার প্রয়োজন। তুমি না থাকিলে মানুষ কোন দিকে অগ্রসর হইতে পারে না।

হে আশা তুমি যখন দুরাশারূপে মানব হৃদয় অধিকার কর তখন সে কত বিপদে পড়ে, তুমি মরীচিকাতুল্য তাহাকে কত প্রলোভনে লইয়া যাও কত ভ্রান্তির পথ দেখাইয়া দাও। তখন তোমার ছলনায় সে প্রতারিত হইয়া বিপদে পড়ে, কত ক্লেশ পায়। তুমি যেমন একদিকে মনুষ্যের উন্নতি ও সুখের মূল, অন্যদিকে আবার তাহার অনেক দুঃখেরও কারণ স্বরূপ। তোমার অপব্যবহার করিলে মানুষ অনেক দুঃখ পায়।

হে আশা তোমা দ্বারা যেমন অশেষ উপকার ও কল্যাণ তেমনি অনেক অমঙ্গলও ঘটিয়া থাকে। ধন সম্পদ মান সম্ভ্রম সুখ শান্তি ধর্ম্ম পুণ্য সকলি তোমাকে লইয়া মানুষ উপার্জ্জন করে।

হে আশা তুমি সদাশা হইয়া সর্ব্বদা আমার অন্তরে বিরাজ কর। তোমার সাহায্যে আমি সুখ শান্তি ধর্ম্ম লাভ করিব।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী।

নারীজাতি যদি বিদ্যাভাস করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্যবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সুখের সময় সুখোচিত দুঃখের সময় দুঃখোচিত প্রসঙ্গ লইয়া স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন। তাদৃশ আলাপে প্রকৃত গার্হস্থ্য সুখ অনুভূত হয়। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কি ইহা লইয়াও স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে বিচার করিতে পারেন। অনেক সময়ে স্বামীর ভ্রমপ্রমাদ হইলে ধর্ম্মপরায়ণা সূক্ষ্মদর্শিনী পত্নীকর্ত্তৃক তাহা সংশোধিত হইতে পারে। মানুষ দুর্ব্বল, নানা কারণে সংসারে তাহার পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ পদস্খলন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন। আমরা এই বিষয়টি দেখাইবার জন্য যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কথোপকথন হইতে এ স্থলে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলিতে গিয়া সর্ব্বস্ব হারিয়াছেন এবং নানা অপমান ও নির্য্যাতনের পরে বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন। এক সময়ে এক বৃক্ষতলে বসিয়া দুঃখপ্রপীড়িতা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "মহারাজ! সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধনের মনে আমাদিগের জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ হয় না। তোমার সঙ্গে আমাকে চর্ম্ম পরাইয়া বনে পাঠাইল, ইহাতেও তাহার অনুতাপ হইল না!! আমার নিশ্চয় বোধ হয় সেই দুষ্কর্ম্মকারী দুর্য্যোধনের হৃদয় লৌহনির্ম্মিত। কেন না, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তোমাকেও সে, সে সময়ে অত্যন্ত কটু কথা সকল শুনাইয়াছিল। সুখভোগে থাকিবার উপযুক্ত এবং দুঃখের অযোগ্য তুমি, তোমাকে ঈদৃশ দুঃখে নিক্ষিপ্ত করিয়া সে পাপিষ্ঠ অমাত্য ও সুহৃদগণের সহিত আমোদিত হয়। সেই দুঃখের সময়ে কর্ণ, দুর্য্যোধন দুঃশাসন ও শকুনি কেবল এই চারি জন পাপিষ্ঠের চক্ষু হইতে জল পড়ে নাই, সভাস্থিত অন্য কৌরবগণ দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি সকলেরই আমাদের দুঃখে অশ্রুপাত হইয়াছে। মহারাজ! তোমার বনবাসের এই শয্যার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের পূর্ব্ব শয্যার তুলনা করিয়া দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্বে সভামধ্যে তুমি বসিয়া থাকিতে, তোমার চারি দিকে রাজগণ পরিবেষ্টিত থাকিত, এখন তোমাকে বন্যপশু পরিবেষ্টিত দর্শন করিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে তোমার যে দেহে চন্দনাগুরু ও পুষ্পমালা শোভা পাইত সেই দেহ এখন পঙ্ক ও মলার আশ্রয় দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ের শান্তি কোথায়? পূর্ব্বে কত বহু মূল্যের সুদৃশ্য পরিচ্ছদ তোমার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত, এক্ষণে তোমাকে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দেখিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। পূর্ব্বে শত শত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রতি দিন তোমার গৃহে স্বর্ণপাত্রে নানা উপাদেয় মিষ্ট সামগ্রী ভোজন করিত, সেই তুমি বন্য পশু দ্বারা বনবাসীদিগের সঙ্গে জীবন যাপন করিতেছ ইহা আমার অসহনীয় দুঃখ। তোমার ভ্রাতা ভীমসেন দশ সহস্র হস্তীর বলধারণ করে, একাকী সমুদয় শত্রু নিপাতে সমর্থ, তাহাকে এইরূপে বনবাসে বিষণ্ণ দর্শন করিয়া তোমার কিছু দুঃখ হয় না? অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও লঘুহস্ততার জন্য সহস্রবাহু অর্জ্জুনের তুল্য, যাহার প্রতাপে সমুদয় রাজন্যবর্গ ও সমুদয় পৃথিবী তোমার বশে আসিয়াছে, সেই অর্জ্জুনকে বিষণ্ণ দেখিয়া কেন তোমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় না? যে একাকী একরথে সমুদয় দেবতা ও মনুষ্যকে জয় করিয়াছে তাহাকে বনবাসী দেখিয়াও

তোমার ক্রোধ হয় না ইহাই আমার দুঃখ। যে নকুল চুর্ম্মীদিগের মধ্যে প্রধান, তরুণ বলমান ও পরম সুন্দর তাহাকে বনবাসী দেখিয়াও তোমার মন্যু হয় না? মহারাজ! সহদেব তোমাদিগের সকলের কনিষ্ঠ কখন দুঃখ ভোগ করে নাই, সেই আদরের ভ্রাতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কেন তোমার মনে ক্রোধের উদয় হয় না? আর হে রাজন! আমি দ্রুপদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রবধূ ও মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, কখনও দুঃখের সংবাদ জানি না; আমি বীরপত্নী আমাকে বনবাসিনী দেখিয়া কিরূপে তুমি ক্ষমা করিতে পার? আমার বোধ হয় আদবেই তোমার ক্রোধ নাই, কেননা এই সকল ভ্রাতাকে ও আমাকে এই দুঃসহ দুঃখভার বহন করিতে দেখিয়াও তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না? "মন্যুবিহীন ক্ষত্রিয় নাই" এই লৌকিক বাক্য প্রসিদ্ধ কিন্তু তোমাতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ দর্শন করিতেছি। উপযুক্ত সময়ে যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইয়া তেজ প্রকাশ করে না নিশ্চয় তাহাকে সর্ব্বদা সকলেই পরাভব করিয়া থাকে। অতএব শত্রুর প্রতি ক্ষমা করা কখন তোমার উচিত নয়। যে ক্ষত্রিয় ক্ষমা কালে ক্ষমা করে, তেজঃ প্রদর্শনের সময়ে তেজ প্রদর্শন করে সেই প্রকৃত ক্ষত্রিয়।

মহারাজ! আমি প্রহ্লাদ এবং বলি, উভয়ের একটি পুরাতন সংবাদ জানি, শ্রবণ করুন। এক সময়ে আপন পৌত্র বলি প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন. যে ক্ষমা আর তেজ ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাঙ্গলিক কি, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

প্রহ্লাদ বলিলেন, সর্ব্বদা তেজ ও মাঙ্গলিক নহে, ক্ষমাও সর্ব্বদা মঙ্গলদায়িনী হয় না। যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে সে বহু দোষ প্রাপ্ত হয়। ক্ষমাবান ব্যক্তিকে ভৃত্যেরা অবজ্ঞা করে, ঔদাসীন্যহেতু শত্রুগণও পরাভব করে। ক্ষমাশীল লোকের নিকটে কেহ অবনত হয় না। এই জন্য সর্ব্বদা ক্ষমাকে পণ্ডিতেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। অল্প বুদ্ধি লোকেরাও ক্ষমাশীলের কিন্তু গ্রহণ করিতে ভয় করে না, ভৃত্যেরা ও অবজ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বাহন, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা, আসন, ভোজ্য ও পানীয় প্রভৃতি সমুদয় উপকরণ ইহাদিগকে (ক্ষমাবান্) অবজ্ঞা করতঃ নীচ লোকেরা যথেচ্ছ ব্যবহার করে, এবং ভর্ত্তৃশাসন অনুসারে তাঁহাদিগের নিশ্চিত দেয় ও দেয় না। ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে ভৃত্যেরা ভর্ত্তার অনুরূপ সম্মান করে না। সুতরাং এ জগতে অবজ্ঞাত হওয়া অপেক্ষা মরণও ভাল। ক্ষমাশীল ব্যক্তির ভৃত্য, পুত্র, সেবক প্রভৃতিরা অমনোযোগী হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই কটু কথা শোনায়। এই প্রকার আরও অনেক দোষ ক্ষমাশীলদিগের সম্বন্ধে ঘটে।

তার পর অক্ষম লোকদিগের দোষের কথাও শোন। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিরা ক্রোধের স্থানাস্থান বিচার করিতে পারে না। সর্ব্বদাই ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া, তেজ সহকারে দণ্ডবিধান করে। যাহারা মিত্র তাহাদিগের সঙ্গে ও তাহারা বিরোধ করে, আত্মীয়দিগের সঙ্গে তাহাদিগের বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হয়। ইহারা অবমাননা; অর্থ হানি, অনাদর, সন্তাপ, বিদ্বেষ মোহ ও লাভ করে। অর্থাৎ স্থানাস্থান বুঝিতে না পারিয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া সহজেই অবমাননা, সহজেই অনাদর, সহজেই অর্থহানি মোহ ও সন্তাপ প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদা সকলেই ইহাদিগের প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করে। ক্রোধের বশ হইয়া দণ্ডবিধান করিলে, সে ব্যক্তি অতি শীঘ্র ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট, স্বজনভ্রষ্ট, ও প্রাণ হইতে ভ্রষ্ট হয়। যে ব্যক্তি অপকারী ও প্রাণহন্তার প্রতি তেজ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, গৃহাগত সর্পের ন্যায় তাহাদিগকে দর্শন করিয়া লোকেরা উদ্বেজিত হয়। যে ব্যক্তিকে দর্শন করিয়াই সমুদায় লোক উদ্বেজিত হয়, তাহার উন্নতি হইবে কিরূপে? তাহার অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে।

এই কারণে সর্ব্বদা তেজ প্রকাশ করিবে না, সর্ব্বদা মৃদুও হইবে না। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, হয় মৃদু না হয় তীক্ষ্ণ হইবেক। যে ব্যক্তি সময় বুঝিয়া মৃদু বা তীক্ষ্ণ হইতে পারে সেই ব্যক্তি ইহ পর লোকে সুখী হয়।

কোনটি প্রকৃত ক্ষমা করিবার কাল তাহাও বলি শোন। যে সকল লোক সর্ব্বথা অত্যাজ্য, যাহারা পূর্ব্বে কখন উপকার করিয়াছে তাহারা গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে। সর্ব্বদা সকল লোকেতে পাণ্ডিত্য থাকা অসম্ভব, এই জন্য যাহারা না বুঝিয়া অপরাধ করে তাহারাও ক্ষমা পাইবার যোগ্য। কিন্তু যে সকল লোক বুদ্ধি পূর্ব্বক অপরাধ করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার ভাণ করে, এবং যাহারা অসরল দুষ্টপ্রকৃতি, অল্প আপরাধেও তাহাদিগকে বধ করা উচিত।

একটি মাত্র যাহার অপরাধ, সে যে কোন প্রকারের লোক হউক না কেন, তাহাকে ক্ষমা করিবে, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয়বারে আর ক্ষমা করা উচিত নহে।

না জানিয়া যদি কেহ অপরাধ করে, তবে সেই অপরাধ না জানিয়া করিয়াছে কি না ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে। মৃদু কর্ত্তৃক দারুণ বিনষ্ট হয়, মৃদু কর্ত্তৃক অদারুণও বিনষ্ট হয়, মৃদু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই সুতরাং মৃদুকেই তীব্রতর বলিতে হইবে। দেশ কাল ও বলাবল বিচার করিয়া অনুষ্ঠান করিবে, কেন না অনুপযুক্ত দেশ কালে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। কেবল তাহাই নহে অনেক সময়ে লোকভয়েও

ক্ষমা করা উচিত। এইরূপে ক্ষমাও তেজের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্রৌপদী বলিতেছেন, "হে নরাধিপ। তোমার পক্ষে এইটি তেজের কাল উপস্থিত। দুর্ব্বুদ্ধি ও লুব্ধ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সকলের প্রতি আর অল্প কাল ও ক্ষমা করা সঙ্গত নহে। যখন তেজের সময় আসিয়াছে তখন তুমি তেজ প্রকাশ কর। নিতান্ত মৃদু হইলে অবজ্ঞাত হইতে হয় অতি তীক্ষ্ণ হইলে সমুদয় লোক উদ্বেজিত হয়, উভয়ের উপযুক্ত সময় যে জানে সেই প্রকৃত রাজা। দ্রৌপদী এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন।

সিয়ানস্থ সেণ্ট ক্যাথারাইণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এই সময়ে সেণ্ট ক্যাথারাইণের মন ঈশ্বরসহবাসের জন্য নিতান্ত লালায়িত হইয়া উঠিল। ঈশ্বরসহবাসই তাঁহার জীবনের অন্ন জল, সুখ স্বাস্থ্য হইয়া উঠিল। ঈশ্বরবিচ্ছেদযন্ত্রণা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। অত্যন্ত সুরাসক্ত ব্যক্তি সুরা পান করিতে না পাইলে অথবা তাহার মত্ততা অল্পমাত্র হ্রাস হইলে যেমন সুরাপানের জন্য উন্মত্তপ্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে, তাঁহারও দশা তদ্রূপ হইত। যখনই অল্পমাত্র বিচ্ছেদ হইত, তখনই তিনি উন্মত্তের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গের মনে যখন উক্তরূপ অবস্থা হইত তিনি চীৎকার করিয়া পাগলের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন এবং ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইতেন। ক্যাথারাইণের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। তিনি আপন শুদ্ধতা ও পাপের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপ করিতেন। এক দিন তিনি স্বপ্নযোগে দর্শন করিলেন যে তাঁহার প্রভু তাঁহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া তাহার ভিতর হইতে তাঁহার হৃদয়কে বাহির করিয়া লইলেন। হৃদয়ের রং কৃষ্ণবর্ণ ও দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ছিল, ক্ষণকাল পরে তাঁহাকে সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলতা ও পুণ্যে শোভিত করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে পুনর্ব্বার সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। ক্যাথারাইণ এই স্বপ্ন দেখার পর নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহার অনন্ত জীবনের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বেস অনুভব করিলেন এবং তিনি আপনাকে এক জন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত লোক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অন্তরের শুষ্কতা আর রহিল না। হৃদয়ে অবিশ্রান্ত প্রেমের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, পুণ্যের শুভ্রতায় সমস্ত জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শান্তি ও আনন্দ সরোবরের ন্যায় নিত্য বিদ্যমান রহিল। ক্যাথারাইণের ভাবান্তর ও রূপান্তর হইয়া গেল, স্বর্গীয় বিমল জ্যোতি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিল, তাঁহার চক্ষু অনবরত তাঁহার প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিতে লাগিল ও তাঁহার বাসনা নিরবচ্ছিন্ন

ভাবে প্রেমামৃত পান করিতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই সমাধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরের নাম শ্রবণে তাঁহার মন এমনি নিমগ্ন হইত যে তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা আর থাকিত না, শরীর মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া থাকিত, আত্মা পরমাত্মায় নিত্যানন্দে ডুবিয়া থাকিত। যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরের পূজনীয় পরলোকবাসী পরমহংস মহাশয়কে দেখিয়াছেন, অথবা শ্রীচৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ক্যাথারাইণের সমাধির অবস্থা কিরূপ হইত। সময়ে সময়ে এরূপ হইত তিনি এক স্থানে বসিয়া আছেন কেহ তাঁহার নিকট ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেন অথবা কোন উচ্চ ভাবে সৎপ্রসঙ্গ করিলেন অমনি তাঁহার মন এমনি মত্ত হইল, যে তাঁহার শরীর চেতনাশূন্য জড়বৎ হইয়া পড়িত! কখন কখন তিনি পাঁচ সাত দিন এইরূপ সমাধির মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। সমাধির অবস্থায় সংজ্ঞাশূন্য হইলে তাঁহার কর্ণের নিকট তাঁহার বন্ধুরা ঈশ্বরের নাম চীৎকারস্বরে করিতেন, অথবা কোন তীর্থযাত্রার কথা কিম্বা কোন সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেন, এই সমস্ত কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলেই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইত। এই সময়ে তাঁহার অন্তরে সাধুসমাগম হইতে লাগিল। সেণ্ট পিটর, সেণ্ট মেরি, সেণ্ট ডমনিক প্রভৃতি পরলোকগত সাধু সাধ্বীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব দৈবশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার একটি এরূপ আশ্চর্য্য আত্মদৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রভাবে তিনি মনুষ্যের শরীরকে ভেদ করিয়া তাহার আত্মা দেখিতে পাইতেন, কাহার আত্মা কিরূপ কদাকার কি সুন্দর তাহা অনায়াসে জানিতে পারিতেন। একদা তিনি রোম নগরস্থ পোপের প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত সন্ন্যাসী তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, ক্যাথারাইণ একেবারে ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন, এই পবিত্র গৃহের চতুর্দ্দিকে সয়তান সকল বেড়াইতেছে। সে কথার অর্থ তখন কেহ বুঝিতে পারিল না, অবশেষে প্রকাশ পাইল যে উপরিউক্ত সন্ন্যাসীগণ ভিতরে ভিতরে ব্যভিচার ও দুরাচার করিয়া থাকে, কেবল ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বাহিরে লোকের সম্মান আকর্ষণ করে। ক্রমে ক্যাথারাইণের শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। একে আজীবন বৈরাগ্যের গুরুতর আঘাতে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে সমাধি ও প্রেমোন্মত্ততা ভাবের প্রবল আঘাতে তিনি আহত হইতে লাগিলেন, তাঁহার দুর্ব্বল শরীর প্রবল আত্মার গুরুভার আর সহিতে অক্ষম হইয়া পড়িল। তাঁহার আত্মা স্বর্গ হইতে উচ্চতর স্বর্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল,

কিন্তু শরীর দুর্ব্বলতা ও রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল, তাঁহার দেহত্যাগের সময় নিকবর্ত্তী হইল। এই সময়ে ক্যাথারাইণ স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সংসার ত্যাগ করিবার স্বর্গীয় নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। তাঁহার আত্মাও সেই রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত নিত্যধামে যাইবার জন্য সমুৎসক ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি এ সমস্ত অবস্থা বুঝতে পারিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে একত্র করিলেন এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পরস্পরকে বিচার না করিয়া প্রেম করিতে অনুরোধ করিলেন। আপনি তাঁহাদিগের নিকট এক এক করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শরীর আপনাপনি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যেন ভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং "তোমার হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করি" এই শেষ প্রার্থনা করিয়া ২৯ শে এপ্রেল ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

সময়।

১

কি আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল, সময়, তোমার
নও তুমি ক্ষণস্থির সদা সুচঞ্চল
পার্থিব ঘটনা জীব-অদৃষ্টে সবার
সঞ্চারিত তবশক্তি হয় অবিরল।

২

ধনের কুবের ধনী আজি যেই জন
ধরণীর একচ্ছত্র যাহার করেতে
সময়, তোমার স্পর্শে পুনঃদরশন
ভিক্ষাবৃত্তি ধরে সেই দ্বারেতে দ্বারেতে।

৩

বীর নর রোম গ্রীস ইটালি দেশের
আর্য্য বীর বংশ শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব কৌরব
পৃথিবীর বিখ্যাত হায় বীরত্ব যাদের
প্রভাবে, সময়, তব সকলই নীরব।

৪

বহিত সাগর স্রোত যথা ভীমরবে
দুষ্ট যাদোকুল বাস করিত যথায়
শত তরী বারিগর্ভে নিমগ্ন নীরবে
সেই স্থান আজি শুষ্ক মরুভূমি প্রায়।

৫

কঠিন দৃশদ দেহ উচ্চ গিরিস্থান
শার্দ্দূলের বাস যায় নিভৃত নিবাসে
তরুলতা পুষ্প যথা ছিল শোভমান
গভীর সাগরে মগ্ন তোমার পরশে

৬

বিচরণ-শীল গ্রহ উপগ্রহচয়
ওই যে আকাশপথে করিছে ভ্রমণ
রাত্রি, দিবা, পক্ষ, ঋতু যাহাতে উদয়
কে জানে সে কক্ষভ্রষ্ট হইবে কখন।

৭

জনপদ—মরুভূমি, নগর—প্রান্তর
মরুস্থান—জনস্থান, পর্ব্বত-পাথার
সময় তোমার স্পর্শে সব অন্যতর
কে বুঝিবে ইন্দ্রজাল বলনা তোমার?

৮

পাপাসক্ত নরদল—নররক্ত পাত—
জীবনের ব্রত হায়? হয়েছে যাদের
ত্যজিয়া অসুরবৃত্তি মানব সঙ্ঘাত
দেব ভাব ধরি পুনঃ পূজ্য জগতের।

৯

কে বলিতে পারে কাল কখন কি করে,
ভাঙ্গা গড়া রীতি তার সৃষ্টির রতন
সময়ের স্রোতে চির ভাসে সব নরে
কে বলিতে পারে ভাগ্যে ঘটে কি কখন?

সম্রাট ফ্রেডরিক্।

জার্ম্মেণি রাজ্যের শিরোভূষণ, বীরজগতের গৌরব, প্রজাগণের পরম প্রিয় আমাদের মহারাজ্ঞী ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ জামাতা সম্রাট ফ্রেডরিক সম্প্রতি তিন মাস কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া আত্মীয় স্বজন প্রজাপুঞ্জ পরিবার সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার জন্য সকলেই খেদ করিতেছে। বীরত্ব শৌর্য্য বীর্য্যে ইহাঁকে অদ্বিতীয় বলিলেও বলা যায়। ইহাঁর ন্যায় দয়াবান সৎস্বভাব মহৎ প্রকৃতি পুরুষ অল্পই দেখা যায়। প্রজারা এরূপ গুণবান রাজা হারাইয়া আক্ষেপ করিতেছে। তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিল। নিজদেশে তিনি আপামরসাধারণ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তিন মাস কাল মাত্র তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু কঠিন রোগ যন্ত্রণা পাইতে পাইতেও তিনি রাজ্যের এবং প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য ব্যাস্ত ছিলেন। কেবল যে তিন মাস কাল তিনি রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা নহে। অনেক দিন হইতে তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর দেহে (তাঁহার তুল্য রূপবান পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না) কঠিন রোগের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার পিতা মহা প্রতাপশালী সম্রাট্ উইলিয়মের জীবদ্দশাতেই ফ্রেড্রিক্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে, কঠিন রোগশয্যায় পড়িয়া যে বীরত্ব ধৈর্য্য দেখাইয়াছিলেন তাহা সকলের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অল্পকাল মাত্র তিনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাম, তাঁহার উন্নত চরিত্রের সৌন্দর্য্য তাঁহার সৎদৃষ্টান্ত, তাঁহার সাহস বীরত্ব, তাঁহার সচ্চরিত্রতা জার্ম্মেনি ইউরোপ বা সমস্ত পৃথিবী হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। তিনি এখন সেই পরলোকধামে তাঁহার বীরশ্রেষ্ঠ পিতা বিখ্যাত সম্রাট্ উইলিয়মের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ করিয়াও ভবিষ্যত জগত ধন্য হইবে। তাঁহার ন্যায় সৎপুত্র, স্নেহময় পিতা, সৎস্বামী, উপযুক্ত রাজা পৃথিবীতে কয়জন হইয়াছে? আমাদের বিলাতের মহারাণী এই জামাতার শোকে না জানি কত ক্লেশে আছেন।

সম্রাট্ ফ্রেডরিক ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই

অক্টোবরে জার্ম্মেণি প্রদেশের অন্তর্গত পটস্‌ড্যামে জন্ম গ্রহণ করেন। গত ১৫ই জুন ৫৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জার্ম্মেনি রাজ্যের প্রথা অনুসারে বাল্য কালেই তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্যে প্রবেশ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে শিশু রাজকুমার সৈনিক কার্য্যের প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। দশ বৎসর বয়সে লেফ্‌টেনেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। পাঁচ বৎসর হইতে সৈনিককার্য্য যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন,৫৭ বৎসর পর্য্যন্ত অবিরামে সে কার্য্যে জীবন কাটাইয়াছিলেন। বীরের ন্যায় জীবন কাটাইয়াছেন বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এত সাহসী এবং রণকুশল ছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন।

তাঁহার পিতা উইলিয়মের রাজত্ব কালে বিস্তীর্ণ জার্ম্মেণি সাম্রাজ্যের এত জয়শ্রীলাভ প্রধানতঃ যুবরাজ ফ্রেডরিকের বীরত্ব প্রভাবেই হইয়াছিল। তিনি বহু বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কখনও অলস উদাসীন হইয়া সময় ক্ষেপ করেন নাই, অহরহ রাজ্যের মঙ্গল শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত্নবান ছিলেন। বিখ্যাত ইতিবৃত্ত লেখক কর্‌টিয়স সাহেব রাজকুমার ফ্রেডরিকের শিক্ষক ছিলেন তদ্ভিন্ন যুবরাজ কয়েক বৎসরের জন্য জার্ম্মেণি বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন সুবিদ্বান পুরুষ ছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে গমন করেন, পর বৎসর রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে গমন করেন, তাহার পর দুই বৎসর সুইজার্লাণ্ড এবং ইটালিতে কয়েক মাস যাপন করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন তৎকালে আমাদের জ্যেষ্ঠ রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ ধার্য্য হয়। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া তৎকালে সতের বৎসর বয়স্কা ছিলেন। এই বিবাহ সম্বন্ধ উভয়ের অভিমতে হইয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পরে মহা সমারোহের সহিত লণ্ডন নগরে সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদের ভজনালয়ে তাঁহাদের বিবাহ হয়। বিবাহ সর্ব্বাঙ্গীন সুখের হইয়াছিল। যুবরাজ এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের ত্রিশ বৎসর কাল পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগ ও প্রণয় বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহাদের ঐক্য এবং সৌহার্দ্দ্য ছিল। বিবাহের পর নববিবাহিত বর বধূ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং বার্লিন নগরে প্রজাপুঞ্জদ্বারা মহা আনন্দ উৎসাহের সহিত গৃহীত হইলেন। তাঁহাদের বিবাহের তিন বৎসর পরে তাঁহার পিতা রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে সম্রাট উইলিয়মের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ছিলেন। এই সময় হইতে রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যত সংগ্রামাদি হইয়াছিল, যুবরাজ ফ্রেডরিক তাহার নেতা হইতেন, এবং

সর্ব্বদাই কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার এবং তাঁহার পিতার বুদ্ধি ও বাহুবলে জার্ম্মেণি সাম্রাজ্য এত ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিল।

ফ্রেডরিক যে কেবল রণবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে। বিজ্ঞান, শিল্প, চিত্র, বিদ্যাশিক্ষা দাতব্যশালা ইত্যাদি সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য তিনি এবং তাঁহার পরম গুণবতী পত্নী যত্ন করিতেন। যুবরাজ ফ্রেডরিক সর্ব্বদা যুদ্ধ অবসানে আহত সৈনিকগণের নিকটে গিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। বিখ্যাত ফ্রাঙ্কো প্রসিয়ার যুদ্ধে তিনি অনেক বীরত্ব দেখাইয়া জয় লাভে সাহায্য করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার জীবন বীরত্ব এবং সৎকর্ম্ম পূর্ণ এক কাহিনী তুল্য।

সম্রাট ফ্রেডরিকের দুইটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা বর্ত্তমান। কন্যাদের মধ্যে প্রথমটির বিবাহ হইয়াছে এবং পুত্র দুইটিরই বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্রাটের জীবদ্দশায় অতি অল্প দিন পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। সম্রাট পীড়িত অবস্থাতেও তাহাতে যোগ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গত বৎসর জুবিলীর সময়ে ইংলণ্ডে যুবরাজ ফ্রেডরিক শেষবার আসিয়াছিলেন। যখন তিনি বীরসাজে সাজিয়া অশ্বারোহণে উচ্চবংশজাত বীর অশ্বারোহীবৃন্দের অগ্রে অগ্রে ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত ওয়েষ্টমিনিষ্টার একিতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বীরশ্রী-ব্যঞ্জক সুদীর্ঘ উন্নত বপুর কি শোভাই হইয়াছিল। তিনি এক জন বিখ্যাত সুপুরুষ ছিলেন।

গত বৎসর মে মাসে ফ্রেডরিকের কাল রোগের সূত্রপাত হয়। গলনলীর ভিতর বেদনা হইয়া অবশেষে কেনসর বা এক প্রকার স্ফোটকের উপক্রম হয়। অনেক চিকিৎসা হইল কিছুতে ফলোদয় হইল না বরং রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গত শীত ঋতুতে চিকিৎসকগণ তাঁহার নিশ্বাস বায়ু গ্রহণের জন্য কণ্ঠনলী অস্ত্র করিয়া গলনলীর সহিত একটি রৌপ্য নল সংযুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হন। তাহার দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা হইতে লাগিল। তিনি ধীর ভাবে এই সকল ক্লেশ সহ্য করেন। ইহার পর তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা প্রায় চলিয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে উপকার দর্শে। যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। আহার করিতে সক্ষম হন, নিদ্রাও ভালরূপে হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অল্প অল্প বেড়াইতেন, এবং অধ্যয়নে সময় ক্ষেপ করিতেন, কথা কহিবার দরকার হইলে ছোট ছোট কাগজে লিখিয়া মনের ভাব জানাইতেন। ইহার এক মাস পরে মার্চ্চ মাসের ৯ই তারিখে তাঁহার পিতা সম্রাট উইলিয়মের মৃত্যু হয় এবং ফ্রেডরিক পীড়িত শরীর লইয়া বিস্তীর্ণ জার্ম্মেণি-রাজ্যের অধিপতি হইলেন। তিনি

১২ ই মার্চ্চ তারিখে রাজ্যগ্রহণ কালে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতে এই বলিয়া নিজ পিতার উল্লেখ করেন "রাজভক্ত প্রসিয়ানজাতি, তাহাদের সুবিখ্যাত যশস্বী ভূপতিকে হারাইল। জর্ম্মেণ জাতি প্রসিয়া জার্ম্মেণজাতির মধ্যে যিনি ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাকে হারাইয়াছে, এবং এই নূতন সাম্রাজ্য তাহার প্রথম সম্রাটকে হারাইল।" নিজের সম্বন্ধে এই বলিয়াছিলেন "এই উচ্চ ভার পাইয়া আমার জীবনের প্রধান চেষ্টা এই হইবে যাহাতে আমি জার্ম্মেণ সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে পারি। আমার রাজভক্ত প্রজাগণ যাহারা এক শতাব্দী হইতে আমার বংশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুগত হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে আমি আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ের বিশ্বাস অর্পণ করিতেছি। রাজা এবং প্রজাগণের মধ্যে ঐক্য এবং বন্ধন, রাজ্য স্থায়ী হইবার মূল। আমি গম্ভীর ভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সুখে দুঃখে এই রাজ্যের উপযুক্ত রাজা হইব। ঈশ্বর আমাকে এমন ক্ষমতা ও বল দিন এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই কার্য্যে আমি সমস্ত জীবন নিয়োজিত করি, এবং তাহাতে সফল হই।"

হায়, রাজ্য লাভের পনর দিবস পরেই সম্রাটের রোগ বৃদ্ধি হইল। তিনি কিছু দিন আর স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার পুত্র যুবরাজ দ্বিতীয় উইলিয়ম রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সকলেই ইহাতে সম্রাটের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে নিরাশ হইল। মধ্যে তিনি আবার একটু ভাল হইয়াছিলেন এবং ২২ শে মার্চ্চ তারিখে মৃত সম্রাট্ উইলিয়মের জন্ম দিনের স্মরণার্থ যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে যোগ দান করেন, এবং অল্প অল্প রাজকার্য্য করিতেও আরম্ভ করেন। ইহার পর এপ্রেল মাসে আবার পীড়া বৃদ্ধি হয় ঐ সময়ে আমাদের কুইন ভিক্টোরিয়া জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। মে মাসে সম্রাট্ কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করেন এবং শকটারোহণে বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। পীড়িত অবস্থায় তাঁহার পত্নী স্বহস্তে সর্ব্বদা পতিসেবা করিতেন। এই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ হেন্‌রির বিবাহ হয়। সম্রাট্ ঐ কার্য্যে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। তাহার কিছু দিন পরে তিনি সপরিবারে সার্লটনবর্গ হইতে নৌকাযোগে পটস্‌ড্যাম নগরে ফেডরিকস্‌ক্রন প্রাসাদে গমন করিলেন। এই সময় তাঁহার গিলিতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ১২ই জুন হইতে রোগ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎসঙ্গে জ্বর আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, পত্নীর প্রাণপণ সেবায়ও কিছু ফলোদয় হইল না। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণও কিছুই করিতে পারিলেন না, অবশেষে শেষ সময় উপস্থিত হইল। ১৫ই জুন প্রাতে ১০ টার সময় প্রধান চিকিৎসক সার্ মরেল্ মেকেঞ্জি মৃত্যুশয্যায় শয়ান সম্রাটের শয়নগৃহ হইতে বাহিরে গেলেন এবং সম্রাট্ কুমার যুবরাজ উইলিয়মকে পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া পিতার শয্যার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সম্রাট্ একখানি পিত্তল নির্ম্মিত খাটে শয়ান ছিলেন। তাঁহার পত্নী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া শয্যার অপর পার্শ্বে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং নীরবে প্রিয়তম স্বামীর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে সম্রাট্ ইঙ্গিতে পত্নীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, রাজ্ঞী শশব্যস্তে নিকটে গেলে মৃদু ক্ষীণ স্বরে কয়েকটি অস্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শেষ কথা। সেই কথা গুলি রাজ্ঞী ভিন্ন অপর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। সম্রাটের চরণপ্রান্তে শয্যানিম্নে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চারি কন্যা এবং দুই পুত্রবধূ অবনত মস্তকে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। ধর্ম্মপুরোহিত শয্যার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুস্বরে সময়োপযোগী প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিতেছিলেন। কিছু দূরে আর সকল আত্মীয় স্বজনগণ বিষণ্ণ ভাবে দণ্ডায়মান। দাস দাসীগণ দ্বারপথে অধোবদনে অবনতশিরে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত। ঘরের ভিতর স্থির; বিষাদের গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। কেবল মধ্যে মধ্যে শোকের উচ্ছ্বাসের মৃদু রোদন শব্দ সে গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিতেছিল। সম্রাটের প্রিয় বহু দিনের পুরাতন বিশ্বাসী অনুচর বৃদ্ধ ওয়েণ্ডেলেনের শোকের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রুত হইতেছিল। চিকিৎসকেরা ঘন ঘন নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিলেন। নাড়ী প্রতিনিমেষে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। বেলা ১১ ঘটিকার সময় প্রধান চিকিৎসক রাজ্ঞীকে ইঙ্গিত করিলেন সেই ইঙ্গিতের অর্থ—শেষ সময় উপস্থিত। রাজ্ঞী ভক্তির সহিত প্রিয়তম স্বামীর হস্ত চুম্বন করিলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই সম্রাটের দেহ হইতে প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। জার্ম্মেণি রাজ্যের বীরসূর্য্য অনন্তকালগর্ভে অস্তমিত হইল। কিন্তু তাঁহার যশগৌরব বীরমত্তার কাহিনী ভুবনে বিখ্যাত রহিল।

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে সম্রাটের এক কন্যার জন্মের সাম্বৎসরিক দিবস কুমারী ধীরে ধীরে পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্নেহময় পিতার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সম্রাট কন্যার জন্মদিন ভুলেন নাই। কন্যাকে ইঙ্গিতে নিকটে আহ্বান করিয়া এক খণ্ড কাগজ তাঁহার হস্তে দান করিলেন তাহাতে লেখা ছিল "বৎসে, তুমি এত দিন যেরূপ সৎস্বভাবা ছিলে তাহাই থাকিও, তোমার মৃত্যুশয্যায় শয়ান পিতার এইমাত্র কামনা।" সম্রাট্ ফ্রেডরিক বীরের

ন্যায় জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, বীরের তুল্য ধীর ভাবে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবন শেষ করিয়া অনন্ত রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্মৃতিও অনেকের জীবনকে ভাল করিবে। তাঁহার আত্মা চির আরাম শান্তি লাভ করুক।

যশোদার কোলে নীলমণি।

১

কোলে নীলমণি রাণী যশোমতী
গালভরা হাসি বদন খানি ;
প্রেমে পুলকিত স্নেহে গদ্‌গদ
মধুর অধরে মধুর বাণী।

২

আদরে গলিয়া ক্ষীর সর ননী
দেন তুলে শিশু তনয়মুখে ;
বসন অঞ্চলে মুছাইয়া তনু,
করেন চুম্বন মনের সুখে।

৩

কখন আহ্লাদে বুকের উপরে
ধরেন চাপিয়া যুগল করে ;
যাদু বাছা বলি প্রাণের গোপালে
ডাকেন সোহাগে মধুর স্বরে।

৪

যেমন যশোদা স্নেহের প্রতিমা
তেমনি গোপাল গুণের নিধি ;
প্রেমের সাগরে চাঁদের উদয়
যেন পুত্ররূপে স্বয়ং বিধি।

৫

কিবা সুকোমল অঙ্গের গঠন,
কেমন সুন্দর নয়ন দুটি ;
চারু চন্দ্রাননে হাসির বিজলী,
মাথার উপরে শোভিছে ঝুঁটি।

৬

দিয়ে হাতে তালি বেড়ায় নাচিয়া
করে কত নব রসের খেলা ;
হাসে মৃদু মৃদু, যেন নীলাকাশে
হাসে তারামণি সাঁঝের বেলা।

৭

সেই হাসি মুখে মধুর অধরে
ঝরে অবিরত অমিয় রাশি ;
করি দরশন সে রূপের ভাতি
মায়ের আননে ধরে না হাসি।

৮

ও গো বঙ্গ নারী, কারে লয়ে কোলে
রয়েছ আদরে যতনে ধরি ;
কার মুখে ঢালি দেও স্তন্যসুধা
রূপ দেখে আমি কেঁদে যে মরি।

৯

এ মোহন রূপ নিরখি কোমল
বিখ্যাত পণ্ডিত পরম জ্ঞানী ;
নারী পূজা বিধি করিল প্রচার
কল্পিত মানব ধরম মানি।

১০

গোপালের বেশে স্বয়ং ভগবান্
করেন বিরাজ তোমার কোলে ;
নানা রঙ্গ রসে হাসিয়া খেলিয়া
কহিছেন কথা মধুর বোলে।

১১

সন্তান পালন করিবে যখন
দেখ তার মাঝে গোলোকপতি ;
সংসারে বসিয়া পাবে পরিত্রাণ
সশরীরে স্বর্গে হইবে গতি।

১২

যথা যশোমতী রাণী ভাগ্যবতী
পেয়েছিল কোলে গোপাল ধনে ;
তোমরা তেমনি শিশু দেবতায়
কর সেবা পূজা আনন্দ মনে।

(কাব্যকাহিনী)

ভায়োলা।

সেক্সপিয়র কাব্যের আর একটি সুন্দর চরিত্র ভায়োলা। ভায়োলা মুগ্ধস্বভাবা সরলা, কোমলহৃদয়া। এক দিকে প্রেমের গভীরতা ও সুমিষ্টতা, অপর দিকে আত্মবিসর্জ্জনের ভাব, পবিত্রতা। বালিকা সুলভ নির্দ্দোষ মধুর ভাব এই তরুণীর প্রকৃতিতে বর্ত্তমান।

ভায়োলা এবং সিবাষ্টাইন দুই যমজ ভাই ভগিনী। ইহাঁদের উভয়ের আকৃতি মুখ ইত্যাদি এক প্রকারের ছিল। যৌবন কালে পিতা মাতার মৃত্যুর পর ইহাঁরা দুই ভ্রাতা ভগিনী অর্ণবযানযোগে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকায় তরী জলমগ্ন হয়। অনেক কষ্টে অল্প সংখ্যক আরোহী জাহাজের কাপ্তেন এবং নাবিকগণ ক্ষুদ্র নৌকা-যোগে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। যাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ভায়োলা একজন। তীরস্থ হইলে ভায়োলা ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা হয় নাই দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে যখন অর্ণবতরী জলমগ্ন হয় তিনি ভায়োলার ভ্রাতাকে নির্ব্বিঘ্নে জাহাজের ভগ্ন মাস্তুল ধরিয়া ভাসিয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা পাইয়া থাকিবেন। ভায়োলা এই সংবাদে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং নিজে সেই অপরিচিত বিদেশে কি করিবেন স্থির করিতে লাগিলেন। কাপ্তেনকে দেশের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

কাপ্তেন বলিলেন, "এ দেশের নাম ইলিরিয়া।"

ভায়োলা। এ দেশের রাজা কে?

কাপ্তেন। ওর্‌সাইনো নামক মহৎ চরিত্র এক জন ডিউক এ দেশের অধিপতি।

ভা। আমার পিতার মুখে আমি ইহাঁর নাম শুনিয়াছি তখন তিনি অবিবাহিতা ছিলেন।

কা। এখনও তাহাই। কিন্তু সম্প্রতি লেডি ওলিভিয়া নাম্নী এক জন উচ্চ-বংশীয় মৃত কাউণ্টের কন্যার প্রতি তিনি অনুরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু শুনিয়াছি লেডি ওলিভিয়া তাঁহার একমাত্র ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া-

ছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সাত বৎসর পুরুষের মুখ দেখিবেন না। চিরকুমারীর তুল্য গৃহের অভ্যন্তরে বাস করিবেন।

ভা। হায়, আমি যদি এই লেডিওলিভিয়ার অধীনে কিছু দিন কার্য্য করিতে পাইতাম। যত দিন না আমার প্রকৃত অবস্থা এবং পরিচয় জানাইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় তত দিন ইহাঁর পরিচর্য্যা করিতে পারিতাম!

কা। তাহা হওয়া বড় কঠিন, ভ্রাতার মৃত্যু অবধি লেডি ওলিভিয়া ডিউকের সহিত পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করেন না।

ক্রমশঃ—

স্বর্ণরেণু।

মানুষের জীবন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, যে পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় থাকে সে ধন্য।

অধীনতার ন্যায় দুঃখ নাই, কিন্তু ভালবাসা থাকিলে অধীনতাও সুখের বলিয়া বোধ হয়।

ধৈর্য্য যাহার আছে তাহার তুল্য বীর নাই। সংসারের নানা বিরক্তিকর ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যে যে ধীর থাকিতে পারে তাহাকেই বীর বলি।

যাহার আশা নাই তাহার তুল্য দুর্ভাগা নাই। যতক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণ মানুষ সম্পূর্ণ অসুখী হইতে পারে না।

আদর্শ গৃহিনী তিনি, যিনি সংসারে সুশৃঙ্খলা রাখিতে জানেন। আদর্শ গৃহিনী তিনি; যিনি সংসারে শান্তি কুশল রক্ষা করিতে পারেন।

সকল বস্তুই নূতন ভাল,কেবল পুরাতন স্মৃতি অধিক মধুর।

বাহিরের সৌন্দর্য্য অচিরস্থায়ী অন্তরের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং চিরদিনের।

বাদ্য, সঙ্গীত, এবং শিশু যাহারা অপ্রিয় তাহার তুল্য দুর্ভাগা আর নাই।

যে আপনাকে ভালবাসে সে পশু, যে আপনার লোককে ভালবাসে সে মনুষ্য, যে ঈশ্বরকে প্রেম করে সে দেবতা।

বাহিরের বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ নহে, অন্তরের বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৫ সংখ্যা।] ভাদ্র, সন ১২৯৫। [১১ খণ্ড।

(কাব্যকাহিনী।)

ভায়োলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তখন বুদ্ধিমতী ভায়োলা অনন্যগতি হইয়া পুরুষবেশ ধারণ করিয়া ডিউক ওর্সাইনোর পরিচর্য্যা করিবার মানস করিলেন। এই ইচ্ছায় তিনি কাপ্তেনের দ্বারা তাঁহার ভ্রাতার অনুরূপ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া স্বয়ং পরিধান করিলেন। তাঁহাকে তখন একটি সুন্দর তরুণবয়স্ক যুবকের ন্যায় দেখাইতে লাগিল, এবং ঠিক বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার ভ্রাতা শিবাষ্টাইন। এইরূপ ছদ্মবেশে ভায়োলা কাপ্তেনের সহিত ডিউক ওর্সাইনোর নিকট গমন করিলেন। কাপ্তেন তথাকার রাজপ্রাসাদে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভায়োলাকে ডিউকের অধীনে কোন কার্য্য দিতে অনুরোধ করিলেন। ডিউক যুবকবেশধারী ভায়োলার সরল সুকুমার মূর্ত্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার পেজ্ বা সহচর করিলেন। এই সময়ে ডিউক লেডি ওলিভিয়ার প্রণয়ে এত দূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রেমের প্রত্যর্পণ না পাইয়া রাজকার্য্য ইত্যাদি সমস্ত এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া মনোদুঃখে কেবল গির্জ্জায় বাস করিতেন এবং বাদ্য সঙ্গীত ইত্যাদি দ্বারা চিত্তরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতেন। এখন মেসেরিও নামধারী ভায়োলা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মনোমত সঙ্গী হইল। তিনি সর্ব্বদা ইহাঁর নিকট নিজের প্রেমের কাহিনী বলিয়া তৃপ্ত হইতেন এবং বাদ্য গীতাদি শ্রবণে মনের ক্লেশ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। অবশেষে ডিউক ভায়োলাকে লেডি ওলিভিয়ার নিকটে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে ভায়োলা ডিউক ওর্সাইনোর অনুচররূপে থাকিতে থাকিতে স্বয়ং তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেন কিন্তু তথাপি প্রভুভক্তির অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভুর মনোবাঞ্ছা সফল করিবার মানসে ওলিভিয়ার দ্বারস্থ হইলেন। অনুচরবর্গ বলিল "আমাদের কর্ত্রী এখন অসুস্থ।" তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভায়োলা বলিলেন, "আমি তাহা জানিয়াই আসিয়াছি।" তাহারা বলিল "তিনি নিদ্রিতা আছেন।" ভায়োলা উত্তর করিলেন "তাহা জানি-

যাই আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি।" অনুচরগণ বলিল "তিনি তোমার সহিত দেখা করিবেন না।" ভায়োলা বলিলেন "যত ক্ষণ না তাঁহার সাক্ষাৎ পাই এই দ্বারে কাষ্ঠ স্তম্ভ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিব।" অনুচরগণ অগত্যা লেডি ওলিভিয়ার নিকটে অভ্যাগত দূতের আগমনবার্ত্তা প্রদান করিতে গেল, এবং বলিল যে, "সে কিছুতেই ফিরিল না।" লেডি ওলিভিয়া ভায়োলার সহিত তাঁহার অনুচরগণের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া কিঞ্চিৎ কৌতূহল পরবশ হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন, এবং সহচরীকে নিকটে থাকিতে বলিয়া আপনার মুখাবৃত করিয়া তাহাকে সম্মুখে আহ্বান করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে আহূত হইয়া ভায়োলা লেডি ওলিভিয়ার সম্মুখীন হইলেন, এবং প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই গৃহের মাননীয় কর্ত্রী কে?"

ওলিভিয়া। কি বলিতে চাও বল আমি তাঁহার হইয়া উত্তর দিতেছি।

ভায়োলা। হে অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী মহা প্রভাবশালিনী—অনুগ্রহ করিয়া বলুন আপনি লেডি ওলিভিয়া কি না, কারণ আমি তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। আমি বহু কষ্টে কয়েকটি কথা রচনা ও মুখস্থ করিয়া আনিয়াছি; মিনতি করিয়া বলিতেছি বৃথা এ কথা গুলি বলাইবেন না, আমাকে বিদ্রূপ করিবেন না।

ওলিভিয়া। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

ভা। আমি যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা ভিন্ন অধিক কথা বলিতে জানি না। বলুন আপনি এই গৃহের কর্ত্রী কি না। তাহা জানিয়া আমি আমার কথা গুলি বলি।

ও। তুমি কি অভিনয় করিতে আসিয়াছ?

ভা। না, না, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যা আমি অভিনয় করিতেছি আমি তাহা নয়। আপনি এই বাটীর কর্ত্রী?

ও। হাঁ আমি তাই। বল তোমার কি বলিবার আছে।

ভা। আমি অতিযত্নে আপনার প্রশংসা বাক্যগুলি রচনা করিয়া আনিয়াছি। ইহাতে কবিত্বও আছে।

ও। কবিত্ব আছে! তবে সম্ভবতঃ তাহা কপট বাক্য। আমি তোমায় অনুরোধ করিতেছি সে কথা বলিয়া কাজ নাই। আমি শুনিলাম তুমি নাকি আমার বাটীর দ্বারে আসিয়া উৎপাত করিতেছিলে সে জন্য আশ্চর্য্য হইয়া তোমার এত সাহস কেন জানিবার জন্যই ডাকিয়াছি, তোমার কথা শুনিবার জন্য নয়। যাহা বলিতে চাও শীঘ্র বল।

ভা। আমি দূত হইয়া আসিয়াছি আমাকে আপনার মনের ভাব বলুন। ভায়োলা লেডি ওলিভিয়ার রূপের প্রশংসা শুনিয়াছিলেন কৌতূহল পরবশ হইয়া বলিলেন "এক বার আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আপনার মুখ খানি দেখিতে দিন।" ওলিভিয়া যুবার কথাবার্ত্তায় আকৃতিদর্শনে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন এবং অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যুবার অনুরোধে পূর্ব্ব সঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া মুখাবরণ খুলিলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "দেখিতে চাও দেখ, আমার আকৃতি এইরূপ। কি মনে হয়, ইহা কি ভালরূপে গঠিত বোধ হয়?"

ভা। যদি সমস্তটা ভগবানের হাতের হয় তবে অতি সুন্দরই বটে। আপনার অতি অন্যায় যে এমন রূপ রাশি আপনি চিরকাল গোপনে রাখিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে চান।

অনন্তর মধুরস্বরে ভায়োলা ডিউক ওর্সাইনোর প্রণয়বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ওলিভিয়া বলিলেন, তোমার প্রভুকে বলিও আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিব না। বলিও আর যেন তিনি আমার নিকট দূত প্রেরণ না করেন। তিনি কি বলেন, আমাকে জানাইতে যদি তুমি আসিতে চাও আসিও—

এই বলিয়া লেডি ওলিভিয়া ভায়োলাকে বিদায় করিলেন। কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে তাঁহার চিত্ত তরুণ-যুবকবেশধারী ভায়োলার সুন্দর আকৃতি ব্যবহার ভাবভঙ্গি আলাপাদিতে এতদূর অনুরক্ত হইয়া গেল যে, ঈলিরিয়াপতি ডিউক ওর্সাইনো যে প্রেমের বিনীত ভিখারী, সেই প্রেম অযাচিতরূপে যুবার উপর গিয়া আপনা আপনি পড়িল। এমনি মানুষের হৃদয়। ক্রমশঃ।

অদ্ভুত অলঙ্কার প্রিয়তা।

সভ্য অসভ্য নারীমাত্রেই অলঙ্কার-প্রিয়া। ক্ষুদ্র বালিকা হইতে যুবতী ও প্রৌঢ়া এমন কি অনেক লোলিত-চর্ম্ম বৃদ্ধা পর্য্যন্ত নানাবিধ ধাতু ও প্রস্তরের অলঙ্কার নানা অঙ্গে পরিধান করিয়া লোকের নিকটে আপনার দেহ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। এই অলঙ্কার পরিধানের সাধে কত নারী কর্ণে নাসিকায় গণ্ডায় গণ্ডায় ছিদ্র করিয়া কষ্ট ভোগ করেন, ধাতু প্রস্তরাদির ভারে নিপীড়িত হন। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার পরিতে যাহার ক্ষমতা নাই, তিনিও কাঁসা পিত্তলের অলঙ্কার পরিয়া মনের সাধ মিটাইয়া থাকেন। বাইবেল গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে "নারীগণ লজ্জা ও সুশীলতা সহকারে ভদ্র-বসনে আপনাদিগকে সুসজ্জিত করুন; কেশবিন্যাস, স্বর্ণ, মুক্তা, অথবা বহুমূল্য বেশে ভূষিত না হইয়া, সাধ্বী স্ত্রীগণের উপযুক্ত সৎক্রিয়া দ্বারা সুশোভিত হউন।" এই মহামূল্য উপদেশ অনুসারে চলিলে নারীজীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

ঢাকা নগরে আফিসের একজন কর্ম্মচারী বাবুর পত্নীর অদ্ভুত অলঙ্কারপ্রিয়তা পাঠিকাগণ শ্রবণ করিলে অবাক্ হইবেন। তাঁহার স্বামী তাদৃশ সম্পন্ন নহেন, তাঁহার সামান্য আয়, তদ্দ্বারা কোনরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। পত্নীর অলঙ্কার পরিধানে প্রগাঢ় অনুরাগ। সাংসারিক নিয়মিত খরচ পত্র চালাইবার জন্য স্বামী তাঁহার হস্তে অর্থ অর্পণ করেন, তিনি তাহা হইতে কিছু কিছু করিয়া টাকা বাঁচাইয়া ক্রমে প্রায় সহস্র টাকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই অলঙ্কারগুলি একেবারে হারাইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হন। স্বামী তাঁহাকে অলঙ্কার পরিতে দেখিলে বিরক্ত হইতেন, তজ্জন্য বাবু আফিসে চলিয়া গেলে অলঙ্কারগুলি বাক্স হইতে বাহির করিয়া সাদরে অঙ্গে ধারণ করিতেন, ও আনন্দে বিহ্বল হইতেন। তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বে কয়েক জন ইতর মোস্‌লমানের বাড়ী। বধূটি অলঙ্কার পরিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া সেই মোস্‌লমান নরনারীদিগকে তাহা দেখাইতেন, এবং স্বামীর আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় হইলেই আভরণগুলি অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া বাক্সে পুরিয়া সিন্দুকে বদ্ধ করিতেন। প্রতিদিন তাঁহার এই আমোদ ও এই কার্য্য ছিল। দৈবাৎ এক দিন তিনি সিন্দুকে অলঙ্কার স্থাপন করিয়া কুলুপ সংযুক্ত করেন নাই, সিন্দুক সেই অবস্থায়ই থাকে। স্বামী স্ত্রী রাত্রিতে নিদ্রিত, গৃহে দীপ জ্বলিতেছে, এমন সময় চোর আসিয়া বাক্স শুদ্ধ সমুদয় অলঙ্কার চুরি করিয়া প্রস্থান করে। সিন্দুকের ডালা উন্মুক্ত রাখিয়া যায়। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে বাবু জাগরিত হইয়া তাকাইয়া দেখেন যে, সিন্দুক উন্মুক্ত। তখন পত্নীকে জাগাইয়া বলেন, "সিন্দুক খোলা কেন? তুমি কি সিন্দুক উন্মুক্ত রাখিয়াছ?" পত্নী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সিন্দুকের নিকটে যাইয়া দেখেন যে অলঙ্কারের বাক্স নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিয়া আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যান। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মূর্চ্ছার অপনোদন হয়। তিনি পুত্র শোকাতুরা রমণীর ন্যায় নানা প্রকার বিলাপ করিয়া কাঁদিতে থাকেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করেন না। তাঁহার আহার নিদ্রা এক প্রকার বন্দ হয়। তিনি অবিরত নয়নজলে অভিষিক্ত হইতে থাকেন। কোন আত্মীয় কুটুম্ব নারী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া বলিতেন, আমার পোড়ার মুখ আর কি দেখিতে আসিয়াছ, আমার কি আর সে দিন আছে, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই বলিয়া কাঁদিতেন ও বিলাপ করিতেন। সেই অলঙ্কারের শোক স্বামিশোক ও পুত্রশোককে পরাস্ত করিয়াছিল। শুনিলাম সেই অলঙ্কারপ্রিয়া যুবতী ছয় মাস পরে সন্তনা লাভ করেন। কেমন পঠিকা, ইহা কি অদ্ভুত অলঙ্কারপ্রিয়তা নহে?

সন্তানের সমাধি।

গৃহে শোকবিষাদের ঘন অন্ধকার। গৃহবাসিগণের হৃদয় অবসন্ন। পিতা মাতার হৃদয়ানন্দ ফুল্লকুসুমবৎ সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আরও দুইটি সন্তান তাঁহাদের বর্ত্তমান ছিল। দুইটি মনোরমা কন্যা। কিন্তু যে সন্তান চিরকালের মত পলায়ন করিয়াছে তাহার তুল্য প্রিয় কোন সন্তানকেই বোধ হয় না। জনক-জননীর মনে গভীর খেদ। বালিকা দুইটির ছোট ভাইটির জন্য মন কেমন করে, মা বাপের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া দুঃখ হয়। মাতার প্রাণ একেবারে শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। দিবারাত্রি তিনি রুগ্ন সন্তানের সেবা করিয়াছেন, তাহাকে আহার পান করাইয়াছেন, ক্রোড়ে করিয়াছেন, রোগযন্ত্রণা উপশমের চেষ্টা করিয়াছেন, এখন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না যে, সে সন্তান চিরকালের মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না যে তাঁহার ক্রোড়ের শিশুকে কঠিন মৃত্তিকানিম্নে শয়ান করাইতে হইবে। তিনি ভাবিতেন, ঈশ্বর কি এত নির্দ্দয় যে তাঁহার প্রাণের সন্তানকে কাড়িয়া লইবেন? যখন যথার্থই তাহা ঘটিল তখন মাতার মনে কঠোর কষ্টের তাড়নে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস আসিয়া পড়িল। জীবন মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, অনন্ত মৃত্যুর ছবি মনের ভিতর প্রকাশ হইতে লাগিল। গভীর নিরাশা আসিয়া জননীর প্রাণকে আচ্ছন্ন করিল। বিষম শোকে তিনি যেন প্রস্তরবৎ হইয়া পড়িলেন। সে কষ্ট এত ভয়ানক যে নয়ন অশ্রুশূন্য। তাঁহার অবশিষ্ট কন্যা দুইটীর কথা আর তিনি ভাবেন না, তাঁহার স্বামীর অশ্রুজল তাঁহার ললাটে পতিত হইত তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত চিন্তা সেই মৃত সন্তানের নিকট। সেই সন্তানের আকৃতি প্রকৃতি প্রতিকথা কেবল তাঁহার চিন্তার এক মাত্র বিষয় হইল। সেই মৃত সন্তানের পার্শ্বে তিনি বসিয়া রহিলেন, তাহাকে ছাড়িবেন না। সন্তানকে সমাধিস্থ করিতে লইয়া যাওয়া কঠিন হইল। বহুরাত্রি জাগরণে মাতার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, নিশা অবসান প্রায় হইয়াছে, এমন সময় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দুঃখিনী জননীর নিদ্রাকর্ষণ হইল। সেই সুযোগে মৃত সন্তানকে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হইল। মাতা জাগ্রত্ হইয়া সন্তানকে চাহিলেন, সন্তানের পিতা বলিলেন তাহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। জননী বহু বিলাপ করিয়া বলিলেন, "হায় ঈশ্বর যখন আমার প্রতি এত নির্দ্দয়, তখন মানুষ আর আমাকে

কেন দয়া করিবে? আমার শিশুকে কাড়িয়া লইয়া গেল।"

সন্তান সমাধি নিহিত হইল। মাতার আহার নাই, নিদ্রা নাই, স্বামী সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি নাই, কেবল শোকে নিমগ্ন হইয়া আছেন। স্বামী দুঃখিতচিত্তে পত্নীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন—কন্যাগণও তাহাই করেন, কিন্তু কিছুতেই শোকের প্রবল বেগের উপশম হয় না। মাতার চক্ষে নিদ্রা নাই, এক গভীর রজনীতে সন্তানের পিতা যখন নিদ্রাগত ছিলেন, তখন উন্মাদিনী-প্রায় মাতা শয্যা হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক অনতিদূরে সন্তানের সমাধি স্থানে গমন করিলেন। নিস্তব্ধ রজনী, পথ জনশূন্য, চারিদিক নির্জ্জন। সেই সুশীতল মৃদুনক্ষত্রালোকে আলোকিত রজনীতে মাতা প্রিয়তম সন্তানের সমাধিপার্শ্বে নতমস্তকে উপবেশন করিলেন, এবং নীরবে অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ পার্শ্ব হইতে গম্ভীর স্বরে কে বলিল "হে নারি, তুমি কি সমাধিগর্ভে তোমার সন্তানের নিকটে যাইতে ইচ্ছা কর?"

মাতা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, এক জন দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ এবং মুখে যৌবনের কান্তি।

নারী নৈরাশ্যের সহিত গভীর খেদোক্তি করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায়, আমি কিরূপে আমার শিশুর নিকট যাইব?"

দীর্ঘাকার পুরুষ পুনরায় বলিলেন, "তুমি কি সাহস করিয়া আমার সহিত যাইতে পারিবে? আমার নাম মৃত্যু।"

নারী মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি প্রদান করিল। তখন মাতার বোধ হইল যেন চারিদিক পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোতিতে বিভাসিত হইয়া উঠিল, সমাধির উপরে নানাবর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। ধীরে ধীরে যবনিকাতুল্য মৃত্তিকার আবরণ খুলিয়া গেল। মাতা সেই দ্বারপথে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যুর অন্ধকার তাঁহাকে গ্রাস করিল। কিছু ক্ষণ পরে তিনি এক প্রকাণ্ড সুন্দর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, প্রদোষ কালের মৃদু আলোকে চারিদিক আলোকিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে মাতার হারাণনিধি প্রিয়তম সন্তান তথায় উপস্থিত হইল, মাতা আনন্দে বিহ্বলা হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। দেখিলেন শিশুর সৌন্দর্য্য সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। নিকটে এবং দূরে সুন্দর সুমিষ্ট বাদ্যলহরী উত্থিত হইল। এমন সুন্দর বাদ্য তিনি কখনও শ্রবণ করেন নাই। সেই বাদ্য গৃহের অপর পার্শ্বস্থ কৃষ্ণবর্ণ যবনিকার অন্তরালে পরলোকধাম হইতে উত্থিত হইতেছিল।

সন্তান মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া সুমিষ্ট স্বরে মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

পরে যবনিকারদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "মা ও বড় সুন্দর জায়গা পৃথিবী এমন সুন্দর নয়। মা দেখ দেখ কেমন সুন্দর।" মাতার চক্ষু অন্ধ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শিশু অমরচক্ষে যাহা দেখিতে পাইতেছে তাহা তিনি পৃথিবীর চক্ষে দেখিতে পাইলেন না।

শিশু পুনরায় বলিল "মা এখন আমি অন্য অমর দেবশিশুদের সঙ্গে মিলিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারি, সেখানে বড় সুখ। মা, তুমি এমন করিয়া কাঁদিও না। তাহলে আমাকে হয়ত আর পাইবে না। মা আমি এখন যাই? আবার তুমিও শীঘ্র আমার কাছে আসিও।"

মাতা আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "আর একটু থাক্ বাছা আর একটু থাক্ আর একবার তোর চাঁদ মুখ দেখিয়া প্রাণ জুড়াই।"

এই বলিয়া মাতা শিশুকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। এমন সময় উপর হইতে কে যেন কাতরস্বরে নারীকে সম্বোধন করিতে লাগিল।

শিশু বলিল "মা তুমি কি শুনিতেছ না ঐ যে, আমার পিতা তোমায় ডাকিতেছেন।"

কিছুক্ষণ পরে বালককণ্ঠের মৃদু রোদনধ্বনি শ্রুত হইল।

শিশু বলিল "মা ঐ আমার ভগিনীরা তোমার জন্য কাঁদিতেছে। মা তুমি উহাদের ভুলিয়া গেলে?"

অকস্মাৎ মাতার মনে যেন আলোক প্রকাশিত হইল। মনে মহাভয়ের সঞ্চার হইল।

চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি দেখিলেন যেন ছায়া তুল্য মূর্ত্তি সকল শূন্য মার্গে অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে বিলীন হইয়া যাইতেছে সভয়ে তাঁহার মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল, তবে কি তাঁহার আর দুই সন্তান এবং স্বামীও কি এইরূপে এখন মৃত্যুচ্ছায়া দিয়া পরলোকের অন্ধকারে মিশিবে? না। ঐ যে উপর হইতে তাহাদের বিলাপ ধ্বনি শুনা যাইতেছে। হায় একটি মৃত সন্তানের জন্য তিনি জীবিতদিগকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

শিশু আবার বলিল "মা ঐ শোন স্বর্গে কেমন বাদ্য বাজিতেছে, মা ঐ দেখ এখন সূর্য্য উদয় হইতেছে।"

এই সময় উজ্জ্বল এবং প্রখর আলোকরাশিতে চারি দিক সমুজ্জ্বল হইল। সন্তান অন্তর্দ্ধান হইল, এবং মাতা ঊর্দ্ধে নীত হইলেন। চারি দিক শীতল বোধ হইতে লাগিল, তিনি তখন মস্তক তুলিয়া দেখিলেন মৃত সন্তানের সমাধিতে শয়ান রহিয়াছেন।

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে জাগ্রত্ অবস্থায় যে দিব্যজ্ঞান তিনি প্রাপ্ত হন নাই, স্বপ্নে সেই আলোক তাঁহার প্রাণে প্রকাশিত হইল, তখন অনুতপ্তচিত্তে

তিনি এই বলিয়া অবনতশিরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি স্বর্গগামী অমরাত্মা শিশুর গতি অবরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং মৃত সন্তানের জন্য জীবিতদিগের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে উদাসীন হইয়াছিলেন। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ের ভার লঘু হইল। পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্য উদিত হইল, ঊর্দ্ধে কলকণ্ঠবিহঙ্গগণ ডাকিয়া উঠিল। ভজনালয়সমূহে সুমিষ্ট ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। চারি দিকে সকলই যেন পবিত্র ভাব। তাঁহার হৃদয় যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি শিক্ষা লাভ করিলেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মুখে মস্তক নত করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং ধীর ভাবে স্নেহ অনুরাগের সহিত সন্তান এবং স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে তোমার মন এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল? এই বল এবং সান্ত্বনা তুমি কোথা হইতে পাইলে? তিনি সন্তানগণকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর স্বয়ং স্বর্গ হইতে এই সান্ত্বনা ও বল আমার সমাধিস্থ শিশু দ্বারা আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

বিবাদ বিরোধ।

পৃথিবীতে অনেক প্রকারের বিবাদ বিসংবাদ অমিল আছে। মনুষ্যসমাজের মধ্যে যেমন এক দিকে স্নেহের সৌন্দর্য্য, প্রণয়ের বন্ধন, বন্ধুতার মিষ্টতা, ভালবাসার গভীরতা, সহানুভূতির আকর্ষণ, আর এক দিকে সেইরূপ বিবাদ অপ্রণয় অমিল হিংসা দ্বেষের অনল সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে—এক দেশের সহিত অপর দেশের, এক জাতির সহিত অপর জাতির, প্রতিবাসীতে প্রতিবাসীতে, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে, এমন কি ভ্রাতা ভ্রাতায় পর্য্যন্ত কলহ বিরোধ চলিতেছে। এই বিবাদ কলহের জন্য পৃথিবীতে কত সংগ্রাম যুদ্ধ বিগ্রহ হইতেছে। এই প্রকারের প্রকাশ্যভাবে বিবাদ দুই-জাতির রাজ্যবৃদ্ধি বা অন্য কোন কারণে সংঘটিত হয়। নানারূপে মানুষ বৈর ভাব চরিতার্থ করে। এক ভাবের এক মতের লোক প্রায় দেখা যায় না। সকল বিষয়েই মিল আছে এমন দুজন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু মতের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই যে বিবাদ বিরোধ করিতে হইবে এমন নহে। আমাদের দেশে এখনকার সভ্য-সমাজে একপ্রকারের বিবাদ চলে তাহার প্রণালী বিচিত্র প্রকারের। বাহিরে মুখে আলাপ পরিচয় সভ্যতা ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার কিন্তু অন্তরে অন্তরে পরস্পরের প্রতি বিষদৃষ্টি। একের অমঙ্গল শুনিলে অপরের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে, একের উন্নতিতে অপরের বিষম ক্লেশ হয়। এক জনের মানহানি বলহানি হইলে অপরের হর্ষোদয় হয়, একের নিন্দা প্রচার হইলে অন্যের আনন্দ হয়। যাহার সহিত আন্তরিক বিবাদ তাহার উপর এমন সংস্কার জন্মিয়া যায় যে তাহার ভিতর যা কিছু সদ্ভাব ও গুণ থাকে তাহাও আর স্বীকার করিবার ক্ষমতা থাকে না। সে ভাল ব্যবহার করিলেও মনে হয়, উহার ভিতর কিছু মন্দ অভিপ্রায় গোপন আছে। সে ভাল কার্য্য করিলে মনে হয় লোকের প্রশংসা পাইবার জন্য করিতেছে, কিংবা নিজের কোন ইষ্ট সাধনের জন্য তদ্রূপ করিতেছে। সে উপকার করিতে আসিলে বিরক্তি জন্মে, করিলেও তাহার সকল কার্য্যের উপরই সন্দেহ অবিশ্বাস হয়। পাঁচ জনের নিকটে সে অপ্রতিভ হইলে মনে সন্তোষ জন্মে। যখন মানুষ বিবাদের অপ্রণয়ের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়, তখন সকল বিষয়ে পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, পরস্পরের আর কিছুই ভাল লাগে না। যেমন প্রিয় জনের দোষকে দোষ বলিয়া মনে হয় না, তেমনি অপ্রিয় জনের গুণকেও গুণ বলিয়া বোধ হয় না। এই বিবাদ বিরোধ অনেকের সর্ব্বনাশ করে। ইহাতে দেশের অমঙ্গল, জাতির অমঙ্গল, পরিবারের ভিতর অমঙ্গল আনিয়া দেয়। ভ্রাতাকে ভ্রাতার শত্রু করিয়া দেয়, স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। পিতা পুত্রকে পরস্পরের নিকট পর করিয়া দেয়। এই অমিল বিবাদের তিক্ততা অতিভয়ানক। বড় বড় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এই বিবাদের জন্য চূর্ণ বিচূর্ণ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। বিবাদ বিরোধ কি কিছুতেই দূর হয় না? কবে মানুষ মতের অনৈক্যসত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি বিবাদ বৈরভাব ত্যাগ করিতে শিখিবে। কবে মানুষের চিত্ত এমন উদার, এমন মহৎ হইবে যে, সমান চক্ষে বন্ধু শত্রুর দোষ গুণ বিচার করিতে সক্ষম হইবে? কবে আমাদের হৃদয় এমন প্রশস্ত হইবে যে, মতের বৈষম্যসত্ত্বেও নীচ সঙ্কীর্ণ বিদ্বেষ বৈরভাব মনে আসিবে না। মতের অমিল চিরদিন মনুষ্যে মনুষ্যে হইয়া আসিতেছে হইবেই। কিন্তু তাহা কেন পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি নিরপেক্ষ ভাব রক্ষা করিতে দিবে না; কেন পরস্পরের অমঙ্গল কামনা বর্দ্ধিত করিবে? বিবাদ বিরোধ অনেক অমঙ্গলের মূল, অনেক অশান্তির কারণ। ভগবান্ আমাদিগকে বিবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

চিতোর।

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"
(রূপ গোস্বামী)

ভারতবর্ষের ইতিহাসমধ্যে চিতোর একটি প্রধান ঘটনাস্থল, সেই জন্য আমরা পাঠিকাদিগকে চিতোরের বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে কিছু জানাইতে ইচ্ছা

করি। এক সময় যে নগর পৃথিবীর নিকট আপনার মান মর্য্যাদা ও ধনগৌরবের উচ্চাসন লাভ করিয়া অপরাপর দেশবাসী বীরগণের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল, ভারতের পরশ্রীকাতর রাজাদিগের বিদ্বেষ ও চিতোরের রাণাদিগের আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি পাপে সেই শ্রীসমৃদ্ধিশালী নগরীর আজ এই দুরবস্থা! ইহা পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, পৃথিবী কোন অহঙ্কারীকে অধিক দিন আপন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন না। নিমচ নসিরাবাদ রেলওয়ে ছাড়িয়া অনুমান অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে গমন করিলেই চিতোরনগরে উপনীত হইতে পারা যায়। রেল হইতে নামিয়া পথের মধ্যে গম্ভীরা নামক নদীর উপর দশ ফুকর-বিশিষ্ট একটি বৃহৎ পোল পার হইতে হয়, এই পোলটি দেখিতে অতি সুন্দর। শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত ফোকর গুলির নয়টি ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া উপরে গিয়া মিলিত হইয়াছে, মধ্যের একটি অর্দ্ধ গোলাকৃতি খিলান নির্ম্মিত থাকায় পোলটি বহু শতাব্দী মানবচক্ষে সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া আসিতেছে। পোলের দুই দিকে দুইটি বৃহৎ ফটক ছিল, কালস্রোতে ভূপতিত হইয়াছে। এই পোলটি নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রবাদবাক্য শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পুত্র কুমার অরি সিংহের যত্নেই যে ইহা প্রস্তুত তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাঁরা পিতাপুত্রে ১২৯০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। আলাউদ্দীনের পুত্র ক্ষেজ্র খাঁ পিতার প্রত্যাগমনের পর কিছু কাল চিতোর শাসন করিয়াছিলেন, তিনি চিতোরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষেজ্রাবাদ রাখেন। এই সুন্দর পোলটিও তাঁহাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকে।

এক্ষণে পর্ব্বততলে প্রাচীর বেষ্টিত যে সহরটি চিতোর বলিয়া পরিচিত তাহা পূর্ব্ব চিতোরের সহরতলির একটি অংশ মাত্র। এখান হইতে চিতোরের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য ক্রমে উপরে উঠিতে হয়। এই সহরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উপরে উঠিলে পুরাতন কীর্ত্তি গুলি ক্রমে ক্রমে নয়নগোচর হইতে থাকে। পথটি আঁকাবাঁকা রকমে উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি সুন্দর ফটক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ফটকগুলিকে এ প্রদেশে পোল বলিয়া থাকে। সাতটি ফটকের নাম স্বতন্ত্র যথা,—প্রথমটির নাম পত্তন পোল, তাহা হইতে কিয়ৎদূর উপরে উঠিলেই ভৈরব পোলে আসিতে হয়, এইটি পড়িয়া গিয়াছে কেবল নিম্নের খানিকটা অবশিষ্ট আছে বলিয়া ইহাকে ফুটা পোলও বলে। এখান হইতে একটি বাঁক ফিরিয়া কতক দূর গেলেই আর একটি ফটকে উপস্থিত হইতে হয় তাহার নাম হনূমান্ পোল,

এইরূপে ক্রমে গণেশ পোল, জরলা পোল, লক্ষ্মণ পোল এবং সর্ব্বশেষে রাম পোল পার হইয়া পুরাতন সহরে প্রবেশ করিতে হয়। এই পথের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড জীর্ণ কামান পড়িয়া রহিয়াছে। চিতোরে অনেক ছোট বড় কামান ছিল, ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন পণ্ডিতবর টড সাহেব প্রথমবার চিতোর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি এক স্থানে স্তূপাকৃতি অনেক কামানের রাশি একত্র দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে,মুসলমানেরা শেষ বারে চিতোর লুণ্ঠন করিয়া এই স্থানে দ্রব্যাদি একত্র করিয়াছিল, অন্যান্য দ্রব্য লইয়া গিয়াছে এই কামানগুলি অসুবিধাবশতঃ লইয়া যাইতে না পারিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে স্থানে আর সে কামানগুলি নাই। বোধ হয় ইংরাজ বাহাদুর অযত্নপরিত্যক্ত প্রয়োজনীয় বস্তু গুলি আনাইয়া কার্য্যে লাগাইয়াছেন। আর এক স্থানে একটি ১৪ ফুট লম্বা ৭ ইঞ্চি ছিদ্রবিশিষ্ট পিত্তলের কামান রহিয়াছে এবং তথাকার অধিবাসীদিগের মুখে শুনা যায়,ঐরূপ অনেক গুলি কামান নিকটস্থ গভীর কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দুর্গের শেষ প্রাচীরের উপর একটি সুপ্রশস্ত স্তম্ভমালা শোভিত দালান রহিয়াছে ইহার নাম দ্বারিখানা। এটি রক্ষীদিগের থাকিবার স্থান বলিয়াই বোধ হয়। এই দালানের উপর দুই পার্শ্বে দুইটী নহবৎখানা আছে। তথা হইতে নিম্নভূমির শোভা অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। এই ফটকটিও অতি সুন্দর। উপর দিকে নানাপ্রকার চিত্র ও লেখায় খোদিত, ভিতরে উভয় পার্শ্বে চাপা ধরণের চতুষ্কোণ স্তম্ভোপরি এক একটি দালান আজও বর্ত্তমান আছে, ইহাও যে রক্ষকদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। ফটক পার হইয়াই বামদিকে একটি নূতন প্রশস্ত পথ উত্তর মুখে গিয়াছে এবং আর একটি ঠিক সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বমুখে পর্ব্বতের উপরে উঠিয়াছে, এইটি পুরাতন পথ, কিছু দূরে গিয়াই তিনটি সরু সরু ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন দিকে গমন করিয়াছে। এইখানে পাট্টাসিং নামক এক জনের একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। পুরাতন পথের দক্ষিণের শাখাটী ধরিয়া অগ্রসর হইলে কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্রাকার পুরাতন হিন্দুমন্দির পাওয়া যায় তাহা ছাড়িয়া আর কিছু দূর গমন করিলেই সম্মুখে একটি প্রাচীন জৈনস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা যেমন উচ্চ তেমনি সুগঠিত সুদৃঢ় এবং সুন্দর, নানাপ্রকার সুন্দর চিত্রে চিত্রিত, দেখিলেই মানব হৃদয়ের উচ্চতা ও অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ইহার নাম "ছোটা কীর্ত্তম।" কীর্ত্তম, কীর্ত্তিস্তম্ভ শব্দের অপভ্রংশ। এই স্তম্ভটি ১৩০০ খৃষ্টাব্দে রাজা উলুজির দ্বারা নির্ম্মিত। এ স্তম্ভটি কিন্তু আর অধিক

দিন থাকিবে না, কারণ ইহা সরল ভাব পরিত্যাগ করিয়া এমন ভাবে বক্র হইয়াছে যে, আজও কি করিয়া দণ্ডায়মান আছে তাহা বুঝা যায় না। কিছু দূরে আর একটি স্তম্ভ আছে তাহার উচ্চতা, গঠন প্রণালী এবং চিত্রকার্য্য এত সুন্দর যে তাহার উপর হইতে নয়ন মনকে ফিরাইয়া আনা মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া পড়ে। এটি সুপ্রসিদ্ধ রাণা কুম্ভের নির্ম্মিত। তিনি ১৪১৮ হইতে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং ২১ বৎসর রাজত্ব কালে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে মালব দেশে মামুদ নামক পরাক্রান্ত মুসলমান সেনাপতিকে জয় করিয়া চিতোরে এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া নিজ বীরত্বের পরিচয় জাজ্জ্বল্যমান রাখিয়াছেন। সেই জন্য এটির নাম "জয়স্তম্ভ।" ইহা ১২২ ফুট উচ্চ, নিম্নভাগের প্রশস্ততা প্রায় ৩৫ ফুট, নয়টী তলায় বিভক্ত, উপর পর্য্যন্ত সুন্দর সোপানাবলী ভগ্নাবস্থায়ও সকলকে বহন করিয়া স্তম্ভের উচ্চতা দেখাইতেছে। প্রতিতলার বহির্ভাগ ছোট বড় কার্ণিশ দ্বারা শোভিত, তাহার উপর চারিদিকে চারিটী জানালা, জানালার বহির্ভাগে প্রস্তরের বারাণ্ডা, তাহার চারি কোণে চারিটি স্তম্ভ, তাহার উপর কাশ্মীরী ধরণের আচ্ছাদন। স্তম্ভের সর্ব্বোপরি প্রকোষ্ঠটি চারি দিকে কারুকার্য্য-বিশিষ্ট স্তম্ভোপরি একটী অতি পরিষ্কার কারুকার্য্য বিশিষ্ট গম্বুজ, তাহার বাহিরে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাকৃতি স্তম্ভের উপর পরিবেষ্টিত ঢালুবারাণ্ডা। আমরা এবার বাহুল্যভয়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দিলাম না, বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। যাঁহারা কলিকাতা ইত্যাদিতে জৈনদিগের সমারোহ যাত্রা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা তন্মধ্যে সুসজ্জিত একটি ছোট এবং একটি বড় ঐরূপ প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট স্তম্ভ দেখিয়া থাকিবেন, সে গুলি এই দুইটি স্তম্ভেরই অনুরূপ। পুরাতন স্তম্ভটি দেখিতে নূতনটির অনুরূপ কিন্তু উহাকে জৈনস্তম্ভ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, কারণ ইহার ভিতর হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটী দেবতার মূর্ত্তি ও তন্নিম্নে প্রাচীন নাগরী অক্ষরে তাঁহাদিগের নামও খোদিত রহিয়াছে। চূড়ার উপর হইতে পর্ব্বতের এবং নিম্নতলের অতি সুন্দর ছবি দৃষ্টিগোচর হয়।

স্তম্ভের নিকট হইতে কিছু দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিলে কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে মহাসতী এবং গোমুখী অভিমুখে যাওয়া যায়। এই মহাসতী নামক স্থানে অতি পূর্ব্বকালে রাণাদিগের মৃত দেহ দাহ করা হইত, কিন্তু প্রাচীনকালের কোন স্থায়ী কীর্ত্তি এখানে নাই, যে কতকগুলি প্রস্তরছত্রী এখন দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলি নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। মহাসতী নামক স্থানের নিম্নে কয়েকটি ঝরণা নির্গত হইয়া একত্র হইয়াছে, এই একত্রীকৃত জলভাগ একটি খোদিত গোমুখ হইতে

নিঃসৃত হওয়ায় ইহাকে গোমুখী বলিয়া থাকে। বাস্তবিক এই জল কিয়ৎদূর উপরিস্থিত হাতিকুণ্ড নামক একটি কুণ্ড হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া স্তম্ভবিশিষ্ট একটি দালানে পতিত হয়, তথা হইতে আর একটি গ্রথিত কুণ্ডে আসিয়া পড়ে, এই কুণ্ড উচ্ছলিত হইয়া যে জল পর্ব্বতের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে তাহাই প্রস্তর ছিদ্র পথে বাহির হইয়া গোমুখী হইয়াছে। এই গোমুখীর নিকট হইতে একটি সুড়ঙ্গপথ রাণাদিগের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথ দিয়া রজপুৎমহিলারা গোমুখী স্নান করিতে আসিতেন এবং যখন আলাউদ্দীন চিতোর জয় করেন, তখন চিতোরসতী সকল এই পথে আসিয়া মহাসতী নামক স্থানে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে ভারতের সতীধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তদবধি ইহার মুখ একেবারে বন্ধ রহিয়াছে। এই সুড়ঙ্গকে "রাণী বিন্দর" কহে।

রাম পোল ভিন্ন দুর্গে প্রবেশ করিবার আর দুইটি পথ আছে, তন্মধ্যে একটির নাম সূর্য্য পোল, অপরটির নাম লক্ষ্যদ্বার। এই লক্ষ্যদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দক্ষিণেই একটি প্রশস্ত সমতলভূমি দেখিতে পাওয়া যায় উহাই প্রাচীন ব্যায়ামভূমি। ইহার কিয়দ্দূর পরেই কএকটি সরোবর, তাহার মধ্যে একটির মধ্যস্থলে একটি দ্বীপের উপর আদর্শসতী রাণী পদ্মিনীর সুরম্য প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। এই স্থান হইতে পশ্চিমমুখে পর্ব্বতের উপরে উঠিলে রামপুরের মহারাণার প্রাচীন প্রাসাদে উপনীত হওয়া যায়। তাহার পার্শ্ব দিয়া যে পথ চলিয়া গিয়াছে, সে পথে পর্ব্বতের উপর উঠিলে কালীকা মাতার মন্দির গম্ভীরভাবে মানবহৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। কত শত যুদ্ধবন্দী প্রভৃতি নর যে পূর্ব্বকালে এই মন্দিরে ছেদিত হইয়াছে, তাহা কে সংখ্যা করিয়া বলিবে! এই মন্দির অতি প্রাচীন, অন্ততঃ সহস্র বৎসরেরও পুরাতন, সময়ে সময়ে রীতিমত মেরামত হওয়ায় অদ্যাবধি কোন অংশ পতিত হয় নাই। ইহা হইতে উপরে উঠিলে, পাট্টাসিং ও জয়মল্লের ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপে পথ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুর্গের প্রাচীর ও অস্ত্রাগারের মধ্যে "শিংগার চৌরী" নামক একটি মন্দির আছে তাহার গঠন প্রণালীও সামান্য নহে। ইহার উপরিভাগ গোলাকৃতি, সম্মুখে কয়েকটি বৃহৎ ছড়কাটা স্তম্ভ, তাহা মানব মূর্ত্তি ইত্যাদি নানাবিধ খোদিত কারুকার্য্যে শোভিত। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা পরে বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুরাতন রাস্তা এক স্থানে আসিয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ পথের কথা কিছু বলা হইয়াছে, এখন উত্তর শাখার কথা বলি। যে পথটি উত্তর মুখে গিয়াছে, কিছু দূর গমন করিলেই সম্মুখে একটি সুন্দর

সরোবর দেখা যায়, তাহার নাম রত্নেশ্বর সরোবর। ইহার দক্ষিণ দিকে রত্ন সিংহের রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি। যে পথটি এখন অত্যন্ত সরু এবং সামান্য বলিয়া মনে হয়, সেটি পূর্ব্বমুখে বা সম্মুখে পাহাড়ের উপর উঠিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে পুরাতন সহর ইহারই উভয় পার্শ্বে ছিল। এই পথে কিয়দ্দূর উঠিলে রাজা কুক্রেশ্বরের স্থাপিত কুক্রেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা ইং ৭৫৫ খৃঃ সম্বৎ ৮১১ সালের ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন একটী মাতাজী ও অতি পুরাতন অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নপূর্ণার বর্ত্তমান মন্দিরটি ১৪শ খ্রীষ্টাব্দে রাণা হামীরসিং কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কিন্তু দেবী বহু শতাব্দী এই স্থানে বাস করিতেছেন এবং কাহার সুবাদে যে আসিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারেন না। ইহা ভিন্ন "বনমাতা" নামে আর একটী দেবীর ক্ষুদ্র মন্দিরও এখানে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিকটে হামীর সিংহের প্রপৌত্র দেবত্ব প্রাপ্ত রঘুদেবের একটি ছত্রী রহিয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইলে পর্ব্বতের দেহ খোদিত করিয়া একটি অতি সুন্দর বহুপ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট প্রশস্ত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, এটি ব্রহ্মার মন্দির, মন্দিরের নিম্ন ভূমে কোন দেবমূর্ত্তি নাই, ভিতরের প্রাচীরের গাত্রে একটি প্রকাণ্ড মুখ এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি অর্দ্ধ মুখ খোদিত। আধুনিক লোকের ইহার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মন্দির নির্ম্মাতা রাণা কুম্ভের পিতা মুকুলজীর মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা কি জানেন না যে ব্রহ্মার চারি মুখ? এবং এই মন্দির গাত্রে তাঁহারই অর্দ্ধ মূর্ত্তি মাত্র দেখান হইয়াছে। আমরা অনেক প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে ঈদৃশ অর্দ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছি।

উপরোক্ত ব্রহ্মার মন্দিরসম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। ব্রহ্মার মন্দির ছাড়িয়া কিছু উত্তরে অগ্রসর হইলে একটি প্রাচী বেষ্টিত স্থানে যাইবার জন্য একটি অর্দ্ধনির্ম্মিত ফটক দেখিতে পাওয়া যায়, এ দ্বারটির নাম মহাসতীদ্বার এবং প্রাচীর বেষ্টিত স্থানটিও মহাসতী নামেই বিখ্যাত। এই প্রাচীর রাণাদিগের আবাসবাটী এবং মহাসতী স্থানের মধ্যে ব্যবধানরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা ছাড়িয়া আরও উত্তরে গমন করিলে পর্ব্বতের প্রান্তে একটি বৃহৎমন্দির খোদিত রহিয়াছে, ইহার মধ্যে "জাত শংকর" নামক মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। এই মন্দিরের ছাদের উপর হইতে নিম্ন ভূমি ও পশ্চিমের প্রান্তর সকল অতি পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। যে পথটি অবলম্বন করিয়া এই মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়, উহা একটি শাখাবর্ত্ম, ঐ শাখাটি আর কিছু দূর গিয়া মূল পথে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছে। সেই মিলনস্থলে আর একটি বৃহৎ মন্দির দণ্ডায়মান, এটি মহাবীর রাণাকুম্ভ বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে "কুম্ভ শ্যাম" নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার অতিনিকটেই রাণা কুম্ভের পৌত্র বধূ রাণা সঙ্গের পুত্র কুমার ভোজরাজের সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণা বৈষ্ণবী পত্নী মাননীয়া মীরাবায়ের শ্যামনাথ নামক বিষ্ণুর মন্দির অদ্যাবধি দণ্ডায়মান আছে। উপরোক্ত দুইটি মন্দিরই কতকগুলি পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। চিতোরের তিন ক্রোশ উত্তরে নাগর নামক পুরাতন নগর হইতে ঐ সমস্ত আনীত হয়। কিছু দূর পরেই কতকগুলি জৈনমন্দির পর্ব্বতগাত্রে কারুকার্য্য সহ খোদিত আছে, ইহার নাম সাতাইশ দেউড়ী, ২৭টি মন্দির একত্র খোদিত রহিয়াছে। আরও উত্তরে অগ্রসর হইলে বড় পোল, ত্রিপোল, এবং আরও একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, স্তূপ গুলি ও তাহার ভগ্ন কারুকার্য্য ও প্রস্তরের উপর নানা প্রাকার স্ফাটিকবৎ চিত্রাদি দেখিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় এগুলি অতি প্রাচীন কালের কোন রাজার বিলাসভবন ছিল।

আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে "নও কোট" নামক একটি স্থূলাকৃতি স্তম্ভ-

পরিবেষ্টিত খিলানের ছাতওয়ালা মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়, ইহা একটি অস্ত্রালয় ছিল। এই মন্দিরের পশ্চিমে একটি অতি উচ্চ প্রাচীর আছে, তাহার পশ্চিমে একটি গোলাকৃতি প্রস্তরের উপর পর্ব্বত খোদিত প্রকোষ্ঠ আছে তাহাকে "নয় লক্ষ বন্দর" অর্থাৎ নয়লক্ষ টাকার ধনাগার বলা হয়। ইহার পরেই আর একটি বিষ্ণুমন্দির এবং তাহার নিকট দুইটি বক্রাকৃতি স্তম্ভ থাকায়, কথিত আছে ঐ স্তম্ভে তুলা যন্ত্র স্থাপন করিয়া রাজারা আপনাদিগের দেহ পরিমাণে সুবর্ণ ওজন করিয়া মন্দিরে অর্পণ করিতেন, কিন্তু আমাদের বোধ হয় ও দুইটি দোলমঞ্চের স্তম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের দোল বা ঝুলান যাত্রার সময় ঐ বক্র স্তম্ভে সিংহাসন বসাইয়া দেওয়া হইত। আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে কতকগুলি ভগ্ন স্তূপের পরে বনবীরের প্রতিষ্ঠিত "তুলজা ভবানী" দেবীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই বনবীর রাজা উদয় সিংহের বাল্যকালের রক্ষক ছিলেন। (ক্রমশঃ)

রন্ধন শিক্ষা।

আজ কাল এ দেশে যে প্রকার স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোক ও পুরুষের জীবনসম্বন্ধে যে কোন প্রভেদ আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইতেছে না। দূষিত স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী দ্বারা স্ত্রীলোককে পুরুষ

করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদিগের পাঠিকাগণ সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদিগের আচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে যে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র প্রকার। যাহাতে স্ত্রীলোকের সুকোমল স্বভাবের বিকাশ হয় এবং যাহাতে তাঁহারা গৃহের গৃহিণী হইয়া উচ্চ উচ্চ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত গৃহকার্য্য প্রভৃতি স্ত্রীলোকের বিশেষ উপযোগী বিষয় সকল শিখিতে পারেন, এই বিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। রন্ধনশিক্ষার জন্য এখানে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। তথায় কেবল মুখে শিক্ষা দান না করিয়া শিক্ষিকা ছাত্রীদিগের দ্বারা রন্ধন করাইয়া রন্ধন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। তত্রস্থ ছাত্রীদিগের রচিত দুই খানি লেখা সংশোধিত হইয়া নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

[ছোলার ডালের ভুনিখিচুড়ি]।

প্রথমে ডাল ও চাল উত্তমরূপে ঝাড়িয়া ও বাছিয়া লইতে হয়। ডাল জলে ভিজাইতে ও চালে ঘৃত মাখাইতে হয়। পরে হাঁড়ি জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয়। ঘৃত পক্ক হইলে, তাহাতে লবঙ্গ, ছোট এলাচি ও তেজপত্র ফোড়ন দিয়া উক্ত চাউল ও ডাল একত্র করিয়া অল্প ভাজা ভাজা করিয়া লইতে হয়। তাহার পর তাহাতে পরিমাণমত লঙ্কার গুঁড়া জিরেমরিচের গুঁড়া ও হরিদ্রার গুঁড়া দিয়া একটু নাড়িয়া লইতে হয়, তৎপর উপযুক্ত জল দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে ফুটিয়া উঠিলে উহাতে পরিমাণ মত কিস্‌মিস্, পেস্তা, নারিকেল-কুচি, বাদাম ও আদার কুচি ও ভাজা আলু ও চিনি দিয়া পুনরায় হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে যখন তাহা ফুটিয়া উঠে তখন তাহাতে উপযুক্তমত লবণ ও ধনের গুঁড়া দিয়া আবার হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিতে হয়, যখন জল মরিয়া আসিবে তখন তাহাতে গরম মসলা দিয়া একটু নাড়িয়া নামাইতে হয়।

[নিরামিশ আলুর চপ]।

প্রথম আলুগুলি ভাল করিয়া ছাড়াইয়া হাঁড়ি জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়, যখন আলু সুসিদ্ধ হইবে তখন তাহা নামাইয়া লইতে হয়। ঐ আলু চট্‌কাইয়া তাহাতে হলুদ বাটা, আদা বাটা, গোল মরিচের গুঁড়া, লঙ্কার গুঁড়া ও লবণ পরিমাণ অনুসারে দিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইতে হয়। তৎপরে ছানা ডুম ডুম করিয়া কাটিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিয়া তাহার বাদামী ধরণের রং করিয়া লইতে হয়। পরে সেই হাঁড়িতে পেস্তা ও বাদাম আদ্‌ বাটা করিয়া ও চিনি গরমমসলার গুঁড়া, গোল মরিচের গুঁড়া ও লবণ ঐ ছানা ভাজার সহিত মিশাইয়া একত্র নাড়িয়া লইতে হয়। এই মিশ্রিত পদার্থটিকে বলে চপের পুর। তৎপরে উক্ত চট্‌কান আলুর ঠুলি করিয়া তাহার ভিতর ঐ পুর দিয়া ঠুলির মুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে ঈষৎ চেপটা ধরণের গোলাকারে প্রস্তুত করিয়া তাহার গায়ে সবেদা অথবা ময়দা মাখাইয়া তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, তাহার রং বাদামের মত হইবে। এই ভাজা দ্রব্য আলুর চপ হইবে।

পিতা মাতার প্রতি উক্তি।

স্মরণ রাখিও যে সন্তানগণের অজ্ঞাতসারে এবং মতামত না লইয়া তোমরা তাহাদিগকে এ পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছ। অতএব তাহাদিগকে ক্লেশ দিয়া তাহাদের জীবনকে তিক্ত করিয়া দিতে তোমাদের কোন অধিকার নাই। এমন পিতা মাতা দেখা যায় যাঁহারা অনবরত সন্তানদিগকে খাটাইতে ভালবাসেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ছেলেদের কখনও শ্রান্তি হয় না, ক্রীত দাসের ন্যায় যেন তাঁহারা সন্তানগণের প্রতি ব্যবহার করেন। সন্তানগণকে ঠাট্টা বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করিও না।

মনে রাখিও যে সন্তানগণের জন্য আমোদ এবং বিশ্রাম প্রয়োজন। কারণ তাহাদের যে কেবল দেহ আছে তাহা নহে, তাহাদেরও মন এবং হৃদয় আছে। অনেক পিতা মাতা সন্তানগণের স্বাভাবিক বিশ্রাম এবং আমোদের প্রবৃত্তি আছে, ইহা ভুলিয়া যান এবং তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকেন। স্মরণ রাখিও যে বাল্যকালে নির্দ্দোষ এবং উপকারী আমোদে বাধা দিলে তাহারা হয়ত বয়োবৃদ্ধি হইলে মন্দ এবং অনিষ্টকর আমোদে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

মনে রাখিও তোমাদের সন্তানেরা জীবন আরম্ভমাত্র করিতেছে, কিন্তু তোমরা জীবন শেষ করিতে চলিলে। উপদেশ দিতে চাও দাও, কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করিও না যে নিজেরা যে অবস্থায় পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ সেই রূপ অবস্থায় না পড়িয়াও সন্তানগণ তদ্রূপ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবে।

তোমাদের চক্ষু লইয়া তাহারা সংসারের সকল বিষয় দেখিবে তাহা আশা করিও না।

বলপূর্ব্বক সন্তানদিগের নিকট হইতে মান ও সম্ভ্রম লইতে চেষ্টা করিও না। যাহারা সম্মান চাহে তাহারা তাহা পায় না, কিন্তু যাহারা সম্মান লাভের উপযুক্ত তাহারাই তাহা লাভ করে।

সন্তানদিগের বন্ধু এবং সমবয়স্ক সঙ্গিদিগকে তুচ্ছ করিও না। তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বাটিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আদর যত্ন দেখাইও। যদি সন্তানেরা তোমা অপেক্ষা অন্যের সঙ্গ অধিক ভালবাসে ঈর্ষাপরবশ হইও না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে আপনাদের দোষেই এরূপ

হইয়াছে। জানিও তোমাদের নিকট সহানুভূতি সৌহার্দ্দ না পাইয়াই তাহারা অন্যত্র তাহা অন্বেষণ করে। তোমরা আপনাদিগের সঙ্গ সন্তানদিগের নিকট এমন কর যে তোমাদের কাছে থাকিতেই তাহাদের সকল অপেক্ষা অধিক ভাল লাগিবে।

সন্তানদিগের নিকট ভালবাসা দেখাইতে লজ্জাবোধ করিও না। তাহাদিগকে বুঝিতে দাও যে তাহারা যেখানেই থাকুক যাহাই করুক পিতামাতার গভীর স্নেহ এবং বিশ্বাস সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে আছে। যে সন্তান জানে যে নিন্দ অপমান শত্রুতার ভিতর পিতামাতার ভালবাসা কখনও তাহাকে ত্যাগ করিবে না, সে সন্তান কখনও প্রায় বিপথগামী হয় না, এবং ঐ স্নেহ বিশ্বাসে অন্ধকারে আলোকের তুল্য বিপদ প্রলোভনের মধ্যে তাহাকে বলও সান্ত্বনা দান করে।

তোমাদের সন্তানেরা যদি অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, মনে রাখিও যে স্বর্গস্থ পিতার নিকট তোমরাও সেইরূপ স্নেহ অপরাধে অপরাধী। এই জ্ঞান যেন তোমাদিগকে অবাধ্য অপরাধী সন্তানদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম করে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবার ক্ষমতা দান করে।

বৃষ্টি।

সে দিন বৃষ্টি দেখিতেছিলাম—আকাশ বেশ পরিষ্কার, রৌদ্রের ভারি তেজ, ভূমিতল কঠিন শুষ্ক। সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে জীবগণ শুষ্ককণ্ঠ। এত ক্ষণ সুনীল আকাশ মেঘশূন্য ছিল। কিন্তু ক্রমে কোথা হইতে মেঘের ঘন আবরণ অল্পে অল্পে আকাশ এবং সূর্য্যের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। মেঘের আড়াল হইতেও সূর্য্যের আভা ঝিকিমিকি করিতে লাগিল, কিন্তু কৈ কিছুক্ষণ পরে তাহাও আর রহিল না। রৌদ্র অদৃশ্য হইল. মেঘে চারিদিক ঢাকিল, অবশেষে বৃষ্টি নামিল। প্রথমে বড় বড় দুই চারি ফোঁটা দূরে দূরে পড়িতে লাগিল. পরে তাহাদের গতি দ্রুত হইল দূরতা চলিয়া গেল, ঘন ঘন নিকটে নিকটে অবশেষে মহাবেগে ঝম্ ঝম্ করিয়া ভূমিতলে বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল বৃক্ষ সকল সে জলে স্নাত হইয়া সুস্নিগ্ধ শ্যামল শোভা প্রকাশ করিল। শুষ্কতৃণপূর্ণ প্রান্তর উদ্যান সরস হইল। উত্তপ্ত ধরা সুশীতল হইল উদ্ভিদ রাজ্য যেন নবজীবন নবশ্রী নূতন শোভ পাইল। শুষ্ককণ্ঠ জীবগণ শীতল হইল বৃষ্টির এমনি ক্ষমতা।

এই বৃষ্টি কেন হয়, কিরূপে হয়?

আমরা শুনিয়াছি দিবসে জল স্থলে যে উত্তাপ পায় রজনীতে সেই উত্তাপের অধিকাংশ পুনরায় বাষ্পের আকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত ও বিকীর্ণ হইয়া থাকে। লবণাক্ত সমুদ্র হইতে তত বাষ্প বিকীর্ণ হইতে পারে না, হ্রদ ও নদী মুখহইতে যত বাষ্প নির্গত হয়। যত অধিক উত্তাপ বাষ্পের উৎপত্তি তত অধিক; স্থল অপেক্ষা জল হইতে অধিক পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এ সকল লঘুবাষ্পরাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত ও ঘন হইয়া অবশেষে নানা বর্ণ নানা আকর ধারণ করে এবং মেঘরূপে আকাশমার্গে ভাসিয়া বেড়ায়, পরিশেষে কোন দিক হইতে শীতল বায়ুপ্রবাহ আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলে মেঘবৎ সেই ঘনীভূত বাষ্পীয় পদার্থ দ্রবীও জল হইয়া ধরাতলে পতিত হয়। যে দেশে শীত অধিক সে দেশ অপেক্ষা উষ্ণ দেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। কারণ যত অধিক উত্তাপ জল এবং স্থল লাভ করে তত অধিক বাষ্প রাত্রিকালে বিকীর্ণ হইয়া উপরে উত্থিত হইয়া এক মেঘে পরিণত হয়। পর্ব্বত এবং উচ্চ ভূমি অপেক্ষা সমতল এবং নিম্ন ভূমিতে অধিক পরিমাণে বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানেও বৃষ্টি অধিক হয়, কারণ নিকটবর্ত্তী জলরাশি হইতে বাষ্পীয় বস্তু অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হয়। বায়ুপ্রবাহের দ্বারাই শীতল, এবং উষ্ণ বাষ্প মিলিত হইয়া থাকে; এজন্য যেখানে বায়ুস্রোতের গতি যত পরিবর্ত্তনশীল এবং অস্থির সেখানে তত অধিক বৃষ্টি হইতে দেখা যায়। বৃষ্টি ধারা উপর হইতে নীচে নামিতে নামিতে যদি শীতলতর বায়ু প্রবাহ আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করে তখন তাহা কঠিন হইয়া জমিয়া যায় এবং শিলা রূপে ধরাতলে পতিত হয়। পৃথিবী হইতে বিকীর্ণ বাষ্প রাশিই কখন ও শিশির কখন ও কুয়াসা কখন তুষার কখন শিলার আকারে পরিণত এবং প্রয়োজনানুসারে পৃথিবীর উপকারের জন্য অবতীর্ণ হয় ও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

স্ত্রীজাতির সময়বোধ।

স্ত্রীলোকের সচরাচর একটি বিশেষ অভাব দেখা যায় তাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতিগত কি শিক্ষাধীন তাহা ঠিক বলা যায় না। সকল দেশেই স্ত্রীলোকের সময় বোধ অল্প। যদি বেলা একটার সময় কোন নারীর কোন সভায় যাইবার কথা থাকে, বেলা সাড়ে তিনটার সময় তাঁহার তাহা হইয়া উঠা কঠিন। স্ত্রীলোকদের মধ্যাহ্নের নিমন্ত্রণ খাওয়া প্রায় অপরাহ্ণ ৫টার সময়ই হইয়া থাকে। গৃহস্থ যথাসময় নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগকে আনিবার জন্য পালকী পাঠাইলেন, হয় তো বেলা ১২টার সময় গাড়ী বা পালকী তাঁহাদিগকে আনিতে গেল তাঁহাদের আর সময় হয় না। বেশ ভূষা করিতে অলঙ্কার পরিতে, সন্তানকে সাজাইতে, রাত্রিতে ঘর কন্নার যে সকল কাজ করা প্রয়োজন তাহা করিয়া

রাখিতে এবং বৃথা একবার এদিক একবার ওদিক্, একবার উপর একবার নীচে করিতে তাঁহাদের হয়তো বেলা ২॥০টা বাজিয়া যায়। এ দিকে উড়ে বেয়ারার অথবা গাড়য়ানের চীৎকারে পাড়ার লোক কাণ পাতিতে পারে না। অবশেষে হয় তো অপেক্ষা করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া সে ডাকিয়া ডাকিয়া সে বাড়ী হইতে পালকী অথবা গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যায়, তথাপি ম ঠ কুরাণীদের মধ্যাহ্ন নিমন্ত্রণে যাইবার সময় হয় না। তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিলেই কি তাঁহাদের একেবারে যাত্রা করা হয়? হয়তো অতি সামান্য কারণে পাঁচ বার আবার গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, পরে হয়তো বেলা ৩॥০ টার সময় নিমন্ত্রণে বাড়িতে উপস্থিত হইবেন। সময় বলিয়া যে একটা মূল্যবান্ সামগ্রী আছে তাহা এ দেশীয় স্ত্রীলোকের প্রায় বোধ হয় না। সময়কে যত হত্যা করা যায় ততই তাঁহার পুরুষত্ব অথবা স্ত্রীত্ব ইহাই তাঁহাদের যেন শাস্ত্রের কথা। সামান্য একটি বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে স্ত্রীলোকের যাইতে হইলে কত ক্ষণ পালকী অথবা গাড়ী যে দরজায় অপেক্ষা করিয়া থাকে তাহা বলা যায় না। ঠিক সময়ে কোন স্থানে যাওয়া অথবা ঠিক সময় কোন কাজ করিয়া উঠা স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে বোধ হয় যেন লেখে না। কেবল এ দেশীয় রমণী-সম্বন্ধে আমরা এ কথা বলি না, ইংলণ্ডীয় রমণীগণ এত জ্ঞান সভ্যতা ও উন্নতিতে ভূষিতা হইয়া তাঁহাদেরও এসম্বন্ধে অত্যন্ত অভাব আছে। আমরা অনেক ভাল ভাল সাহেব ও বিবির নিকট এ কথা শুনিয়াছি যে ইংলণ্ডের পুরুষগণ সময়কে টাকা কড়ীর মত মূল্যবান্ পদার্থ মনে করেন, বৃথা সময় ক্ষেপন করা ও অর্থ নষ্ট করা সমান জ্ঞান করেন, কিন্তু তত্রস্থ স্ত্রীগণের এখনও সে বোধ হইতে অনেক বিলম্ব, এ সম্বন্ধে সকল দেশের নারী স্বভাব সমান। স্ত্রীলোকের স্বভাবের উল্লিখিত ত্রুটির অনেক গুলি প্রকৃতিগত কারণ আছে তাহা আমরা জানি। প্রথম কারণ এই স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বল। দুর্ব্বল লোকের পক্ষে হাত পা নাড়িতে অনেক বিলম্ব হয়। সবলকায় মনুষ্য এক মিনিটে যতবার, এবং যেরূপ বলের সহিত হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে পারেন এক জন দুর্ব্বল লোকের পক্ষে তাহা করা অসম্ভব। সুতরাং সবল পুরুষদিগের মত শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োজনীয় কাজগুলি করিয়া রাখা স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টকর। তিনি সহজেই একটু গল্প ও বিশ্রামপ্রিয় হইয়া থাকেন। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে খুব পরিশ্রমশীল সবলকায় নারী নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে এরূপ অনেক স্ত্রীলোক আছেন, পরিশ্রম ও বলসম্বন্ধে যাঁহারা বড় বড় পুরুষকে লজ্জিত করিতে

পারেন, কিন্তু সাধারণ স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতিকে তুলনা করিয়া আমর আমাদের উপরিউক্ত কথা গুলি বলিতেছি। দ্বিতীয় কারণ স্ত্রীজাতির বেশভূষ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টি। ভগবান্ তাঁহার সৃষ্টির গূঢ় অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য স্ত্রীজাতিকে সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া দিয়াছেন। দেবদত্ত এই দান অত্যন্ত বিশ্বস্তমনে স্ত্রীজাতি সংরক্ষা করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারীদিগকে সেই জন্য এরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা যেরূপ আপনাদিগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও রূপলাবণ্য প্রকাশ জন্য ব্যস্ত এমন আর কেহ নহে, এই জন্য তাঁহারা ভাল ভাল অলঙ্কার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রের জন্য এত দূর লালায়িত যে অনেক সময় তাঁহাদিগকে তজ্জন্য লোভ ও বিষম পাপে পতিত হইতে হয়। এই প্রকৃতির বশবর্ত্তী বলিয়া বেশভূষ করিবার জন্য তাঁহাদের অনেক সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গায়ে সাবান মাখিতে ও পরিষ্কার করিয়া তাহা ধুইতে ও গা মুচিতে চুল আচ্ড়াইয়া, খোঁপা বাঁধিতে, অলঙ্কার বস্ত্র ভাল করিয়া পরিতে, তাঁহার যে কত সময় যায় তাহা বলা যায় না। পুরুষগণ অনেক সময় তাঁহাদের প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি করিতে না পারিয়া কত বার স্ত্রীজাতিকে যে বিদ্রূপ ও ঘৃণা করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। অনেক পুরুষ এরূপ আছেন যাঁহারা একেবারে মাথা আঁচড়ান না, আরশিতে এক বৎসরে একবার মুখ দেখেন কি না সন্দেহ কিন্তু স্ত্রীলোক নীচতম শ্রেণীর হউন না কেন, তাঁহার মুখ দেখিবার এক খানি আরশি ও চুল আঁচ্ড়াইবার চিরুণী থাকিবেই থাকিবে। তিনি যখন মাথা আঁচাড়াইয়া গা মুচিয়া ভাল কাপড় ও অলঙ্কার পরিয়া রাস্তায় বাহির হন তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এইরূপ বেশভূষা করিতে স্ত্রীলোকের অনেক সময়ের প্রয়োজন আমরা তাহা স্বীকার করি। এটি তাঁহাদের সময় বোধ জন্মিবার পথের কণ্টক তাহাও আমরা জানি। স্ত্রীলোকের সময় বোধ না থাকিবার আর একটি বিশেষ কারণ, তাঁহাদিগের শিক্ষার অভাব। আমরা এ কথা বলি না যে, আমাদিগের দেশের পুরুষদের খুব সময় বোধ। এসম্বন্ধে তাঁহাদেরও অত্যন্ত অভাব আমরা স্বীকার করি। বঙ্গবাসীদিগের সভাসকল যে ঠিক সময়ে হয় না, বেলা দুইটার সময় হইবে বিজ্ঞাপন দিলে ৩॥০ টার সময় সকলে জুটিয়া উঠেন একথা সকলেই জানেন। বেলা ১০ টার সময় কোন স্থানে যাইব বাবু স্থির করিলে হয়ত বেলা ৪ টার সময় গিয়া উপস্থিত হন। আজ কাল পুরুষদিগের এসম্বন্ধে একটু শিক্ষা হইতেছে বলা যায় কিন্তু স্ত্রীলোকদি-

গের অবস্থা দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়। এমন নারী অনেক গৃহে দেখা যায় যাঁহার পরিশ্রম ও উদ্যম দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কিন্তু হয়তো তাঁহাদের ছেলেদের সর্ব্বদাই উপবাস করিয়া স্কুলে যাইতে হয়, সময়ে ভাতে ভাতও হইয়া উঠে না। গৃহিণী খুব প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন, কিন্তু উঠিয়া যে কার্য্য অগ্রে হওয়া উচিত তাহা অগ্রে সম্পন্ন করিয়া পরের কার্য্য পারে না করিয়া সর্ব্বাগ্রেই সন্ধ্যার সময়ের কার্য্য হয় তো প্রথমেই করিতে বসেন। প্রাতে উঠিয়াই সল্‌তা গুলি পাকাইতে ও প্রদীপ পরিষ্কার করিতে হয়ত বসেন। সন্তান দুগ্ধের অভাবে ক্ষুধায় কাঁদিলে বলিতে থাকেন, "আমি কয়টা হাত করিয়া কর্য্য করিব? এই সল্‌তাগুলতো আবার সন্ধ্যার সময় চাই, তখন তো আর কেহ করিতে আসিবে না। এই গুলি শেষ করিয়া দুগ্ধ প্রস্তুত করি।" সন্তানকে দুগ্ধ দিয়া হয় তো একেবারে বাটীর পুরাতন বাসনের রাশি বাহির করিয়া তাহা মাজিতে থাকেন, এদিকে স্কুলের ভাত না পাইয়া সন্তানগণ কাঁদিতে কাঁদিতে উপবাস করিয়া স্কুলে চলিয়া যায়। এইরূপ সময়ের কাজ যথা সময়ে না করিয়া অন্য কার্য্যে শরীরের বলও সময় নষ্ট করিয়া নিজে বেলা তিন টার সময় স্নান আহার করিয়া ভীষণ রোগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন ও সন্তানদিগকে বিষম কষ্ট দেন। বেলা ১০টার সময় অন্ততঃ সামান্য রকমে খাওয়াইব বলিয়া কোন কুঠিওয়ালা বাবুকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি কখনই যথাসময়ে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন না। নানা রকমের ব্যঞ্জন রাঁধিতে বসেন এবং হয় তো বেলা ১২টার সময় ভাত চড়াইয়া কুঠিওয়ালা বাবুর চাকরি নষ্ট করিয়া দেন। দাসদাসীর উপযুক্ত সহায়তা লওয়াও প্রকৃত শিক্ষিত মনের কার্য্য। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা যে স্থলে দুই জন দাসদাসীর প্রয়োজন তথায় হয় তো এক জন রাখিয়া থাকেন এবং এক জনের স্থলে দুই চারি জন নিযুক্ত করেন। নিজে যেরূপ ঠিক সময়ে সময়ের কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না, দাসদাসীদিগকেও সময়ের কার্য্য অসময়েও অসময়ের কার্য্য সময়ে করাইয়া সমস্ত দিন বৃথা পরিশ্রম করাইয়া কষ্ট প্রদান করেন এবং অবশেষে বিরক্তি ও ক্রোধের আগুনে নিজে পুড়িতে থাকেন। যথাসময়ে বুঝিয়া সুজিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য গুলি সম্পন্ন করা ও হিসাব করিয়া দাসদাসীর সংখ্যা নিযুক্ত করা এবং তাহাদিগের দ্বারা উপযুক্ত কার্য্য সকল যথাসময়ে সম্পন্ন করান মানসিক শিক্ষার কার্য্য। অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া এম, এ, বি এ হইলে এ শিক্ষা হয় না। কিন্তু যাঁহারা আদর্শ গৃহিণী হইতে চাহেন তাঁহাদিগেরই এই শিক্ষা হইয়া থাকে। এরূপ শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোক গৃহের গৃহলক্ষ্মী হয়েন। স্ত্রীজাতি যে স্বাভাবিক দুর্ব্বল, তাঁহারা যে পুরুষের মত পরিশ্রমে অশক্ত তাহা আমরা জানি এবং তাঁহাদিগের দেবদত্ত সৌন্দর্য্য রক্ষার্থে বেশভূষার জন্য যে তাঁহাদিগের অনেক সময় যায় তাহাতেও আমরা দুঃখিত নহি। আমরা ইহাও মনে করি, যে নারী আপন সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে অশক্ত তিনি নারী নামের উপযুক্ত নহেন। আমরা আবার ইহাও বিশ্বাস করি যে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা হইলে এ সমস্ত প্রকৃতিগত অসুবিধা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকের সময় বোধ হইতে পারে। যথা সময় সমস্ত কার্য্য গুলি তাঁহার সম্পন্ন হইতে পারে এবং দাস দাসীদিগের দ্বারা উপযুক্ত মত কার্য্য করান যাইতে পারে। যে স্ত্রীলোকের সময় বোধ নাই, তাঁহার গৃহে কখন সুশৃঙ্খলা ও শান্তি থাকে না, তাঁহার নিজের শরীর সুস্থ থাকে না এবং তাঁহার সন্তান ও দাস দাসীগণ রোগের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। সময় বোধ না থাকিলে স্ত্রীলোক কখন আদর্শ গৃহিণী হইতে পারেন না।

পারসীক আখ্যায়িকা।

কথিত আছে পারস্যদেশে একটি নারী সম্পত্তিস্বরূপ তাহার পুত্রকে চাল্লিশ মুদ্রা দান করিয়া বলিলেন "বৎস

প্রতিজ্ঞা কর কখন মিথ্যা কথা বলিবে না।" পুত্র তদ্রূপ শপথ করিল। মাতা বলিলেন "যাও বৎস, ঈশ্বরের নিকট তোমাকে অর্পণ করিলাম। এ পৃথিবীতে আর আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে না।" বালক মাতার নিকট বিদায় লইয়া ভ্রমণে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে একদল দস্যু তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বালককে জিজ্ঞাসা করিল তাহার নিকট কি আছে। সত্যবাদী বালক উত্তর করিল "চল্লিশ মুদ্রা আমার পরিধেয় বস্ত্র মধ্যে সেলাই করা আছে" দস্যু ভাবিল বালক উপহাস করিতেছে। সে হাসিয়া উঠিল। আর একজন দস্যু বালককে পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিল। বালক পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে উত্তর প্রদান করিল। অবশেষে ঐ দস্যুদিগের দলপতি বালককে নিকটে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন তাহার নিকট কি আছে। সে উত্তর করিল "আমি ত তোমার দুই জন অনুচরকে বলিয়াছি যে আমার বস্ত্র মধ্যে চাল্লিশ মুদ্রা আছে। দলপতি বালকের বস্ত্র কর্ত্তন করিয়া মুদ্রা আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আদেশ করিলেন। যথার্থই মুদ্রা পাওয়া গেল। তখন আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে অর্থের বিষয় সত্য বলিলে ইহার কারণ কি?" সরল বালক উত্তর করিল আমি আমার মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম কখন ও মিথ্যা

বলিব না। সেজন্য মিথ্যা বলিনা। মাতার নিকটকি আমি অবিশ্বাসী হইব ?'' দলপতি বালকের কথায় বিস্মিত হইলেন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিলেন "বালক তুমি এই কিশোর বয়সে মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালনের বিষয়ে এত মনোযোগী আর আমি বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্ত্তব্য একেবারে ভুলিয়াছি। তোমার হস্ত আমাকে দাও, তাহা স্পর্শ করিয়া আমি শপথ করিতেছি আজ হইতে জীবন ফিরাইলাম। তখন তাঁহার অনুগামী সহচরগণ দলপতিকে বলিল "প্রভু তুমি দস্যুতাতে আমাদের নেতা ছিলে এখন সৎপথেও আমাদের নেতা হও" এই বলিয়া দস্যুগণ সকলে বালকের হস্ত লইয়া জীবন সংশোধনের প্রতিজ্ঞা করিল। এবং সেই দিন হইতে সকলে ভাল হইল। বালকের সৎদৃষ্টান্তের এই ফল হইল।

স্বর্ণরেণু।

যে আপনাকে আপনি সাহায্য না করে অন্যে তাহাকে কখনও সাহায্য করিতে পারে না।

নিদ্রার সময় ব্যতীত কখনও অলস হওয়া উচিত নহে, সর্ব্বদা মন এবং হস্তকে ভাল চিন্তা এবং কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবে।

বরঞ্চ অধিক উদার হওয়া ভাল, কিন্তু সঙ্কীর্ণ চেতা হওয়া ভাল নয়।

মনকে স্থির ও দৃঢ় রাখা উচিত, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন ভাল নহে!

যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে সে কার্য্যে উত্তম পারদর্শিতা থাকা প্রয়োজন।

পরস্পরের চরিত্রের উপর শ্রদ্ধা ভিন্ন সদ্ভাব থাকা কঠিন। মানুষ অন্যের ত্রুটি যত শীঘ্র দেখিতে পায় নিজের ত্রুটি যদি তত শীঘ্র বুঝিতে পারিত তাহাহইলে ভাল হইবার ভাবনা ছিল না।

কুসঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জন বাস ভাল।

বন্ধু যদি শত্রু হয় তাহার শত্রুতা অধিক ভয়ানক হয়।

পর যদি আপনার হয় তবে আপনার যে সে কেন পর হয় ?

যে ভগবানকে চায় সে সকলই পায় যে কেবল সংসার চায় সে ভগবান এবং সংসার উভয়ই হারায়।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৬ সংখ্যা।] আশ্বিন, সন ১২৯৫। [১১ খণ্ড।

জীবন উৎসর্গ।

এমন মহৎ জীবন আর দেখি নাই। পরের সুখে সুখী পরদুঃখে দুঃখী এমন আর নাই। পরের অশ্রু মুছাইতে এত ব্যস্ত কে ? আপনার কথা সকলে ভাবে, আপনার কার্য্য সকলে করে, পরের জন্য এত কে করে ? তাঁহার আপনার কেহ নাই পরই তাঁহার আপনার। যে যখন তাঁহাকে চায়, তখনই তাঁহাকে পায়। যাহার আপনার লোকের প্রয়োজন, সে আপনার বলিয়া তাঁহাকে লাভ করে। তাঁহার নিজের কোন অভাব নাই, নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই, কিন্তু পরের অভাবই তাঁহার অভাব, পরের প্রয়োজনই তাঁহার প্রয়োজন। পরের মঙ্গলে তিনি সুখী, পরের ভাল করিতে পারিলে তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। পরের জন্য তিনি ইহজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পরই তাঁহার সর্ব্বস্ব। আপনার জীবনের সুখ দুঃখ নাই, পরের সুখে তিনি হাস্য করেন, পরের ক্লেশ দেখিলে তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হয়। রোগশয্যায় তাঁহার তুল্য সেবা কে করিতে পারে ? অসময়ে সকলে তাঁহার সাহায্য চায়, রোগে শোকে তিনি সকলকে সান্ত্বনা দান করিতে ব্যস্ত। পরের জন্য তিনি পরিশ্রম করেন, পরকে তিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন। তিনি যে কেবল বাহিরে এ সকল করেন তাহা নহে তাঁহার অন্তরও পর দুঃখে কাতর। সহজেই তাঁহার সহানুভূতি পরের দিকে যায়। নিজের অশন বসনের দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু পরের আহার পরিচ্ছদ যোগাইতে তিনি ব্যস্ত। পরকে তিনি ভালবাসেন। পরের জন্য তিনি জীবনদান আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর মন পরসেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। তাঁহার সন্তান নাই, কিন্তু পরের সন্তানকে কে এত ভালবাসিতে পারে ? বুঝি স্বর্গের ঈশ্বরের এক বিন্দু দয়া স্নেহ তাঁহার জীবনে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, তাই তিনি পরকে এত ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন। অনন্ত করুণা এক বিন্দু বুঝি তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি দেখাইতেছে! ধন্য সেই জীবন, এমন জীবন দেবগণেরও প্রিয়।

(কাব্যকাহিনী)

ভায়োলা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ভায়োলা যখন লেডি ওলিভিয়ার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন, ওলিভিয়া তাঁহার মন পরীক্ষার্থ এক জন অনুচর দ্বারা একটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় যুবকবেশধারী ভায়োলার নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই অনুচরকে তিনি এই কথা বলিয়া দিলেন যে, "এই অঙ্গুরীয় যুবা আমার নিকট ফেলিয়া গিয়াছে আমি ইহা চাই না। তুমি ডিউকের অঙ্গুরীয় তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে বলিও। আর যদি যুবা কাল এখানে আসে ইহার কারণ জানিতে পারিবে।" অনুচর ভায়োলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল এবং ঐ অঙ্গুরীয় অর্পণ করিল। ভায়োলা অঙ্গুরীয় দানের কথা অস্বীকার করিলেন। কিন্তু অনুচর তাহা ঐ স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিল। ভায়োলা বিস্ময়ান্বিত হইয়া রহিলেন, পরে চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কই আমিত কোন অঙ্গুরীয় লেডি ওলিভিয়াকে দিয়া আসি নাই। ইহার অর্থ কি? আমার প্রভুত আমার দ্বারা অঙ্গুরীয় প্রেরণ করেন নাই, তবে কি ওলিভিয়া আমাতে অনুরক্ত হইলেন। সত্য বটে তাঁহার দৃষ্টি ও ব্যবহারে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল। তবে কি তিনি আমাকে ভাল বাসেন? তাহাই হইবে। আমাকে ভালবাসা আর স্বপ্নে অনুরক্ত হওয়া সমান। সকল প্রকার ছদ্মবেশ বা কপটতাই দেখিতেছি বড় অন্যায় ও অধর্ম্মের কারণ। কারণ ইহা দ্বারা বহু অনিষ্ট সংঘটন হয়। হায় স্ত্রীলোকের চিত্ত কি দুর্ব্বল। আমার প্রভু এই নারীকে অত্যন্ত ভালবাসেন। আর দুর্ভাগিণী আমি আমার প্রভুর প্রতি অনুরক্ত। লেডি ওলিভিয়া আবার ভ্রমক্রমে আমাতেই অনুরক্ত হইলেন। এ সকলের পরিণাম কি হইবে? আমি পুরুষবেশধারী সুতরাং আমার প্রভুর প্রণয়ে আমার কোন অধিকার নাই। আমি স্ত্রীলোক, লেডি ওলিভিয়া কত বৃথা নিষ্ফল অশ্রু আমার জন্য ফেলিবেন। সময় তুমিই এ সকল গ্রন্থি উন্মোচন করিও, আমার সাধ্য নাই।"

ওদিকে ভায়োলার ভ্রাতা সিবাষ্টাইন্ সে দিবস ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। জলমগ্ন হইবার সময় এণ্টোনিও নামে এক জন কাপ্তেন সিবাষ্টাইনের প্রাণরক্ষা করে এবং তাঁহাকে আপনার আলয়ে আশ্রয় দেয়। এই সময় উভয়ের গভীর প্রণয় ও সৌহার্দ্দ্য জন্মে। কিছু দিন পরে সিবাষ্টাইন ডিউক ওর্সাইনোর রাজসভা সন্দর্শনার্থ ইলিরিয়াতে আগমন করিলেন। এণ্টোনিও কোন পুরাতন অপরাধে ইলিরিয়া রাজদ্বারে দণ্ডনীয় ছিলেন, তথাপি

বন্ধুপ্রণয়ের অনুরোধে তিনিও সিবাষ্টাইনের সহিত ইলিরিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন।

এদিকে ভায়োলা লেডি ওলিভিয়া যে যে কথা বলিয়াছিলেন ডিউকের নিকট গিয়া সে সমুদয় বলিলেন। ডিউক তথাপি হতাশ্বাস না হইয়া পুনরায় তাঁহাকে ওলিভিয়ার নিকট দূতস্বরূপ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ভায়োলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বালক, যদি কখনও তুমি কাহারও প্রতি অনুরক্ত হও, আমার কথা মনে করিও। সেইই গানটি তোমার কেমন লাগিয়াছিল? (তৎপূর্ব্ব রজনীতে বালকগণ সঙ্গীত দ্বারা ডিউকের চিত্তরঞ্জন করিতেছিল।)

ভা। বড় সুন্দর গীত। সেই সঙ্গীত প্রণয়িহৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হয়।

ডিউক। ভালবাসার বিষয়ে এমন সুন্দররূপে তুমি কেমন করিয়া হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিলে? আমার নিশ্চয় বোধ হয়, যদিও তুমি অতিতরুণবয়স্ক, এ বয়সেও তোমার চক্ষু কাহাকেও প্রেমদৃষ্টিতে দেখিয়াছে। কেমন বালক সত্য কিনা?

ভা। হাঁ মহারাজ, অল্প অল্প।

ডি। সে নারীর আকৃতি কিরূপ?

ভা। মহারাজ, আপনার বর্ণের তুল্য তাহার বর্ণ।

ডি। তবে সে তোমার উপযুক্ত নহে। তাহার বয়স কত?

ভা। প্রভু, তাহার বয়স আপনার তুল্য।

ডি। তবেত তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার ভাল বাসার পাত্রী যেন তোমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হয়। আমরা যতই কেন বলি না, পুরুষের হৃদয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা অনেক চঞ্চল এবং অস্থির ও পরিবর্ত্তনশীল, তাহাদের প্রেমও তদ্রূপ ভিন্ন। পুরুষের প্রেম স্থায়ী হওয়া কঠিন। অতএব বয়ঃ কনিষ্ঠাকেই বিবাহ করা উচিত। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য পুষ্পের ন্যায় বিকাশের পর শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

ভা। যথার্থ বলিয়াছেন। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য এইরূপই বটে। হায় সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইলেই তাহা বিনষ্ট হয়। * * * *

ডি। সেসেরিও আবার তুমি সেই নির্দ্দয়া নারীর নিকট যাও এবং আমার গভীর প্রণয়ের কথা বল। বলিও যে তাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য আমার নিকট মৃত্তিকাতুল্য তুচ্ছ। তাঁহার রূপ গুণ প্রকৃতিতেই আমি একান্ত অনুরক্ত।

ভা। মহারাজ, যদি তিনি আপনাকে ভালবাসিতে না পারেন?

ডি। এ উত্তর আমি শুনিব না।

ভা। সত্যই আপনার শুনিতে হইবে। মনে করুন, যেন অন্য কোন নারী আপনার প্রতি তেমনই অনুরক্ত, যেমন আপনি লেডি ওলিভিয়াকে ভালবাসেন। আপনি তাহাকে জানাইলেন যে

তাহাকে ভালবাসিতে পারিবেন না. তখন সে তাহাতে নিরস্ত না হইয়া কি করিবে?

ডি। আমার ন্যায় কখনও কোন নারী ভালবাসিতে পারে না। কোন্ নারীর হৃদয় এত প্রশস্ত? আমার ভালবাসার সহিত কোন নারীর ভালবাসার তুলনা করিও না। ওলিভিয়াকে আমি যেরূপ প্রেম করি, কোন স্ত্রীলোক কাহাকেও সেরূপ প্রেম করিতে পারে না।

ভা। কিন্তু আমি জানি।

ডি। তুমি কি জান বালক?

ভা। স্ত্রীলোক কত ভালবাসিতে পারে আমি জানি। পুরুষের তুল্য তাহাদের হৃদয়ও গভীর প্রেমপূর্ণ। আমার পিতার একটি কন্যা ছিল। সে এক জনকে অত্যন্ত ভালবাসিত। আমি যদি স্ত্রীলোক হইতাম হয়ত আপনাকে সেইরূপ ভালবাসিতাম।

ডি। তাহার ইতিহাস বল।

ভা। তাহার জীবন কাহিনীশূন্য। সে কখনও ভালবাসার কাহিনী প্রকাশ করে নাই, কলিকামধ্যে লুক্কায়িত কীটতুল্য গুপ্ত প্রেম তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিত। মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতার প্রতিমাতুল্য সে ধীর ভাবে মনের ক্লেশ সহ্য করিত, এবং বাহিরে প্রফুল্ল ভাব দেখাইত। ইহা কি প্রকৃত প্রেম নহে? পুরুষেরা হয় ত মুখে অধিক বলে, অধিক প্রকাশ করে, কিন্তু পুরুষের ভালবাসা প্রতিজ্ঞাসার, যথার্থ প্রেম তাহাদের অল্প।

ডি। বালক, তোমার ভগিনী কি নিরাশপ্রণয়ে জীবন শেষ করিয়াছিল?

ভা। আমিই এখন আমার পিতার একমাত্র সন্তান, তবে বলিতে পারি না—মহারাজ লেডি ওলিভিয়ার নিকট কি আমি এখন যাইব?

ডি। হাঁ, শীঘ্র যাও—এই অলঙ্কার তাঁহাকে দিও, বলিও আমার ভাল বাসা প্রত্যাখ্যান মানিবে না।

ক্রমশঃ—

আসামের রাজা।

বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে আসাম রাজ্য। নিম্ন আসামের অন্তর্গত কামরূপ প্রদেশ। এই প্রদেশের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। কথিত আছে যে, পাণ্ডবদিগের রাজত্বকালে ভগদত্ত রাজা এদেশে রাজত্ব করিতেন। কুরুক্ষেত্রসমরে তিনি বহু মাতঙ্গ সঙ্গে করিয়া যাইয়া রাজা দুর্য্যোধনের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার বহু কাল পরে, বোধ হয়, ভারতবর্ষে মোসলমানদিগের রাজত্ব স্থাপন হওয়ার পূর্ব্বে শ্যামদেশ হইতে অসভ্য অহম জাতি আসিয়া সে দেশে অধিকার বিস্তার করে। সেই অহম বংশীয় রাজা বিগত ১৮৩৮ সালে রাজ্যচ্যুত হন। তদবধি ইংরেজগবর্ণমেণ্ট আসাম রাজ্যকে আপনাদের রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন। এক সময় আসামরাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কোচবিহার রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অরণ্য ও পর্ব্বতশ্রেণীতে নাগা ডফলা মিরিমিকির মিস্‌মি আকা খসিয়া প্রভৃতি ১৫। ১৬ প্রকার ঘোরতর অসভ্য জাতি বাস করে। তাহাদের আকার প্রকার রীতি নীতি ভাষা পরস্পর বিভিন্ন। ইহারা প্রায় সকলেই স্বাধীন। সমতল ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদি নানা শ্রেণীর হিন্দুর বাস। ব্রাহ্মণাদি জাতি আসামের আদিম নিবাসী নহে, বঙ্গদেশ হইতে যাইয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। উপরিউক্ত অসভ্য লোকেরাই আসামের প্রকৃত আদিমনিবাসী।

ব্রহ্মদেশাধিপতির মান নামে খ্যাত প্রবল সৈন্য পুনঃ পুনঃ আসিয়া আসাম রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল। তাহারা তথাকার অসঙ্খ্য নর নারীকে হত্যা করে, সহস্র সহস্র লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, এবং লুট পাট করিয়া দেশকে ছারখার করে। এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারে গ্রাম নগর সকল শূন্য অরণ্যময় হইয়া যায়। আসামরাজ তাহাদের আক্রমণে একান্ত দুর্ব্বল ও অননোপায় হইয়া পড়েন। তিনি কিছুতেই শত্রু নিবারণ করিতে না পারিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। পরে ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে শত্রুদিগকে পরাস্ত করেন। কিন্তু শত্রু পরাস্ত করিলে কি হইবে? যিনি রক্ষক তিনি ভক্ষক হইলেন। অবশেষে ব্রিটিশসিংহই তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিয়া বসেন। ১৮৩৮ সালে আসামাধিপতি রাজা পুরন্দর সিংহ হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমগ্র আসাম রাজ্যের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হন। তদবধি অসামরাজ একজন জমীদারের ন্যায় হইয়া থাকেন। এইক্ষণ আসাম রাজ্যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ৯টি জেলা স্থাপিত। অহম বংশীয় রাজা রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন অবধি এ দেশের আসাম নাম হইয়া থাকিবে; অথবা এই প্রদেশের কোথাও গিরিশ্রেণী, কোথায় সমতল ক্ষেত্র, এইরূপ অসমতা প্রযুক্ত আসাম নাম হইয়াছে। উত্তর দক্ষিণে আসামদেশের দৈর্ঘ্য বহুদূরব্যাপী, পূর্ব্ব পশ্চিমে পরিসর অপেক্ষাকৃত অল্প।

আসাম রাজগণ ঘোরতর অসভ্য ছিলেন। প্রথমতঃ ইহাঁদের নাম কংচু নংচু ফংচু এইরূপ ছিল। পরে গোহাটি প্রদেশের কোন শাক্ত ব্রাহ্মণ এক জন আসামরাজকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদবধি এই রাজপরিবার হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি করিয়া আসিতেছেন। সেই হইতে গদাধরসিংহ ও শিবসিংহ প্রভৃতি হিন্দুনামের অনুরূপ আসাম রাজদিগের নাম করা হয়। যখন যিনি রাজা হইতেন, তখন তাঁহার নামে

স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রাদি প্রস্তুত হইত। অল্পপরিমাণ মুদ্রা মুদ্রিত হইত, তাহা রাজভাণ্ডারভুক্ত হইয়াই থাকিত, রাজ্যের সাধারণ প্রজাদের মধ্যে উহা প্রায় প্রচলিত ছিল না। টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে মূল্য স্থলে দ্রব্যাদির পরস্পর বিনিময় হইত। রাজকর্ম্মচারিগণও অর্থ বেতন পাইতেন না, তাঁহাদের মনুষ্য বেতন ছিল। কাহার ৫০০ শত লোক, কাহারও দুইশত লোক বেতন ছিল। যাঁহার অধীনে যত লোক, তিনি সেই সকল লোককে স্বেচ্ছানুসারে কৃষি-কর্ম্মাদিতে খাটাইতেন, তাহারা সৈনিকের কার্য্যও করিত। রাজকর্ম্মচারিগণ যথোপযুক্তরূপ নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। গোহাটি নগরে ফুকুন উপাধিধারী প্রধান গবর্ণর বাস করিতেন। এই নগরে তাঁহার আবাসের ভগ্নাবশেষ এইক্ষণও বিদ্যমান। উত্তর আসামে ডেকুনদের উত্তর কূলে শিবসাগর নগর। এই নগরের প্রায় এক ক্রোশ অন্তর উক্ত নদের দক্ষিণ কূলে রাজধানী ছিল, রাজধানীর নাম রংপুর। আসাম মহারাজের দ্বিতল রং ঘর সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই রংঘরের নামানুসারেই রাজধানীর নাম রংপুর হইয়াছে। রংঘরের উপর হইতে আসাম রাজগণ হস্তী মহিষ ইত্যাদি বৃহদাকার পশুর পরস্পর যুদ্ধ দর্শন করিতেন। রংপুরে এইক্ষণ আর লোকের বসতি নাই। প্রকাণ্ড রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ সকল অরণ্যাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রাজবাটীর চতুষ্পার্শ্ব বৃহৎ পরিখা ও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সেই পরিখার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ হইবে। হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া না গেলে রাজবাটীর অরণ্যাকীর্ণ ভগ্ন অট্টালিকা সকল উত্তমরূপে দেখিতে পারা যায় না। রাজবাটীর ভিতরে একটি সুন্দর সরোবর আছে। বাটীর দ্বারের অদূরেই অস্ত্রাগার। সম্প্রতি একটি বৃহৎ লৌহময় কামান তথা হইতে বাহির করা হইয়াছে। কামানটি প্রায় ৩২ ফুট লম্বা হইবে। সরোবরের পার্শ্বেই রাজপ্রাসাদ। সরোবরটি বোধ হয় অন্তঃপুরের অন্তর্গত, উহা রাণীদিগের ক্রীড়া-সরোবর ছিল। এক স্থানে পরিখার উপর ইষ্টক ও প্রস্তরময় সুদৃঢ় সেতু স্থাপিত। সেই সেতুযোগে পরিখা পার হইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে হইত। পরিখার বহির্দ্দেশে ইতস্ততঃ কয়েকটি দেবমন্দির বিদ্যমান। পূর্ব্বাংশে জয়সাগর নামে সুবৃহৎ সরোবর। এই সরোবরের চারি কূল ঘুরিয়া আসিতে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ পথ ঘুরিতে হয়। মহারাজ গদাধর সিংহ স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী মহারাণী জয়মতীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই প্রকাণ্ড সরোবর নিখাত করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘিকার পশ্চিম কূলে তিনটি সমুচ্চ দেবমন্দির স্থাপিত আছে। এই সকল দেখিলে রাজত্ব, প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা স্বতঃই মনে উদয় ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা" এই বচন অব্যর্থ বলিয়া প্রতীতি হয়।

ক্রমশঃ—

মনোরমা।

ভাদ্র মাস। ভরা গঙ্গা কাণে কাণে জল। সন্ধ্যা হইয়াছে। গঙ্গার বক্ষে পাল তুলিয়া কত নৌকা প্রবল বেগে ভাসিয়া যাইতেছে, দূরে দুই এক খানি ষ্টীমার নঙ্গর ফেলিয়া আছে। কত নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে। তাহাদের ভিতরের দীপের আলোক জলের উপর এখানে ওখানে জ্বলিতেছে। এমন সময় একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দ্রুতগতিতে উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া ঘাট ছাড়িয়া আঘাটায় গিয়া লাগিল। নৌকার উপর এক জনমাত্র মাঝি। নৌকা আসিবামাত্র ভিতর হইতে এক জন পুরুষ বাহির হইল, এবং মাঝিকে নৌকা ঐ স্থানে বাঁধিয়া রাখিতে বলিয়া এক লম্ফে তীরে নামিল, এবং নদীতীরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল। মাঝি অনুজ্ঞা অনুসারে নৌকা বাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নৌকারোহী পুরুষ কিছু দূর দ্রুতগতিতে গিয়া একখানি পরিষ্কার দ্বিতল বৃহৎ বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাটীর চারি দিকে প্রাচীরসম্মুখে লৌহফটক। ভিতরে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। দেখিলেই বোধ হয় কোন সম্পন্ন ব্যক্তির আবাস স্থান। ফটকের বাম পার্শ্বে এক জন ভৃত্য দণ্ডায়মান ছিল। তাহার আকৃতি দেখিলেই তাহাকে খুব নৃশংস শঠ বলিয়া বোধ হয়। নবাগতকে দেখিবামাত্র সে আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইল, এবং উভয়ে পথের অপর পার্শ্বে ও বৃহৎ বট বৃক্ষের নীচে গিয়া মৃদু স্বরে পরামর্শ করিতে লাগিল। ভৃত্য বলিল, "আপনি এই খানে কাল অপেক্ষা করিবেন, যদি সুবিধা হয় কালই আপনি যা চান পাইবেন। আপনাকে আর এক দিন কষ্ট করিতে হইবে, কাল যেমন করিয়া পারি আপনার কাজ উদ্ধার করিব।" নবাগত বলিল "শীঘ্র শীঘ্র কাজটা যদি করিয়া দিতে পার পুরস্কারও অনেক পাবে বুঝিলে ত?"

ভৃত্য। শীঘ্রই করি আর দেরিতে করি, বক্সিসটা ভাল রকম না দিলে এ কাজ আমা দ্বারা হইবে না এটা মনে রাখিবেন। যে কাজ করিতে যাইতেছি, যদি ধরা পড়ি ত খুবই দায়ে পড়িব।

নবাগত। হাঁ তা জানি তবে কাল এমনি সময় আমি ঐ ধানের ক্ষেতে থাকিব, তুমি সেখানে ঠিক সময় যাইও।

এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল। ভৃত্য উক্ত দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিল এবং অপর ব্যক্তি যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এখন আমরা ঐ বৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। সম্মুখে প্রশস্ত তোরণ। তোরণের অব্যবহিত পরে তৃণশূন্য রক্তবর্ণ শকটাদি প্রবেশের নিমিত্ত প্রশস্ত পথ। পথ মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া অট্টালিকার সম্মুখের দিকে বা সদর মহলের সম্মুখে গিয়াছে, তাহার উপর লোহার রেলবেষ্টিত বারাণ্ডা, নিম্নে বড় বড় থাম, পথের দুই পার্শ্বে হরিদ্বর্ণ পরিষ্কার তৃণক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে কেয়ারি করা নানাবর্ণ অনুচ্চ কোথাও বা উচ্চ ফুলের গাছ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ বা মণ্ডলাকারে শোভা পাইতেছে। বামে ও দক্ষিণে প্রাচীরসন্নিকটে সুদীর্ঘ ও তাল নারিকেল আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ সকল সারি সারি দণ্ডায়মান। এটা বাহির বাটী বা বৈঠকখানা, নানা মূল্যবান্ সজ্জায় সজ্জিত মহল। তাহার পশ্চাতে ভিতর বাড়ী বা অন্দরমহল। ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক ঘর। দাসদাসী পরিবারবর্গে পূর্ণ। অন্দরমহলের পশ্চাতে খিড়্কির বাগান এবং এক বৃহৎ পুষ্করিণী। এই গৃহ কোন ভাগ্যবানের বলিয়া প্রতীত হয়। গৃহকর্ত্তা বলরাম বাবু দেশের মধ্যে এক জন ধনবান্ ব্যক্তি। দোলদুর্গোৎসবে বিস্তর খরচ করেন। বয়সে তিনি প্রবীণ। অনেক দিন হইল তাঁহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে। দুইটি কন্যা, তাহাদের অনেক দিন বিবাহ হইয়াছে এবং শ্বশুরালয়ে বাস করে। একটি মাত্র পুত্র সন্তান, তাঁহার নাম হেমেন্দ্রবসু ও তৎকালে হেম বাবুর একটি কন্যা। সে চারি বৎসর বয়স্কা বালিকা, নাম মনোরমা, আপনার সুমিষ্ট স্বভাব এবং মনোহর সৌন্দর্য্যের জন্য সকলেরই প্রিয়। বলা বাহুল্য, ধনবান্ বলরাম বাবুর পৌত্রী অশেষ যত্ন আদরে পালিতা এবং বহুদাসদাসীসেবিত। যে ভৃত্যের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে ব্যক্তি মনোরমার পিতার কোচ্ম্যান। মনোরমাকে লইয়া মধ্যে মধ্যে শকটযোগে রাজপথে বেড়াইতে লইয়া যায়। পাষণ্ড বহু অর্থ পুরস্কার লোভে পূর্ব্বোক্ত নৌকারোহী পুরুষের নিকট ঐ কন্যাকে বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছে, এবং ঐ বিষয়ে সায়ংকালে গোপনে পরামর্শ করিতেছিল। কি অভিসন্ধিতে উক্ত পুরুষ মনোরমাকে অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যতে জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

পর দিন অপরাহ্ণে মনোরমা বৈঠকখানায় ক্রীড়া করিতেছিল। হেম বাবু তখন স্থানান্তরে গিয়াছেন। এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত ভৃত্য আসিয়া মনোরমাকে বলিল "দিদি, বেড়াতে যাবে? চল আমার সঙ্গে।" বৃদ্ধা দাসী নিকটে ছিল সে বলিল "বাবু নাই, একলা কোথায় যাবে?" কোচ্ম্যান বলিল, "বাবুর জন্য গাড়ী লইয়া যাইতেছি বাবু ও পাড়ার

দত্তদের বাড়ী আছেন এই গাড়িতে করিয়া দিদিকে একটু বেড়াইয়া লইয়া আসি" বৃদ্ধা বলিল "তোমার আজ কেন এত বেড়াতে নিয়ে যাবার শক্ দেখ্ছি? অন্য দিনত এত ব্যাস্ত দেখিনি? এই সময় মনোরমা হাত জড়াইয়া বলিল "যাব আমি গাড়িতে করে বাবাকে আনতে যাব, কোচম্যান আমায় নিয়ে চল্" এই বলিয়া সে দাসীকে নিষেধ করিবার অবসর না দিয়া কোচ্ম্যানের সহিত দৌড়িয়া দৌড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রহিম বক্স এত সহজে মনোভীষ্ট সিদ্ধি হইল দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে মনোরমাকে লইয়া প্রস্থান করিল। বস্তুতঃ তখন গাড়ি প্রস্তুতও হয় নাই, রহিম বক্সের ইচ্ছা নয় যে শকটে করিয়া মনোরমাকে লইয়া যায়। কারণ, তাহা হইলে কার্য্য সম্পন্ন হইবার বিঘ্ন ঘটিতে পারে। ওদিকে বৃদ্ধা দাসী ভাবিল, মনোরমা শকটযোগে বেড়াইতে গেল, সেও সচ্ছন্দচিত্তে ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেল। তোরণের নিকট গিয়া কোচম্যান দ্বারবান্কে বলিল "পাঁড়েজী, মা ঠাকুরুন তোমাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তুমি যাও, আমি ততক্ষণ এখানে আছি।" দ্বারবান্ মা ঠাকুরাণী তলব করিয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অন্দর বাটীর দিকে গমন করিল—দুষ্ট কোচ্ম্যানও সেই অবসরে বাটী হইতে মনোরমার হস্ত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। মনোরমা বলিল, "কৈ, গাড়ি কৈরে?" ভৃত্য বলিল, "ঐ যে রাস্তার মোড়ে আছে, চল তোমায় কোলে করিয়া লইয়া যাই। এই বলিয়া বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সে দ্রুতবেগে রাজপথ পার হইয়া এক অন্ধকার ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। বালিকা একটু ভীত হইয়া বলিল, "আমি যাব না, তুই আমায় বাড়ী নিয়ে চল্।" ভৃত্য বিকট হাস্যে হাসিয়া বলিল, "ঐ যে বাড়ী।" এই বলিয়া জনশূন্যক্ষেত্রের অপর সীমায় মনোরমাকে লইয়া গেল। তথায় সেই নৌকারোহী ব্যক্তি অপেক্ষা করিতেছিল, বালিকাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল, "এই যে আসিয়াছ বেশ হইয়াছে, এই তোমার পুরস্কার লও, আর মেয়েটিকে আমার কাছে দাও।" বালিকা এবার চীৎকার করিয়া উঠিল। নবাগত ব্যক্তি আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি মা, চল আমি তোমায় তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাব, এই বলিয়া আপনার অঙ্গাবরণ খুলিয়া বালিকার গাত্র আবৃত করিল এবং তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান করিল। ভৃত্য পুরস্কার হস্তে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে দ্রুতবেগে বিভিন্ন পথে পলায়ন করিল।

তত ক্ষণে বালিকা ক্লান্ত হইয়া অজ্ঞাত ব্যক্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নদীতীরে উপনীত হইয়া সেই ব্যক্তি মৃদু মৃদু মাঝিকে আহ্বান করিল। মাঝি নৌকা আরও তীরের নিকটে আনিলে নিদ্রিত কন্যাকে প্রথমে সাব-

ধানে নৌকার ভিতর রক্ষা করিল, পরে শীঘ্র শীঘ্র আপনি আরোহণ করিয়া বলিল, "মাঝি, আর দেরি নয়, একেবারে বাড়ির দিকে লইয়া চল। মাঝি কাছি খুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল, ক্ষুদ্র তরণী তীরের ন্যায় বেগে মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্রমশঃ—

পক্ষীর আশ্চর্য্য দাম্পত্যপ্রণয় ও অপত্যস্নেহ।

অনেক স্থলে দেখা যায় যে, মানুষের দাম্পত্যপ্রণয় ও অপত্যস্নেহ অপেক্ষা কোন কোন পক্ষিজাতির মধ্যে সেই প্রণয় ও স্নেহ প্রবল ও প্রগাঢ়। তাহার দুই একটি বৃত্তান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

জহাঙ্গির বাদশার কন্দারদেশীয় একজন মৃগয়ানুচর ছিল। সে এক দিন একাকী প্রান্তরের দিকে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিল। একটি সারসপক্ষী তরুতলে উপবিষ্ট, সে দূর হইতে দেখিয়া তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হয়। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ইচ্ছা করিল যখন সারসটি দাঁড়াইবে তখন গুলি করিবে। শিকারী ক্রমে পক্ষীর দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইল, কিন্তু পক্ষী একবার নড়িলও না, শিকারীর আগমনে তাহাতে কোন ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে এরূপ বুঝা গেল না। শিকারী মনে করিল, সারসটি গুরুতর পীড়িত তজ্জন্য অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারিতেছে না। অনন্তর একেবারে সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং তাহার পা ধরিয়া উঠাইল। পক্ষীকে সে নিতান্ত হাল্কা বোধ করিল, তাহার সমগ্র শরীরে এক তোলা পরিমাণ মাংসও যেন ছিল না। ছাড়িয়া দিলে সারসটি দুই এক পদ কষ্টে চলিয়া পড়িয়া গেল এবং প্রাণ ত্যাগ করিল। শিকারী অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে সারসের বক্ষঃস্থলে কীটাকীর্ণ গলিত মাংসযুক্ত চর্ম্ম সংলিপ্ত আছে। অনুসন্ধানে দৃষ্ট হইল যে, যে স্থানে উক্ত সারস বসিয়াছিল তথায় একটি মৃত সারসের অস্থিপুঞ্জ পতিত রহিয়াছে, উপরিউক্ত সারস বক্ষ ও পক্ষযোগে তাহা আচ্ছাদন করিয়া বসিয়াছিল। পরে প্রকাশ পাইল, সেই অস্থিগুলি পূর্ব্বোক্ত সারসের প্রণয়িনীর ছিল। স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে সারসটি শোকাকুল হইয়া তাহার মৃতদেহ বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক অনাহারে বসিয়াছিল। পরে তাহাতেই প্রাণত্যাগ করে।

একদা জহাঙ্গির বাদশা শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক জন খোজা কর্ম্মচারী ছিল। সে সারসের দুইটি ছানা ধরিয়া লইয়া আইসে। সম্রাট্ জহাঙ্গির স্বীয় প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলে পর, দুইটি বৃহৎ সারস চেঁচাইতে চেঁচাইতে নির্ভয়ে তাঁহার অন্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়, এবং

উৎপীড়িতের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। সারস দুইটির চেঁচাইবার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সেই খোজা শাবক দুইটিকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করে। সমাগত সারসযুগল সেই ছানাদ্বয়ের পিতা মাতা, তাহারা শাবক দুইটিকে দেখিয়া ব্যাকুলতার সহিত দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে আইসে। বোধ হয় ছানা দুইটি আহার পায় নাই, ক্ষুধিত ছিল, পিতা মাতা মুখ হইতে কোনরূপ খাদ্য বস্তু বাহির করিয়া অনুরাগভরে শাবক দুইটির চঞ্চুপুটে অর্পণ করে, এবং উভয়ে উভয় শাবককে সঙ্গে করিয়া আনন্দে চলিয়া যায়।

জহাঙ্গিরের জীবনচরিতলেখক ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সম্রাট যখন আজমির হইতে কাশ্মীরে যাইতেছিলেন, তখন এক দিন থানেশ্বরের নিকটে একজন খোজা অনুচর একটি চটক পক্ষীর ক্ষুদ্র শাবক ধরিয়া লইয়া আইসে। পক্ষিমাতা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহার সঙ্গে আগমন করে। সেই খোজা শাবকটিকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া পিঞ্জরকে দূরে রাখিয়া দেয়। পক্ষিমাতা ক্ষণে ক্ষণে প্রান্তরে চলিয়া যায় ও চঞ্চুপুটে শস্যকণা গ্রহণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া পিঞ্জরের ছিদ্র দিয়া শাবকের মুখে অর্পণ করে। সেই দিন এই ভাবে গত হয়। পর দিন তথা হইতে যাত্রা করা যায়, পক্ষিমাতা উড্ডীয়মান হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে এবং পূর্ব্বানুরূপ শাবককে আহার যোগায়। জীবনচরিত লেখক বলেন যে, পরে যখন এই সংবাদ আমি প্রাপ্ত হইলাম, তখন খোজাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, তুমি ছানাটিকে পিঞ্জর হইতে উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় করতলে গ্রহণ কর, দেখা যাউক হস্তের উপর আসিয়া শাবকমাতা শাবককে আহার প্রদান করে কি না। তদনুসারে খোজা শাবককে হস্তোপরি ধারণ করিল। পক্ষিমাতা প্রথমতঃ চেঁচাইতে চেঁচাইতে উপস্থিত হইল, কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। পরে অনুরাগ ব্যাকুলতার সহিত খোজার হস্তের উপর ছানাটির পার্শ্বে বসিল এবং তাহার মুখে আহার যোগাইল। এইরূপ নিঃশঙ্কভাবে ছানাকে খাদ্য যোগাইতে যোগাইতে পক্ষীটি বাদশাহী সেনাবৃন্দের সঙ্গে চারি দিনের পথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। পরে ছানা সবল হইল ও তাহাকে সঙ্গে করিয়া উড়িয়া গেল।

প্রস্তাবলেখক ইতিপূর্ব্বে কিয়দ্দিন ঢাকা নগরে কোন বন্ধুর আলয়ে অবস্থিত ছিলেন। তিনি এক দিন দেখেন যে, শালিকদম্পতী দুইটি শাবককে সঙ্গে করিয়া সেই বাড়ীর আঙ্গিনায় খাদ্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। লেখক কয়েক খণ্ড কুচ রুটী ক্রমশঃ সেই পক্ষীর সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। পক্ষিমাতা বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে চঞ্চুপুটে তাহা গ্রহণ করিয়া শাব-

কের মুখে অর্পণ করে। পক্ষিপিতা প্রহরীরূপে পার্শ্বে উপস্থিত থাকে, কোন কাক নিকটে আসিলেই সবেগে তাড়া করিয়া তাহাকে মারিতে যায়। শালিক অপেক্ষা কাক প্রায় দশ গুণ বড় হইবে। সে বল বিক্রমেও শ্রেষ্ঠ, তাহার ধূর্ত্ততা ও চতুরতাও অধিক, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র শালিকটির আক্রমণে কাকের প্রায়ই ক্ষমতা হয় নাই যে ছানার খাদ্যাংশ গ্রহণ করে। শালিকটির দৌরাত্ম্যে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিত। শাবকমাতা ১০ টুকরা রুটি শাবক দুইটির মুখে অর্পণ করিয়া হয়তো এক টুকরা নিজে খাইত। প্রহরিস্বরূপ পক্ষিপিতাও কখন কখন শাবকের মুখে খাদ্য প্রদান করিত, কদাচিৎ তাহাকে নিজে খাইতে দেখা গিয়াছে। লেখকের সেই পক্ষিশাবক-টিকে খাওয়াইতে বিশেষ আমোদ ও কৌতূহল হয়। তিনি প্রতি দিন পাঁচ সাত বার করিয়া এইরূপে রুটির টুকরা বিতরণ করেন। ক্রমে পক্ষিদম্পতীও দাতার প্রতি বিশেষ বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত হয়। দাতাকে দেখিলেই শাবক সহ মহা উৎসাহে দূর হইতে তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া আইসে, এবং পরে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাতার হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া শাবকদ্বয়কে খাওয়াইতে থাকে। কিছু দিন পরে শাবক দুইটি যখন স্বীয় চঞ্চুযোগে খাদ্য কুড়াইয়া লইতে সক্ষম হইয়া উঠিল, তখন আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হইল। ইতিপূর্ব্বে যে পক্ষিদম্পতী নিজে না খাইয়া শাবক দুইটিকে যত্ন-পূর্ব্বক খাওয়াইতেছিল, তাহারা শাব-কের জন্য যেন প্রাণ দেয়, এইক্ষণ তাহার ঠিক বিপরীত ভাব। শাবক দুইটিকে নিকটে আসিতে দেয় না, কখন শাবক চঞ্চুপুটে খাদ্য কুড়াইয়া লইয়াছে দেখিলে পিতা আসিয়া ক্রোধ-ভরে ঠোক্‌রাইয়া তাহার মুখ হইতে তাহা কাড়িয়া খায়, আর তাড়াইয়া তাহাকে মারিতে যায়। রুটি কুচি কুচি করিয়া নিক্ষেপ করিলে সাধ্য কি যে তাহার এক টুকরা দুর্ব্বল ছানা দুইটি গ্রহণ করিতে পারে। মা বাপই সমু-দায় গ্রাস করিয়া বসে, তাহারা নিষ্ঠুর চঞ্চুর আঘাতে ছানা দুইটিকে দূর করিয়া দেয়। শাবক দুইটির প্রতি ইহাদের নির্দ্দয় ব্যবহার দেখিয়া অনেক সময় লেখকের মনে রাগ হইয়াছে। পুরুষ পক্ষীটিই অধিকতর নিষ্ঠুর আচ-রণ করিয়াছে। পরে দুর্ব্বল শাবক-যুগল বাপ মার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, পিতা দেখিলেই মারে, তাহা-দের তাড়না ও অত্যাচারে শাবক দুইটি সেই বাড়ী হইতে এক প্রকার দূরীভূত হয়। যত দিন পক্ষিশাবক দুর্ব্বল ও অক্ষম থাকে, তত দিনই তাহাদের প্রতি পিতামাতার স্নেহ ও যত্ন, বিধাতার এই বিধি ও নিয়ম।

স্ত্রীলোকের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত?

যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে এম এ, বি এ, করিয়া উকীল ব্যারিষ্টার মিউনিসিপাল কমিশনর প্রভৃতি করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকের স্বভাব কিরূপ এবং সংসারে তাঁহার কার্য্য কি তাহা একেবারে অবগত নহেন। ঘোড়াকে দিয়া হাতীর কার্য্য করাইবার চেষ্টা করিলে যেরূপ বিফলযত্ন হইতে হয়, অথবা নীম গাছে আম্র ফলাইবার আশা করিলে যেরূপ নিরাশ হইতে হয়, স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের মত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের দ্বারা পুরুষের কার্য্য করা-ইবার ইচ্ছা যাঁহারা করেন তাহারাও উক্ত রূপ অকৃতকার্য্য হন। কেবল যে অকৃতকার্য্য হন তাহা নহে, যে সমস্ত স্ত্রীলোককে তাঁহারা অযথা শিক্ষা দেন সে সকল নারীকে তাঁহারা না স্ত্রী না পুরুষ—এক প্রকার অদ্ভুত জীব করিয়া তুলিয়া বিষম অনর্থ উৎপাদন করেন। আমরা অনেক বার বলিয়াছি যে, সং-সারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির এক প্রকার স্বভাব ও কার্য্য নহে। আমা-দিগের বিশ্বাস, স্ত্রীজাতির জীবন স্বভা-বতঃ অতি উচ্চ ও পবিত্র; সৌন্দর্য্য ও পুণ্যে স্ত্রী প্রকৃতির ন্যায় সংসারে আর কিছুই নাই। যেমন সূর্য্যের উত্তাপ জগতে সকল অস্বাস্থ্যকর পদার্থ দগ্ধ করে, যেমন গঙ্গা নদী শারীরিক সকল মলিনতা ও উত্তাপ বিনাশ করে, তদ্রূপ স্ত্রীলোক সংসারের সকল দুঃখ সন্তাপ বিদূরিত করেন। অনেকে স্ত্রীলোককে পুরুষের জীবনপথের যষ্টি, সংসার-ভারাক্রান্ত মনুষ্যের মহাবলম্বন ও আশা এবং দুঃখে আহত ব্যক্তির জীব-নের মহৌষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সংসারে জননীরূপে অবতীর্ণা। পুরুষের দুঃখ হরণ, সন্তাপনাশ ও তাহাকে সান্ত্বনা দান স্ত্রীজীবনের মহা-কার্য্য। এ জন্য ভগবান্ তাঁহাকে উপ-যুক্তরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। মাতার সহিষ্ণুতা ও স্নেহের ন্যায় সংসারে কাহার সহিষ্ণুতা ও স্নেহ আছে? এ সম্বন্ধে বাস্তবিকই তিনি তাঁহার জগজ্জননীর প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দ-র্য্যের নিকট গোলাপপুষ্প সময়ে সময়ে পরাস্ত হয় কেন? তাঁহার মধুর ভাষা, সুমিষ্ট স্বর ও সুকোমল স্বভাব দেখিলে মনে হয় এমন দুঃখ কষ্ট মনুষ্য অন্তরে হইতে পারে না যাহা স্ত্রীজাতি দূর করিতে অক্ষম। কোকিলের সুমিষ্ট স্বরে বরং কেহ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের কোমল কণ্ঠের স্বরের সঙ্গীতে চিত্ত মোহিত হয় না এমন ব্যক্তি সংসারে নাই। পুরুষ সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে পরিশ্রম করিয়া গৃহে আসিলেন; তাঁহার মন পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত এবং সংসারের নানা চিন্তা ভাবনায় আহত, তাহার উপর হয়তো

কার্য্যালয়ের প্রভুর অত্যাচার ও ভৎর্সনায় মর্ম্মাহত হইয়া তিনি মৃত্যুকামনা করিতেছিলেন, কিন্তু আসিবামাত্র গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা গুণবতী ভার্য্যার মুখ অবলোকন করিয়া ও তাঁহার মুখের দুটী মিষ্ট কথা শুনিয়া প্রচণ্ড অগ্নিতে জল পড়িলে যেরূপ হয় তদ্রূপ তাঁহার জীবনের দুঃখ ভার একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, তিনি যেন এক নূতন জগতে আসিয়া উপনীত হন। আদর্শ জননী আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মাতা সংসারে না থাকিলে সংসার রক্ষা কখন হয় না। ইউরোপের সভ্যসমাজ যে স্ত্রীলোকের প্রতি এত সম্ভ্রম এবং সমাদর করে তাহা উপরিউক্তরূপ কারণ হইতেই। স্ত্রীলোক না থাকিলে যে পুরুষের জীবন অত্যন্ত ভারবহ হয়, তাঁহার সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দতা থাকে না, তাহা আর বলিতে হয় না। কিন্তু যে স্ত্রীলোক বিবাদ বিসংবাদ দ্বারা সংসারের শান্তি হরণ করেন, তিনি স্ত্রীনামের যোগ্য নহেন। অনেক স্ত্রীলোক সংসারে এরূপ আছেন, যাঁহারা স্বামীর সুখ শান্তির হেতু না হইয়া তাঁহাদের অস্থির ক্লেদ হইয়া উঠেন। স্বামী গৃহে না আসিতে আসিতে তাঁহারা অনবরত বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহার শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে ত্রুটি করেন না। ব্যাঘ্র ভল্লুককে মানুষ যেরূপ ভয় করে, তাঁহারা আপন স্ত্রী দেখিয়া তদ্রূপ ভীত হন। ঈদৃশ নারী কখন নারীনামের যোগ্য নহেন। যে সমস্ত মাতা সন্তানদিগের প্রতি সদা বিরক্ত, সহিষ্ণুতা ও মিষ্ট ব্যবহার কাহাকে বলে তাহা জানেন না, সন্তানদিগকে সর্ব্বদা প্রহার করেন, এবং যাঁহাদের সন্তানগণ তাঁহাদিগকে ভয়ের দৃষ্টি ব্যতীত অন্য চক্ষে দেখিতে পারে না, তাঁহারা কখন জননী নহেন, তাঁহারা বাঘিনী, তাঁহাদের স্ত্রীজন্ম প্রাপ্ত হওয়া বৃথা।

কেবল আপন স্বামী পুত্রদিগের নহে, প্রকৃত নারী সংসারের সকল লোকের দুঃখ দূর করেন। সন্তাপ ও দুঃখহারিণী স্ত্রীলোকের নাম। রোগী রোগযন্ত্রণায় কাতর হইলে কে তাহার শিয়রে বসিয়া গাত্রে হস্ত দিয়া তাহার সমস্ত দুঃখ নাশ করিতে পারেন? কাহার স্নেহ দৃষ্টিতে রোগীর রোগযন্ত্রণা তিরোহিত হয়? মানুষের রোগযন্ত্রনার নাম শুনিলে কাহার হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উথলিত হয়? কে মাতার ন্যায় রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে পারেন, এবং অনুপম স্নেহ ও যত্নে তাহার উপযুক্ত পথ্য প্রস্তুত করিতে সক্ষম? মনুষ্যের রোগযন্ত্রণার কথা শুনিলে কেবল নারীর অন্তরেই স্নেহ ও দয়া উদ্দীপ্ত হয়। আহতদিগের ও রোগীদিগের সেবার অনুরোধে কেবল তিনিই রণক্ষেত্রের বিপদ সকলকে তুচ্ছ ও নিজ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনিই এ জন্য আত্মীয় স্বজনদিগকে ত্যাগ করিয়া বিদেশকে স্বদেশ ও অপরিচিতদিগকে আত্মীয় করিতে পারেন। তিনি কঠোর চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া চিরবৈরাগিণী হইয়া থাকেন। পরদুঃখ দূর করাই তাঁহার সুখ সচ্ছন্দতা গৃহ সংসার সকলি। তিনি যখন উৎসাহের সহিত স্নেহে বিগলিত হইয়া রোগীকে শুশ্রূষা করিতে ব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁহাকে রোগীর জননী বলিয়া সম্ভাষণ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার ঠিক বিপরীত অস্বাভাবিক প্রকৃতির স্ত্রীলোক কত আছেন, যাঁহারা প্রতিবাসীর পীড়ার কথা শ্রবণ করিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করেন। অনেক এরূপ স্ত্রীলোক আমরা দেখিয়াছি, যাঁহারা এক ব্যক্তির কঠোর রোগ বা মৃত্যু হইয়াছে শুনিলে মুখে "দুর্গা" "দুর্গা" বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যান। তাঁহারা রোগ বা মৃত্যুকে অতিশয় ভয় করেন। রোগ বা মৃত্যু দেখিলে বা তাহার কথা শুনিলে তাঁহাদেরও রোগ বা মৃত্যু হইবে তাঁহারা এরূপ মনে করেন। অনেক স্ত্রীলোক রোগীকে অর্থ দান করিতে পারেন, কিন্তু রোগীর সেবার নামে ভীত হন। এরূপ ব্যবহার স্ত্রীপ্রকৃতির বিরুদ্ধ এবং এরূপ স্বভাব স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত অস্বভাবিক।

দীন দুঃখীর প্রতি যে নারীর দয়া নাই তিনি স্ত্রীলোক নামের উপযুক্ত নন। অন্নবস্ত্রহীন এবং পিতৃমাতৃহীনদিগের জননী স্ত্রীলোক ব্যতীত এ সংসারে আর কে আছে? মহামতি মিস্ কার্পেণ্টরের দৃষ্টান্ত চিরকালই এ সম্বন্ধে নারী প্রকৃতির আদর্শরূপে প্রকাশিত থাকিবে। যাহাদের সংসারে কেহ নাই, সহৃদয়া নারীই তাহাদের সর্ব্বস্ব। যখন তিনি অর্থ সামর্থ্য দিয়া কোন সহায়তা করিতে অক্ষম অথবা অন্য কোন প্রকারে উপকার করিতে অপারগ তিনি দুঃখিনী বিধবার এবং পিতৃমাতৃহীণ অবগণ্ডের দুঃখের কাহিনী সহানুভূতির সহিত শ্রবণ করিতে করিতে অশ্রুবর্ষণ করিতে ক্ষান্ত নহেন। তিনি যখন তাঁহাদিগের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন এবং দুঃখহারী দীনবন্ধু তাহাদের একমাত্র সহায় ও আশ্রয় স্থান বলিয়া বিশ্বাস ও আশার সহিত নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তখন প্রত্যক্ষ স্বর্গের শোভা তথায় অবতীর্ণ হয়। দুঃখী সন্তানের জন্য স্বহস্তে বস্ত্র বা অপরাপর পরিধেয় প্রস্তুত করিয়া দিতে কেবল সহৃদয়া নারীরই উৎসাহ ও আনন্দ হয়। এ জন্য তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া এবং অনাহারে কত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। আপনার সন্তানদিগকে ভাল খাওয়াইলে ভাল পরাইলে যে তৃপ্তি সুখ না হয়, দুঃখীর সন্তান ও দুঃখিনী বিধবাকে খাওয়াইয়া ও পরাইয়া তিনি সে তৃপ্তি সুখ অনুভব করেন। দুর্গাপূজায় অন্য লোকে আপনাপন সন্তানদিগের নূতন বস্ত্র আহরণ চেষ্টা করেন, কিন্তু দয়াশীলা

নারী রজনীতে শয্যাশায়ী হইয়া দুঃখী প্রতিবাসীর সন্তানের বস্ত্রের ভাবনা ভাবিতে থাকেন। আমাদিগের ভারতেশ্বরী দয়াশিলা নারীচরিত্রের আদর্শ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশে এরূপ বিকৃতস্বভাব স্বার্থপর নারীর সংখ্যা অল্প নহে, যাহারা দুঃখীর দুঃখের কাহিনী শুনিলে বা তাহাদের কষ্ট চক্ষে দেখিলে তাঁহাদের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, তাহারা তাঁহাদের দ্বারস্থ হইলে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে করিতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, ভিখারী দেখিলে সর্ব্বাগ্রে দ্বার রুদ্ধ করেন। তাঁহারা সকলি সহিতে পারেন, কিন্তু অপরের দুঃখের নাম গন্ধ সহ্য করিতে অক্ষম হন। দারিদ্র্য ও দুঃখের নামে তাঁহারা অত্যন্ত ক্রোধ ও ঘৃণা অনুভব করেন। এরূপ নারী যে স্ত্রীকুলের কলঙ্ক, অত্যন্ত অস্বাভাবিক জীব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আজকাল এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অনেক উন্নতি হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে বিকৃত শিক্ষা দিয়া কেবল পুরুষেরই মত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। রাশি রাশি অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের মস্তিষ্ককে বিলোড়িত ও প্রপীড়িত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে চিররুগ্ন অকর্ম্মণ্য করা হইতেছে। তাহাদিগের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক লইয়া কেবলই টানাটানি করা হইতেছে। কয় জন লোক মনে করিয়া থাকেন যে স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার হওয়া আবশ্যক? স্ত্রীগণ সুকোমল ও উচ্চপ্রকৃতি লইয়া সংসারে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের প্রেম স্নেহ দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের যথোচিত উন্নতি হয়। তাহাদিগকে অন্যান্য শিক্ষা দিবার বিরোধী আমরা নহি, কিন্তু আমাদিগের এই বক্তব্য যে, যেমন মানসিক শক্তি ও উদ্যম উৎসাহকে অগ্রগণ্য করিয়া পুরুষদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, তেমনি নারীজাতির শিক্ষায় তাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাবের বিকাশ চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে, তাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাবনিচয়কে অগ্রগণ্য করিতে হইবে। যে শিক্ষায় স্ত্রীলোক আদর্শজননী আদর্শ স্ত্রী হইতে পারেন দয়া কোমলতাতে ভূষিতা হইয়া নিজ গৃহেরও সংসারের দুঃখ কষ্ট নাশ করিতে পারেন তাহাই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী।

রন্ধন শিক্ষা।

রসগোল্লা।

প্রথমতঃ ছানা এক খানি মোটা কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, পরে তাহার জল বাহির হইয়া গেলে উক্ত ছানায় কর্পূরের গুঁড়া এবং ছোট এলাইচের গুঁড়া দিয়া উত্তমরূপে ফেনাইয়া লইতে হয়, তাহার পর উক্ত ছানার

ঠুসী প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে আস্ত ছোট এলাইচের দুই একটি দানা এবং একটু আতর দিয়া ঠুসীর মুখ বন্ধ করিয়া গোল্লা প্রস্তুত করিতে হয়। এদিগে জ্বালে পাকপাত্র চড়াইয়া তাহাতে চিনির পরিমাণ অনুসারে জল দিয়া একটু দুগ্ধের ছিটা দিয়া তাহার গাদ সকল ছাঁকিয়া ফেলিতে হয়, পরে যখন রস বেস চট্‌চটে রকম হইয়া আসিবে তখন তাহাতে উক্ত ছানার গোল্লা গুলি ছাড়িয়া দিতে হয়। রশ একেবারে চট্‌চটে না হইয়া যায় সেজন্য মধ্যে মধ্যে জলের ছিঠা মারিতে হয়, এবং উপযুক্ত মত পক্ক হইলে রসগোল্লা গুলি রসে ডুবিয়া যাইবে। *

দুজন নয় একজন।

শরীর, মন ও আত্মা এই তিন লইয়া নরনারী। শরীরের কথা কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না। মন ও আত্মার ভিন্নতা কি একটু বলিয়া দেওয়া উচিত। এক দিক্ দিয়া দেখিলে মন ও আত্মা একই সামগ্রী, কিন্তু বুঝিবার সাহায্য হয় এ জন্য মন ও আত্মাকে পৃথক্ করিয়া দেখা আবশ্যক। বাহিরের বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদের সঙ্গে মনের যোগ। মন জ্ঞানের অধিষ্ঠান স্থান। মন আছে বলিয়াই শরীরের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। বিষয়ের সঙ্গে মনের যোগ বলিয়াই দিন দিন মনের বিষয়জ্ঞান বাড়িতে থাকে। যখন প্রয়োজন হয়, তখনই মন এই সকল জ্ঞান আনিয়া উপস্থিত করে। শরীর ও মনের অতীত যে সকল বিষয় আত্মা সেই সমুদায় লইয়া ব্যস্ত। ঈশ্বর ও পরলোক ইহার অধিকারের বিষয়। দাম্পত্য মধ্যে শরীর, মন ও আত্মা এ তিনেরই যোগ আছে। যত প্রকারের সম্পর্ক আছে, দম্পতীর সম্পর্ক এই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

নর ও নারী এ উভয়ের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ আছে যে, এক জন আর এক জনকে অন্বেষণ করে। যত দিন উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ না হয়, তত দিন নরনারী নিজ নিজ অর্দ্ধ কোথা হইতে আসিবে, অত্যন্ত ব্যগ্রতা-সহকারে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই আকর্ষণ শরীর, মন ও আত্মা এই তিন হইতে উপস্থিত হয়। কাল দেশ শিক্ষা প্রভৃতি অনুসারে হয় শরীর, নয় মন, নয় আত্মা, এই আকর্ষণে প্রধান কারণ হয়। যেখানে শরীর প্রধান, সেখানে দাম্পত্য অস্থায়ী। যত দিন শরীর সুস্থ থাকে, ভোগের উপযুক্ত থাকে, তত দিন দাম্পত্যবন্ধন থাকে। দুজনের এক জন রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে বা মৃত্যুমুখে নিপ-

* ভিক্টোরিয়া কলেজের জনৈক ছাত্রির লেখা।

তিতে হইলে আর এক জন আবার পূর্ব্ববৎ নিজের সঙ্গীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। ইটি পশুসম্বন্ধে, কেন না পশুরাই এইরূপ অনিয়ত দাম্পত্যবন্ধনে আপনাদিগকে বদ্ধ করিয়া থাকে।

আমরা শারীরিক আকর্ষণের প্রাধান্যের কথা যেমন উল্লেখ করিলাম, মনের আকর্ষণের প্রাধান্যও সেইরূপ দৃষ্ট হয়। সভ্যসমাজে যে দাম্পত্যসম্বন্ধ উপস্থিত হয়, সেখানে মনের আকর্ষণ প্রধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধন মান ঐশ্বর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি গুণগ্রাম প্রভৃতি এখানে এক জনকে আর এক জনের প্রতি আকৃষ্ট করে। এখানে সমানে সমানে বিবাহ হয়, সমানে অসমানে বিবাহ অল্পই ঘটিয়া থাকে। সমানে সমানে বিবাহের অর্থ ইহা নহে যে, সকল বিষয়ে দুজনে সমান, কিন্তু হরে দরে সমান। এক জনের হয় তো খুব ধন আছে, আর এক জনের বিদ্যা আছে, এইরূপে সমান হইলেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ হয়। এখানে শারীরিক সৌন্দর্য্য সুস্থতা ও সবলকায়ত্বের আদর নাই তাহা নহে, কিন্তু শরীরের প্রাধান্যের সময়ে যেরূপ এই সকলই একমাত্র আকর্ষণের বিষয় ছিল, এখন আর তাহা থাকে না। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কিছু কিছু গুণ এমন থাকা চাই যাহাতে পরস্পর আকৃষ্ট হইতে পারে। মানসিক আকর্ষণে যে দাম্পত্য উপস্থিত হয়, তাহা শারীরিক আকর্ষণ অপেক্ষা স্থায়ী। এক জন ইহলোক হইতে অপসৃত না হইলে প্রায় আর এক জন দ্বিতীয় সঙ্গীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় না।

আমরা মনকে আত্মা হইতে এই বলিয়া পৃথক্ করিয়াছি যে, মন ইহলোকের বিষয় অন্বেষণ করে, ইহলোকের বিষয় হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করে, সুতরাং তাহা হইতে যাহা কিছু হয়, তাহা ইহলোকের ব্যাপারেই পর্য্যবসান হয়। এক আত্মার আকর্ষণে অপর আত্মা যখন দাম্পত্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, তখন সে বন্ধন আর কিছুতেই ছিন্ন হয় না। মানুষ যখন পশু ছিল, তখন নরনারীর বন্ধন পশুসমুচিত বন্ধন ছিল, যখন সে মনুষ্যত্ব লাভ করিল, তখন সে বন্ধন মানসিক ব্যাপার হইল। কিন্তু যখন সে দেবত্বলাভ করিল, তখনকার বন্ধন দেবালোকব্যাপী অমরধামের উপযোগী হইল। মানুষের যখন শরীর আছে, মন আছে, আত্মা আছে, তখন দাম্পত্যবন্ধনে তিনেরই যথোপযুক্তরূপে একত্র অবস্থান স্বাভাবিক।

দাম্পত্যে পরস্পরের প্রতি অধিকার এত বিস্তৃত কেন? যে কোন শাস্ত্র পাঠ করা যাউক, তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, পতির পত্নীর প্রতি, পত্নীর পতির প্রতি অধিকারের পরিমাণ নাই। এরূপ অধিকারের হেতু কি ইহা নির্দ্ধারণ হইয়া তৎপর এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কথা বলা অপেক্ষা এই কথা বলা

ঠিক যে, প্রকৃতি স্বয়ংই এই ব্যবস্থার মূল। নর ও নারী এ দুজন যে দুজন নয় এক জন, প্রকৃতি আপনি ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। এক জনে সংসার কেবল অচল হয় তাহা নয়, এক জনে সংসার হয়ই না। বিবাহবন্ধন সংসারের মূল বলিয়া নরনারী চির কাল একত্র মিলিত হইয়াছেন, প্রকৃতি তাঁহাদিগকে একত্র মিলিত করিবার জন্য সর্ব্বথা সহায়তা করিয়াছেন। যখন শরীর প্রধান, তখনও এই কারণে নরনারী একত্র হইয়াছেন, যখন মন প্রধান, তখনও এই জন্য দুজন একত্র হন। ভগবান্ যাহাদিগকে এক করিয়াছেন, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে সাধ্য কার। শরীর ও মনের সম্বন্ধ অনেকটা সুখ সুবিধার জন্য হইতে পারে, কিন্তু আত্মায় আত্মায় যে সম্বন্ধ ইহাতে সাংসারিক সুখ বা সুবিধার লেশমাত্রও নাই। বরং এখানে এক জনের বিরহে যখন আর এক জন সংসারের সুখ চির দিন বিসর্জ্জন দেন; আজও আমার পতি বা পত্নী আছেন, তিনি ও আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি, আমাদের তো বিচ্ছেদ হয় নাই, এই বলিয়া শরীর সম্বন্ধে একা থাকিয়াও আহ্লাদে সংসারে জীবন কাটান, তখন কে বলিবে যে, এ স্থলে পার্থিব ভোগাদির গন্ধমাত্র আছে। নরনারীর এইরূপ সম্বন্ধই যথার্থ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ ঘটিবার জন্যই তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে। নারীপ্রকৃতি নরপ্রকৃতি দুই একত্র মিশিয়া পূর্ণাকার ধারণ করে। এই দুই প্রকৃতির যোগ হইয়া যখন একটি পূর্ণ আত্মা হইল, তখন সেই আত্মা মহান্ আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া যায়। পরিচারিকা এ কথা বিস্তৃতরূপে বলিবার স্থান নয়, সুতরাং এ কথা এই পর্য্যন্ত।

আমরা বলিয়াছি, নরনারীর পস্পরের প্রতি এমন একটি আকর্ষণ আছে যাহাতে এক আর এক জনকে যত দিন না পায়, তত দিন স্থির থাকিতে পারে না, এক অপরকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করে। কেন বাহির করে, এখন আমরা খানিকটা বুঝিলাম। যে যাহাকে না পাইলে পূর্ণ হয় না, সে তাহাকে যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ স্থির থাকিবে কিরূপে? আমাদের শরীরের উপাদান ক্ষয় পাইয়া শরীর যখন ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন সেই ক্ষয় পূরণের জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এই ব্যাকুলতার নাম ক্ষুধা। এ ক্ষুধা আর কিছুই নয়, অপূর্ণাবস্থাকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রকৃতির ব্যস্ততা। নরপ্রকৃতি নারীপ্রকৃতি একা একা যখন স্থিতি করে তখন অপূর্ণ, সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করিবার জন্য প্রকৃতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ রহিয়াছে। এই পূর্ণতা বিনা যখন দেবত্বলাভের সম্ভাবনা নাই, তখন এই আকর্ষণকে প্রবলতর করিবায় জন্য শরীর মন, আত্মা এ তিনেতেই আকর্ষণের হেতু স্থাপিত হই-

য়াছে। যদি প্রথমে শরীরের আকর্ষণ প্রবল থাকে, অল্পদিনের মধ্যে মন আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দেয়, পরে দম্পতী বয়সে যত অগ্রসর হইতে থাকেন, তত আত্মা পরস্পরের সম্বন্ধের নিত্যতা দেখাইয়া দিয়া দুই জনকে চিরকালের জন্য এক সূত্রে বান্ধিয়া ফেলে।

দম্পতীর শরীর, মন ও আত্মা, এ তিনেরই সম্বন্ধ অতি পবিত্র, কেন না একটি অপরটির সোপান হইয়া পরিশেষে দুই আত্মাকে এক করিয়া ফেলে। দম্পতীর মধ্যে নিত্য অব্যভিচারী প্রেম স্থিতি করিবে। শোচনীয় তাহাদিগের অবস্থা যাহারা দম্পতীর কোন এক জনকে আপনার দিকে সভ্যব্যবহারচ্ছলে আকর্ষণ করিয়া উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রেমকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। ইউরোপ এ অপরাধে অত্যন্ত অপরাধী, আমাদের চক্ষে এ অপরাধ গুরুতর অপরাধ। দম্পতীর অব্যভিচারী প্রেম কিছু মাত্র না টোটে, এ বিষয়ে আমরা সর্ব্বদা অবহিত থাকিব। উভয়ে উভয়ের প্রেমে গলিয়া এক হইয়া যাইবেন, এ বিষয়ে সাহায্য করিতে আমরা কখন ত্রুটি করিব না। উভয়ের বিগলিত প্রেম দেখিয়া যাহারা ঈর্ষান্বিত হয়, তাহারা ভর্ৎসনার পাত্র। এক অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুজনে এক জন হইবেন যখন এই নিয়তি, তখন দম্পতীর প্রগাঢ় প্রণয় দেখিয়া আমরা কেনই বা হৃষ্ট হইব না? যাহারা দম্পতীর বিচ্ছেদের কারণ হয়, তাহারা ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের নিকট দণ্ডার্হ। ধর্ম্মের নাম করিয়া ব্রত বা বিধির নাম করিয়া যাহারা পতিপত্নীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে বা পরস্পরের প্রতি প্রণয়কে অপবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করে, তাহারা কখন নিরপরাধ নহে।

তবে পাঠিকা বলিবেন দম্পতীর প্রণয়ের মধ্যে কি মায়া নাই, দোষের কিছুই নাই? থাকিবে না কেন? আছে, কিন্তু অপ্রণয় ঔদাসীন্য এস্থলে যেমন মারাত্মক, মায়া তেমন নয়। এ মায়া উচ্চধর্ম্মসাধনের বিঘ্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা নরনারীকে পাপ হইতে রক্ষা করে। যদি পাপ হইতে রক্ষা হইল, তবে কালে উহা যে উচ্চ ধর্ম্মের সহায় হইবে তাহার পথ পরিষ্কার রহিল। তাই আমরা দম্পতীর প্রণয়কে পবিত্র বলি। এই প্রণয়ে দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকিলে দিন দিন শরীরের সম্বন্ধ মনের সম্বন্ধে, মনের সম্বন্ধ আত্মার সম্বন্ধে পরিণত হয়। এক প্রণয় দ্বারা যখন এই মহৎ কার্য্য সাধিত হয়, তখন আমরা দম্পতীর প্রণয়কে কেন সামান্য মনে করিব। দুজনে এক জন হওয়া যখন উভয়ের নিয়তি, তখন এমন কোন কারণ নাই যাহাতে দুজন বিচ্ছিন্ন হইলে উহা বিধিসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এক বার যখন দুজন মিলিত হইয়াছেন, চিরকাল দুজনে মিলিত থাকিবেন যে, দুজনে একজন

হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে নরনারীর মধ্যে কে ছোট কে বড় এ প্রশ্নই আসিতে পারে না। ইনি অর্দ্ধ উনি অর্দ্ধ, দুই অর্দ্ধে পূর্ণ এক, এখানে ছোট বড় এ কথা উঠিবে কেন? পতি, তুমি পিতা হইতে পার মা হইতে পার না, মাতা, তুমি মা হইতে পার পিতা হইতে পার না, এ কথা তো তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। পত্নী, তুমি যে গুণে তোমার পতিকে বশীভূত কর, পতি, তুমি যে গুণে তোমার পত্নীর নির্ভরস্থল হও, তোমরা সে দুই গুণের বৈশিষ্ট্য কি বুঝিয়া উঠিতে পার না? তোমাদের একা এক জনে কেবল সংসার অচল তাহা নহে জীবন ভারবহ, ইহা কি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছে না? অতএব কেহই গর্ব্ব করিও না, কেহ কাহাকেও তুচ্ছ করিও না, দুজনে মিশিয়া এক জন হইয়া যাও, ইহকাল পরকালে সুখী ও কৃতার্থ হইবে। দৈবযোগে তোমাদের দুজনের একজন অগ্রে স্বর্গগত হইলে যদি তোমরা তখনও প্রণয়ে একজন হইয়া না থাকিতে পার, তবে তোমাদের জীবনে ধিক্। আমরা দেখিতে চাই, নরনারী অভিন্নহৃদয়, অভিন্নচিত্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিলেই আমাদের কৃতার্থতা, ইহা দেখিবার জন্য আমরা প্রতিনরনারীর মুখপানে তাকাইয়া আছি।

প্রাপ্ত।

বঙ্গনারী।

১

শিক্ষিতা বঙ্গের নারী, বিদ্যা উপার্জ্জন করি,
কুরুচি কুসংস্কার, গিয়াছে চলিয়া।
সুরুচির আভরণে, সেজেছেন সযতনে,
নূতন নূতন তর, বেশেতে শোভিয়া।

২

বৃথা সে সকল শোভা, যদি ধরমের আভা,
কোমল রমণী হৃদে, নাহি উজলয়।
সুসজ্জিত গৃহ মাঝে, নানাবিধ দ্রব্য সাজে,
কি শোভা তাহার, যদি অন্ধকার হয়?

৩

পুণ্যের প্রদীপ জ্বালো, অন্ধকারে কর আলো,
শত শত গুণে তব, সৌন্দর্য্য বাড়িবে।
তুমি স্বরগের ছবি, তোমারে দেখিয়া দেবী,
পৃথিবীর নর নারী, মোহিত হইবে।

৪

ওগো বঙ্গকুলনারী, তোমারে বিনয় করি,
দুঃখিনী একটি আজি, করে নিবেদন।
তোমরাই শুদ্ধমতি, গৃহলক্ষ্মী সাধ্বী সতী,
ধরমই তোমাদের অপূর্ব্ব ভূষণ।

৫

যতনে ধরম রাখ, নির্ম্মল অন্তরে থাক,
পবিত্র জ্যোতিতে তব জ্বলুক নয়ন।
আলস্যেতে কাল হরি, বৃথা বেশভূষা করি,
এন না জীবনে, দেবী, কলঙ্ক কখন।

৬

সতত ঈশ্বরে স্মরি, তাঁহার আদেশ ধরি,
চলিও জীবনপথে, ধর্ম্মভীতা নারী।
সদা শুদ্ধচিত্ত হয়ে, প্রেম উপহার দিয়ে,
পূজিও গো প্রতিদিন চরণ তাঁহারি।

৭

বিনয় নম্রতা ধর, সাধু সহ বাস কর,
হইবে জীবন দেবী সফল তোমার।
মলিনতা দূরে যাবে, হৃদয় পবিত্র হবে,
সাধকজীবনে পাবে উপদেশ সার।

৮

ঘোর অন্ধকার মাঝে, উজ্জ্বল তারকা রাজে,
বিপন্ন পথিকে যথা, আলোক দেখায়।
তেমনি ধার্ম্মিক জনে, বিভ্রান্ত মানবগণে,
সংসারের অন্ধকারে সুপথ ধরায়॥

৯

করিওগো প্রাণপণ, করিতে অনুকরণ,
সাধক জীবন, দেবী, বড় মধুময়।
সাধুকে বিশ্বাস কর, সম্মুখে আদর্শ ধর,
তোমারো অন্তর হবে পুণ্যের আলয়।

১০

ধর্ম্মের ভূষণে নারী, হয় বড় মনোহারী,
যতন করিও সেই ভূষণ পরিতে।
পবিত্রা নারীর কাছে, কাহার তুলনা আছে,
শত শত সুন্দরী না পারে দাঁড়াইতে।

১১

হয়ে ঈশ্বরের দাসী, নীচ সুখে অভিলাষী,
বিলাস বিকারে, দেবী, থেক না ডুবিয়া।
তোমার আননে সতী, যেন ধরমের জ্যোতি,
বিভাষিত করি মুখ থাকে উজলিয়া।

১২

হে নারী অবনীতলে, তারে বীর নারী বলে,
ঈশ্বরের অনুরাগে পূর্ণ যাঁর মন।
শোক দুঃখে বিচলিত, হয় না যাঁহার চিত্ত,
নিকটে প্রভুরে নিজ করেন দর্শন।

১৩

জগত জীবনাধার, চির প্রেমাস্পদ যাঁর,
দুর্ব্বলতা মলিনতা তাঁরে না পরশে।
পবিত্রচরিত্রা নারী, ঈশ্বরে নির্ভর করি,
থাকেন মগন সদা অপূর্ব্ব হরষে।

১৪

করি পুনঃ নিবেদন, হারা'ও না ধর্ম্মধন,
পুণ্যতেজে বীরনারী থেক চির দিন।
বিলাসবাসনা ত্যাগি, হয়ে ধর্ম্ম অনুরাগী,
পরমেশপূজা দেবী কর প্রতি দিন॥

এক জন মহিলা।

রজনী।

১

জীবশ্রান্তিবিনাশিনী তমিস্রা রজনী,
কি আশ্চর্য্য শক্তি তুমি ধরিছ নিশ্চয়,
আরাম বিধান জীবে সন্তাপনাশিনী
হইয়াছ তুমি চির সবে সুখময়।

২

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বিস্তৃত ভুবনে
দিবসের শ্রান্তি-দূর করিবার তরে,
পরিশ্রান্ত কৃষীদলে কুটীরভবনে
কি বা সুখ দাও তুমি তৃণশয্যাপরে।

৩

প্রান্তরে পথিক ক্লান্ত তব আগমনে
ধূলাসনে শয়নেতে আরাম সে লভে,
তরঙ্গসঙ্কুলসিন্ধু-পোত বাসিগণে
ঘুমায় তোমার ক্রোড়ে দিনান্তে নীরবে।

৪

পুত্র-শোকাতুরা মাতা বিধবা রমণী
জীবনসর্ব্বস্ব ধনে-হারাইয়া হায়!
তব আগমনে, অয়ি কুহকি রজনি
ভুলি সব শোক তারা আরামে ঘুমায়।

৫

নিদ্রিত ভিখারী জন নিদ্রার ঘোরেতে
স্বপনকুহকে লভে নৃপসিংহাসন,
ভিখারী ভূপতি হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি হতে
বিরত সে জন চির-বিলাসী জীবন।

৬

কুহকী স্বপন তার কুহকমন্ত্রেতে,
প্রকাশে সুষুপ্ত জীবে স্বপ্ন অগণন
পক্ষহীন নরে উড়ে বিমান পথেতে
কভু বিভীষিকা কভু সুখ দরশন।

৭

অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল রজনী তোমার
করিব কল্পনাস্রোতে নীরব সময়ে
বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বে তার
নিদ্রা-শূন্য তবু রয় আনন্দহৃদয়ে।

৮

ধন্য, ধন্য তিনি যিনি জীবের মঙ্গলে
করেছেন তব সৃষ্টি কৃপায় তাঁহার,
ধন্য শক্তি তাঁর যাঁর করুণা সকলে
প্রতি দিন প্রদর্শিত জীবনে সবার।

শ্রীগো

স্বর্ণরেণু।

নিরাশার ন্যায় জীবনের শত্রু নাই, নিরাশ হইলে কি, আর তোমার উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

আমরা কয় জন? যাহারা বলে আমরা পাঁচ জন বা দশ জন, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু কি প্রকারে বলিব। এখনও শত্রু আছে। শত্রু না থাকিলে ভিন্নতা কেন?

তুমি বলিতেছ, এ সংসার বড়ই দুঃখের স্থান। দুঃখ তোমার মনে, না বস্তুতই বাহিরে দুঃখ আছে। তুমি বলিতেছ, রোগ শোক বিপদ দুঃখ অনেক। রোগ শোক বিপদ্ দুঃখকে যত দিন তুমি বন্ধু বলিয়া বরণ করিতে পারিবে না, তত দিন ভ্রম ঘুচিবে না, সুখও হবে না।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৭ সংখ্যা।] কার্ত্তিক, সন ১২৯৫। [১১ খণ্ড।

দুই বন্ধু।

যশোবন্ত রাও এবং প্রতাপ রাও দুই বন্ধু। বাল্যকাল হইতে উভয়ের অকৃত্রিম সৌহৃদ্য। সে প্রণয় আজীবন ছিল— উভয়ের পিতা প্রতিবাসী, এক দেশ নিবাসী, বয়োবৃদ্ধির সহিত দুই বালকের বাল্যবন্ধুতা গাঢ়তর হইল। শৈশবের সরল নির্দ্দোষ ভালবাসা যৌবনের গভীর দৃঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল। বালক যশোবন্ত এবং প্রতাপ একত্র ক্রীড় করিত, একত্র যমুনাতীরে বসিয়া নৌকা-শ্রেণী গণনা করিত, অনিলতরঙ্গের ক্রীড়া দেখিত, একত্র বৃক্ষে উঠিয়া ফল পাড়িত, পক্ষিনীড় হইতে পক্ষি-শাবক পাড়িয়া আনিত। কিশোরবয়স্ক হইলে উভয়ে একত্র বিদ্যাভ্যাস করিত পুস্তকে আর্য্যজাতির বীরত্বের কাহিনী পড়িয়া তাহাদের হৃদয় উষ্ণ উৎসাহিত হইত, বড় হইয়া তাহারা বীর হইবে, যুদ্ধে গিয়া শৌর্য্য প্রকাশ করিবে, এই গল্প অনেক সময় করিত। এই সময় আর একটি নূতন লোক আসিয়া তাহাদের প্রতিবাসী হইল। সে ব্যক্তি ব্রহ্মচারিবেশধারী, তাহার সঙ্গে একটী মাত্র সুকুমারী বালিকা, সে তাহার কন্যা। ব্রহ্মচারী নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে পুণ্যভূমি প্রয়াগে আসিয়া বাস করিতে মানস করিয়াছে। কিছু দিন এক স্থানে বাসের পর যশোবন্ত এবং প্রতাপের পিতার সহিত ব্রহ্মচারীর বিলক্ষণ সম্প্রীতি হইল। দুই বালক অনেক সময় ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়া নানা দেশের বর্ণনা, নানা ঘটনা-কাহিনী অনন্যমনে শুনিতে ভালবাসিত এবং মধ্যে মধ্যে বালিকা দুর্গার সহিত ক্রীড়া করিত। দুর্গার একটি ক্ষুদ্র হরিণশিশু ছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সে উভয় বালকের সহিত নদী-তীরে বেড়াইতে যাইত, বনে গিয়া নানা বনফুলপত্র দিয়া বালকেরা হরিণ শাবককে সাজাইত, দুর্গা দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিত। কখনও বা সুরভি কুসুমরাশি চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া বালিকাকে সাজাইত। সুন্দর পক্ষিশাবক ধরিয়া তাহাকে আনিয়া দিত। এখন দুই বালকেরই প্রয়াস হইল, দুর্গাকে কে আমোদিত করিতে পারে। যশোবন্তের পিতার এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল। অপরাহ্ণে দুই

জনে বালিকা দুর্গার সহিত যমুনাবক্ষে সেই তরণীযোগে বিচরণ করিত। যেখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হইয়াছে, যমুনার ঘন কৃষ্ণ জলের সহিত গঙ্গার শুভ্র তরল জল মিশিয়াছে, সেখানে নৌকা লইয়া যাইত। তাহার বিচিত্র শোভা দেখিয়া বালিকার কত আনন্দ হইত। এইরূপে সুখের কৈশোর কাল কাটিয়া গেল। দুই বালক যৌবনে পদার্পণ করিল। উভয়ে গৌরবর্ণ সুপুরুষ. কিন্তু যশোবন্ত অধিক দীর্ঘায়ত প্রশস্তবক্ষ ও বলিষ্ঠ। বালিকা দুর্গাও এখন আর বালিকা নহে। সে এখন বাল্যযৌবনের সন্ধিস্থলে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার মুখে বালিকাসুলভ সারল্যের সহিত যৌবনের ব্রীড়াসৌন্দর্য্য মিশ্রিত হইয়াছে। বালিকা আর ছুটিয়া ছুটিয়া যশোবন্ত এবং প্রতাপের সহিত ক্রীড়া করিতে যায় না। আর তাহাদের সহিত নদীবক্ষে বিচরণ করে না, আর বৃক্ষতলে তলে চঞ্চলপদে ভ্রমণ করে না। সে উভয় যুবার সহিত ভগিনী তুল্য আলাপাদি করে, কিন্তু যেন একটু সঙ্কুচিত ভাবে।

উভয় বন্ধুর অনেক দিনের ইচ্ছা, যুদ্ধ করিয়া বীর্য্য শৌর্য্য প্রকাশের সাধ পূর্ণ করে। তৎকালে মুসলমানদের সহিত মহারাষ্ট্রকুলগৌরব শিবজীর সংগ্রাম চলিতেছিল। উভয়ে পিতা মাতার আদেশ লইয়া তাঁহার অধীনে সৈনিক পদ গ্রহণ করিল। যাত্রাকালে উভয়ে দেবীমন্দিরে গিয়া বিধিমতে পূজা করিল। পরে পূজান্তে দেবীসম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিল যে. সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, জীবন মৃত্যুতে উভয়ে উভয়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু হইয়া থাকিবে, উভয়ে উভয়ের সুখ অন্বেষণ করিবে, পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরকে বলিবে, এবং পরস্পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিবে। এইপ্রকার শপথ করিয়া প্রসাদী ফুল মস্তকে ধারণ করিয়া উভয়ে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রস্থান করিল।

দুই বৎসর অতীত হইলে, যুবাবীরদ্বয় যুদ্ধে জয়শ্রী লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, উভয়ের কত আনন্দ, গৃহে পিতা মাতার কত আনন্দ। পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পর দিন উভয়ে বাল্যসঙ্গিনী দুর্গার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দেখিলেন দুই বৎসরের মধ্যে বালিকা দুর্গা যৌবনের রূপ লাবণ্য লাভ করিয়াছে। নূতন দেশের নানা ঘটনা যুদ্ধের নানা কাহিনী বলিয়া তাহারা দুর্গা এবং তাহার পিতার মনোরঞ্জন করিলেন। পরে উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া চিরপরিচিত যমুনাতীরে গমন করিলে তাঁহাদের সেই বাল্যকালের ক্রীড়া স্থান সকল দেখিয়া মনে কত আনন্দই হইতে লাগিল। যমুনাতীরে এক বৃহৎ দেবদারুতলে উভয় বন্ধু উপবেশন করিয়া শীতল সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিতে করিতে

নদীর শোভা তরঙ্গের ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রতাপ বলিলেন, "ভাই যশোবন্ত, তোমাকে আমি সকল কথাই বলিয়াছি। আমার হৃদয়ের কিছুই তোমার নিকট গোপন নাই, কিন্তু আমার প্রাণের একটি কথা আজ পর্য্যন্ত ভগবান্ ভিন্ন কেহই জানেন না। আমি এক জনকে ভালবাসি, সে ভালবাসা বন্ধুতা অপেক্ষাও অধিক গভীর।" যশোবন্ত সিংহের মুখে প্রথমে বিস্ময় পরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল। আরক্তিম বদনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ, তুমি কাহাকে ভালবাস?" প্রতাপ বলিলেন, আমি কতকাল হইতে দুর্গাকে ভাল বাসিয়াছি জানি না, বুঝি যত দিন তাহাকে জানিয়াছি তত দিনই ভালবাসি। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে হঠাৎ সে প্রেম আমার হৃদয়ে আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছিল।" যশোবন্তের হস্ত প্রতাপের হস্তের ভিতর ছিল। প্রতাপের কথা শুনিয়া তাঁহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল। প্রতাপ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন. যশোবন্তের মুখ বিশুষ্ক ও গম্ভীর। চকিতের ন্যায় তিনি সকলই বুঝিতে পারিলেন। যশোবন্তের গলদেশ দুই বাহুতে জড়াইয়া প্রতাপ বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি। তুমি দুঃখিত হইও না, আমি আজ পর্য্যন্ত দুর্গার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করি নাই, সে হয়ত আমাকে ভালবাসে না।" যশোবন্ত কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "না প্রতাপ, দুর্গা তোমারই হইবে। আমি তোমার সুখের বিঘ্ন হইব না। তোমাকে লুকাইব না যে, আমি তাহাকে ভালবাসি, কিন্তু কালই আমি এখান হইতে প্রস্থান করিব, এক বৎসরের পূর্ব্বে ফিরিব না। আসিয়া যেন দেখি, তুমি দুর্গাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছ। আমার কিছু অর্থ আছে, তাহা আমি তোমাকে দিয়া যাইব। আমার পিতা ধনবান্, অর্থে তাঁহার প্রয়োজন নাই। আমার বন্ধুতার দান তোমায় লইতে হইবে।"

কিছু ক্ষণ নীরবে থাকিয়া উভয়ে পুনরায় দুর্গার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। দুর্গা তখন চিন্তিত ভাবে কুটীরদ্বারে জ্যোৎস্নালোকে দণ্ডায়মান ছিল। বন্ধুদ্বয়কে দেখিয়া চমকিত হইল। যশোবন্ত বলিলেন. "দুর্গা কাল আমি যুদ্ধে যাইব, তাই তোমাকে বলিতে আসিলাম।"

দুর্গা বিষণ্ণ ভাবে বলিল "কাল? এত শীঘ্র কেন যাইতেছ?"

যশোবন্ত সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দুর্গা, আমার বন্ধু প্রতাপ তোমাকে ভালবাসেন, তুমিও তাহার প্রতিদান করিয়াছ সত্য কি না বল?"

দুর্গার ক্ষীণস্বর্ণকান্তি দেহ বাত্যাপীড়িত লতাতুল্য কাঁপিতে লাগিল। সে একবার মাত্র প্রতাপের মুখের দিকে চাহিয়া অবসন্নভাবে ধরাতলে বসিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সে দৃষ্টিতে সকলি ব্যক্ত হইল। প্রতাপ তখন আর সমুদয় বিস্মৃত হইলেন উচ্ছলিত প্রেমাবেগে দুর্গার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নীরবে তাহার কোমল হস্ত আপন হস্তে লইলেন এবং অপর হস্তে নিজ বসনে তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। সে নীরবমুহূর্ত্ত উভয়ের নিকট কত মধুর, কত গভীর ভাবব্যঞ্জক। উভয়ে তখনকার জন্য দুর্ভাগা যশোবন্তকে বিস্মৃত হইলেন। যশোবন্ত বন্ধুর সুখের ছবি স্বচক্ষে দেখিলেন, তাঁহার একটি মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং একবিন্দু উষ্ণ অশ্রুজল প্রতাপ এবং দুর্গার মিলিত হস্তের উপর পড়িল। পরক্ষণেই তিনি নিকটস্থ উপবনেই অন্তর্হিত হইলেন। প্রতাপ মুখ তুলিয়া বন্ধুকে আর দেখিতে পাইলেন না, অন্ধকার ছায়াযুক্ত উপবনের দিকে দৃষ্টি করিলেন। যশোবন্ত তত ক্ষণ চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন। প্রতাপ ভাবিলেন, "ঐ বনের মধ্যে বৃক্ষের ছায়ার অন্ধকার। আমার প্রিয় সুহৃদ যশোবন্তের হৃদয় ইহা হইতেও আজ অন্ধকার হইল।" এক বৎসরের মধ্যে প্রতাপ এবং দুর্গার বিবাহ হইল। প্রতাপ আর যুদ্ধে গেলেন না। যশোবন্ত যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন সকলি বন্ধুকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুর সুখ আপনার সুখ অপেক্ষা মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়াছিলেন। প্রতাপ দুর্গাকে পাইয়া সুখী হইলেন, যশোবন্ত আর গৃহে ফিরিলেন না।

আসামের রাজা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ডেকুনদের উত্তর কূলে শিবসাগর নগর। তথায় মহারাজ শিবসিংহ কর্ত্তৃক নিখাত শিবসাগরনামক পরম রমণীয় সুবৃহৎ সরোবর আছে। এই সরোবর রাজা শিব সিংহের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। এই সরোবরের নামানুসারে নগরের নাম শিবসাগর হইয়াছে। সরোবরটির চারি কূল ঘুরিয়া আসিতে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়। এই শিবসাগর দীর্ঘিকার জল কাচবৎ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল এবং য়ার পর নাই উৎকৃষ্ট। নগরবাসিগণ পানার্থ এই সরোবরের জল ব্যবহার করে। শিবসাগর দীর্ঘিকার দক্ষিণ কূলে শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু এই তিন দেবতার তিনটি অত্যুচ্চ বৃহৎ মন্দির বিদ্যমান। মধ্যস্থলের শিবমন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ৬। ৭ মাইল দূরের পথ হইতে এই মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয়। চূড়া উজ্জ্বল সুবর্ণে মণ্ডিত। তিন মন্দিরেরই পাষাণময় প্রাচীরে নানা প্রকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি রচিত রহিয়াছে। শিবসাগরের চারি কূল পাকা পোস্তায় বাঁধা, কিন্তু সরোবরের অনুরূপ বৃহৎ বাঁধা ঘাট নাই। এই সরোবরের কূলেই গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত

যাবতীয় আফিস ও সাহেবদিগের বাসস্থান স্থাপিত। এই পরম রমণীয় সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদর্শনে প্রাণ পুলকিত ও হৃদয় প্রশস্ত হয়। দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বে সুবৃহৎ পরিখা বিদ্যমান। প্রায় দুই শত বৎসর হইল সরোবর খাত হইয়াছে, অথচ এইক্ষণও যেন নূতন, দল পানা কিছুই নাই। শিবসাগর হইতে প্রায় দশ মাইল অন্তর নাজেরাত নামক স্থানে এক সপ্ততল সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ ও অপর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। তাহা বিশেষ দর্শন যোগ্য। প্রথমতঃ রাজধানী নাজেরাতেই ছিল, পরে রংপুরে রাজধানী স্থাপিত হয়। সর্ব্বশেষে শিবসাগরের প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে জোড়হাট নামক স্থানে রাজধানী উঠিয়া যায়। জোড়হাটে মহারাজ পুরন্দর সিংহ চাং-বাঙ্গলায় স্থিতি করিতেন। সেখানে পাকা রাজপ্রাসাদের কোন চিহ্ন নাই, সুদীর্ঘ কাঁচা প্রাচীর ও পরিখা এবং একটি রমণীয় সরোবর আছে। শিবসাগরের দশ মাইল অন্তর ট্রঙ্ক রোডের পার্শ্বে গৌরীসাগর নামক এক সুবৃহৎ সরোবর বিদ্যমান। সেই সরোবরের কূলেও দেবমন্দির স্থাপিত। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক স্থানে আসামের মহারাজদিগের কীর্ত্তিরূপ বৃহৎ মন্দির ও সরোবরাদি আছে।

অসভ্য রাজাদিগের সচরাচর যেরূপ বিচার আচার হইয়া থাকে, আসামের মহারাজদিগেরও সেইরূপ বিচার আচার ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগের লঘু পাপে গুরু দণ্ড বিধান করিতেন। অনেকে ভয়ানক অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহাদের আদেশে লোকের চক্ষু উৎপাটন ও হস্ত পদ ছেদন এবং প্রাণদণ্ড সচরাচর হইত। এক জনের অহঙ্কার হইয়াছে বা কেহ কাহারও প্রতি কুভাবে দৃষ্টি করিয়াছে, রাজা শুনিতে পাইলেন। প্রমাণাদি গ্রহণ না করিয়াই অমনি তাহার চক্ষু উৎপাটনের হুকুম দিলেন। এইরূপ অনেক সময় হইত। রাজা পুরন্দর সিংহ নিগ্রেটিং গ্রামনিবাসী জলধর ফুকন নামক এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষের চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়াছিলেন, এবং সেই স্থানের একটি স্ত্রীলোককেও অন্ধ করিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল সেই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইয়াছে। চৌর্য্যাদি অপরাধে অপরাধীর হস্ত পদ ছেদন হইত। অনেক লোক সামান্য অপরাধে কর্ণ নাসিকা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সামান্য লোক হাটুর নীচে কাপড় পরিয়া রাস্তা দিয়া চলিলে পা কাটিয়া ফেলার বিধি ছিল। ডোম মেথরাদি নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের প্রতি রাজপথ দিয়া চলিবার হুকুম ছিল না, তাহারা পথের পার্শ্ববর্ত্তী নরদামা দিয়া চলা ফেরা করিতে বাধ্য ছিল।

মৎস্যজীবীর কপালে উল্কিযোগে মাছ এবং মেথরের ললাটে ঝাঁটা অঙ্কিত থাকিত। শিবসাগর নগরের ১০ দশ

মাইল অন্তর একটী বেগবতী ক্ষুদ্র নদীর উপর ইষ্টকনির্ম্মিত একটি পুরাতন সুদৃঢ় ও সুন্দর সেতু বিদ্যমান। ঘনশ্যামনামক বঙ্গদেশীয় এক জন রাজমিস্ত্রী সেই পোল নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পোল প্রস্তুত হইলে পর মহারাজ আসিয়া তাহা দর্শন করেন। এরূপ বেগবতী নদীর উপর এরূপ পোল প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হন। মনে মনে ভাবেন যে, এই রাজমিস্ত্রী যেরূপ বুদ্ধিমান্, সে বুদ্ধিকৌশলে আমার রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে। অতএব ইহাকে জীবিত রাখা হইবে না। এই ভাবিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করেন। সপ্ততলগৃহনির্ম্মাতাকেও নাকি উপরিউক্ত আশঙ্কায় মারিয়া ফেলা হইয়াছিল। আসামের অনেক মহারাজের এইরূপ অগাধ বুদ্ধি ছিল। অনেক অপরাধীকে অন্ধকারময় গর্ত্তে পুরিয়া কয়েদ রাখা হইত। এই প্রকার জনশ্রুতি যে, মধ্য আসামের অন্তর্গত মঙ্গলদহের রাজার নিকটে বঙ্গদেশের এক জন বিনামাবণিক লক্কাদার সুন্দর জরির জুতা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছিল। রাজা উচ্চ মূল্য দানে আদর পূর্ব্বক তাহা ক্রয় করেন এবং কপালের দুই পার্শ্বে সেই দুই পাটি জুতা মস্তকের শোভার জন্য উষ্ণীষযোগে বাঁধিয়া রাখেন। এমন চকচকে সুন্দর বস্তু পায়ে পরিতে হয়, ইহা তিনি মনেও ধারণা করিতে পারেন নাই। ভবচন্দ্র রাজার অনেক অদ্ভুত গল্প আমরা দিদীমার নিকট বাল্যকালে শুনিয়াছি, বোধ হয় তিনি আসামের রাজাই ছিলেন।

বাঙ্গালী সামান্য বড়মানুষের মেয়েরা যেমন আলস্যে ও বিলাস আমোদে দিন যাপন করেন, আসামের রাজমহিষীগণ সেরূপ ছিলেন না। স্বাধীন রাজার পত্নী হইয়াও অতুল ঐশ্বর্য্যবিভবের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহাদের অনেকে তাঁত যন্ত্রে স্বহস্তে বস্ত্র বয়ন করিতেন. অনেক পরিশ্রমের কার্য্যে তাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন। আসামাধিপতিগণ বহুদার পরিগ্রহ করিতেন। মানপুরের রাজপরিবারের সঙ্গে সচরাচর ইহাঁদের বিবাহ সম্বন্ধাদি হইত। সামান্য কুলের সুন্দরী নারী পাইলেও তাঁহারা অন্তঃপুরে গ্রহণ করিতেন। মণিপুরী লোকদিগের সঙ্গে আসামের রাজবংশীয় লোকদিগের আকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

মহারাজদিগের মৃত্যু হইলে হিন্দুদিগের অনুরূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত না। শব মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত। মহারাজের শবের সঙ্গে দুই একটী রাণী দাস দাসী পাচক নাপিত ধোপা মেথর ইত্যাদি পরিচারকবর্গ জীবিত অবস্থায় ভূগর্ভশায়ী হইতে বাধ্য হইতেন। তাহা না হইলে পরলোকগত রাজার সেবা শুশ্রূষা কেমন করিয়া চলিবে। জোড়হাটের রাজা পুরন্দর সিংহের সমাধিস্তূপ বিদ্যমান। উহা একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকার মৃত্তিকাস্তূপ। সেই মৃৎস্তূপের নিম্নে রাজার দেহের সঙ্গে কত প্রাণীর যে দেহ রহিয়াছে নির্ণয় করা যায় না। মহারাজের সমাধির পার্শ্বে মহারাণীর সমাধিস্তূপও রহিয়াছে। সেই সমাধিগর্ভে যে কেবল কতকগুলি মানবদেহ আছে তাহা নহে, ধন, রত্ন ও প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদিও প্রোথিত আছে।

মহারাজের অনেক পুত্রসন্তান থাকিলে তন্মধ্যে যে পুত্রটীকে তিনি আপনার ভাবী উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করিতেন, তাহাকে ব্যতীত অন্য সকল রাজকুমারের নাসিকা বা কর্ণ অথবা অন্য কোন অঙ্গ ছিন্ন করিতেন। যাহার কোন অঙ্গ ছিন্ন বা বিকল তাহার রাজসিংহাসন পাইবার অধিকার ছিল না। অহমরাজবংশ এইক্ষণ বিলুপ্ত। পুরন্দর সিংহের পুত্র কামেশ্বর সিংহ, কামেশ্বর সিংহের পুত্র কন্দর্পেশ্বর সিংহ একপ্রকার নামে রাজা ছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহিবিদ্রোহের সময় কোন লোকের চক্রান্তে কন্দর্পেশ্বর সিংহের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ হইলে তাঁহাকে গোহাটী নগরে লইয়া গিয়া নজরবন্দিরূপে কয়েদ রাখা হয়। তখন ইংরাজেরা জোড়হাটের রাজবাটী লুট করেন। তাহাতে কন্দর্পেশ্বর সিংহ হৃতসর্ব্বস্ব হন। তাঁহার জন্য ও তাঁহার মাতার জন্য পাঁচ শত টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। এই সামান্য অর্থে মহাকষ্টে কন্দর্পেশ্বর সিংহ দিন যাপন করেন। কন্দর্পেশ্বর আমাদের আচার্য্যদেবের বড় ভক্ত ছিলেন। ৬।৭ বৎসর হইল তিনি গোহাটী নগরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র কুমুদেশ্বরকে তাঁহার দুঃখিনী বিধবা মাতার ক্রোড় হইতে গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লইয়া শ্রীহট্টে রাখেন, সেখানে ওলাউঠারোগে অচিকিৎসা ও অযত্নে সেই রাজকুমারটি মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। পতিপুত্রশোকাতুরা রাণী এইক্ষণ গোহাটী নগরে মহাকষ্টে কাল যাপন করিতেছেন। জোড়হাট নগরে পুরন্দর সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এইক্ষণও জীবিত আছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। মহারাজ পুরন্দর সিংহকে তিনি বাল্যকালে দেখিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহার অঙ্কে আরোহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ৩০৲ টাকা মাত্র পেন্‌সন প্রদান করেন। দশ সহস্র টাকা বার্ষিক কর প্রদান করিলে নিগ্রিটিংএর উত্তর হইতে জোড়হাট, শিবসাগর ডিব্রুগড় প্রভৃতি সমগ্র উত্তর আসাম গবর্ণমেণ্ট কামেশ্বর সিংহকে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কামেশ্বর সিংহ এত অধিক টাকা দিতে পারিবেন না বলিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হন। এইক্ষণ এক জোড়হাট উপবিভাগেই গবর্ণমেণ্টের ৪০।৫০ হাজার টাকা আয়। শ্রুত আছি যে, রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহকে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের কোন প্রধান রাজপুরুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,

আপনার কত টাকা হইলে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। কন্দর্পেশ্বর করপুটে অঞ্জলি করিয়া বলেন যে, এতগুলি টাকা হইলে হয়। হস্তযুগে অঞ্জলিমধ্যে পাঁচ শত টাকা ধরিতে পারে ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাই নির্দ্ধারণ করেন। রাজাকে বুদ্ধির দোষে এই সামান্য বৃত্তিভোগী হইতে হইয়াছিল।

চিতোর।

২য় প্রস্তাব।

পূর্ব্বে আমরা চিতোরের যে সমস্ত স্থপতি কীর্ত্তিগুলির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজপুতজাতি স্থপতিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। কেবল চিতোর কেন, উদয়পুর, আজমির প্রভৃতি যে রাজপুত সহরই দেখা যায় তাহাতেই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের প্রাসাদ, দুর্গ, প্রাচীর, ফটক, দেবমন্দির ও কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল আজিও বিরাজ করিতেছে। রাজপুতানা মরু ও পার্ব্বত্য প্রদেশ। যে প্রকার আশ্চর্য্য কৌশলে তথায় সরোবর সকল খনিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্থাপনকর্ত্তাদিগের অদ্ভুত অধ্যবসায় ও কৌশলকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। পর্ব্বতের উপত্যকা গুলির নিম্নস্থ পথে প্রশস্ত ভাবে প্রস্তরের বাঁধ বাঁধিয়া খুব উচ্চ করিয়া তোলা হইয়াছে, সুতরাং ঝরণার জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া সমস্ত উপত্যকাটীকে একটি সরোবরে পরিণত করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে এই ভাবে দুই তিনটি নিকটস্থ উপত্যকার পথ সমান উচ্চ ভাবে আবদ্ধ করিয়া সুবিস্তীর্ণ হ্রদে পরিণত করা হইয়াছে, এবং তন্মধ্যস্থ গিরিশৃঙ্গগুলি সুন্দর দ্বীপরূপে মধ্যে মধ্যে শোভিত রহিয়াছে। রাজপুত বীরেরা ঐ সকল দ্বীপোপরি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের প্রাসাদ, রঙ্গমঞ্চ ও দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে উহাদিগের ছবির মত সুন্দর ছায়াগুলি পতিত হইয়া যেন স্বর্গের শোভা প্রকাশ করিতেছে।

মুসলমান ও মহারাষ্ট্র বিপ্লবে রাজপুতদিগের অনেক কীর্ত্তি বিলোপ হইলেও এখনও যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা দেখাইয়া ভারত পৃথিবীর নিকট শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে চিতোরের যে সকল কীর্ত্তিগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বস্তু স্বাধীন অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। সার্দ্ধ তিন বার মুসলমান করে চিতোর ধ্বংস হওয়ায় অসংখ্য কীর্ত্তিকলাপ লুপ্ত হইয়াছে। সম্রাট আলা উদ্দীন খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চিতোর আক্রমণ করিয়া কিছুকাল অবরোধের পর ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষকে এক প্রকার বীরশূন্য করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, তিনি এ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া যান,

সুতরাং চিতোরের কোন কীর্ত্তি ভগ্ন করিতে পারেন নাই। সেই জন্য ইহাকে চিতোরের অর্দ্ধ উৎসাদ কহে। কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরেই তিনি বিপুল সৈন্যবল সহ প্রবল বেগে আক্রমণ করেন, এই বার তাঁহার সহিত মালদেব নামে একজন রাজপুত কুলাঙ্গার ছিল, তাহারই কৌশলচক্রে সম্রাট জয়ী হইতে সমর্থ হন, এবং ইহাতেই চিতোর একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল। সমস্ত পুরুষ তরবারে ও সমস্ত রমণী অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সম্রাট শ্মশানসদৃশ নগরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও কীর্ত্তিবিচূর্ণন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল যে অপূর্ব্ব সুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে এত নরনারী হত্যা করিলেন, তাঁহার সুন্দর প্রাসাদটিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ প্রাসাদের কথা আমরা গত বারে লিখিয়াছি, এবার কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্ম্মিত হইয়া আজিও সরোবরের বক্ষঃস্থ দ্বীপের উপর শোভিত রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন সাতাইশ দেউড়ি নামক জৈন মন্দিরটিও তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই চিতোরের প্রথম উৎসাদ। ইহা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরের সুলতান বাহাদুর সা জনৈক পর্ত্তুগীজ সেনাপতির সাহায্যে চিতোর আক্রমণ করেন। ইহাতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বীর তরবারে ও ত্রয়োদশ সহস্র রমণী অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনলে প্রাণত্যাগকে "জহর ব্রত" বলে। বাহাদুর চিতোরের কীর্ত্তিগুলি সমস্ত ধ্বংস করিবার অবকাশ পান নাই, তিনি জয়ের পর কয়েক দিন উৎসব করিতে ছিলেন, এমন সময় শুনিলেন, সম্রাট হুমায়ুন চিতোর রক্ষা করিতে আসিতেছেন, অগত্যা তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল। ইহাই চিতোরের দ্বিতীয় উৎসাদ।

এই উৎসাদের ক্ষত আরোগ্য হইতে না হইতে রাণা উদয় সিংহ মোগলপতি আকবরের বিদ্রোহীদিগকে সাহার্য্য করায় তাঁহার কোপনয়নে পতিত হইলেন। আকবর চিতোর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ভীরু উদয় সিংহ কেবল সর্দ্দারদিগের অনুরোধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে বাধ্য হন, সুতরাং অচিরাৎ সম্রাটের করে বন্দী হন। সর্দ্দারগণ কাপুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে উদয় সিংহের এক অবৈধ বীরপত্নী যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিলেন এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। সম্রাটের বিপুল সৈন্য ও কামানরাজি রমণীর প্রচণ্ড পদক্ষেপে পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, তিনি অশুরমাশিনীবেশে অসংখ্য মুস-

মানকে বিনাশপূর্ব্বক শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া রাণাকে উদ্ধার করিলেন। আকবর এই যুদ্ধে নিতান্ত অপমানিত হইয়া অবনত মস্তকে পলায়ন করেন।

কিছু দিন পরে ইহার প্রতিশোধ লইবার আশায় চারিদিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় বার আকবার চিতোর আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কাপুরুষ রাণা সম্রাটের পুনরাগমনের কথা শ্রবণ মাত্র সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও রাজপুত বীরেরা সহজে চিতোর ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া সমরক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। যে পাট্টাসিংহের কীর্ত্তিস্তম্ভ ও প্রাসাদের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই বীর একটি নবীন যুবা, তিনি অসীম সাহসে অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইলে তাঁহার জননী ও বালিকা পত্নী অপরাপর বীর নারীগণ সহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আশ্চর্য্য রণনৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রু দলন করিতে লাগিলেন। শেষে অসংখ্য মুসলমানে পরিবেষ্টিতা হইলে কুলগৌরবরক্ষার্থ নিজ নিজ অস্ত্রে দেহপাত করিয়া ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন। যে সকল মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন নাই তাঁহারা "জহরব্রতে" আত্মোৎসর্গ করিলে অবশিষ্ট বীরগণ নিশ্চিন্ত মনে সমরানলে পতঙ্গবৎ পতিত হইয়া তাঁহাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী চিতোরকে বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৬২৫ সংবতের ১১ই চৈত্র নিজ বাসরে সূর্য্যদেব অস্তগমনকালে নিজ বংশের যে পতন দেখিলেন, তাহার পুনরুত্থান দেখিবার জন্য প্রত্যহ আসিয়া সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতেছেন কিন্তু আজিও কৃতকার্য্য হইলেন না। ইহাই চিতোরের তৃতীয় বা শেষ উৎসাদ। মহাপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আকবর চিতোরের সমস্ত প্রাণী নিঃশেষ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, ইহার অনেক সৌধ অট্টালিকা চূর্ণ করিয়া অপরাপর লুণ্ঠন দ্রব্যের সহিত প্রাসাদসমূহের বহুমূল্য স্থাপত্য অলঙ্কার ও দুর্গদ্বারের চিরস্থায়ী কপাট গুলি লইয়া গিয়া আকবরাবাদ বা আগরা নামক স্বীয় নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার দুর্জ্জয় হস্তে যাহা পতিত হইয়াছিল, তাহা আর পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই। যে গুলি অবশিষ্ট আছে তাহাই আমরা পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি, এবং প্রতিশ্রুত মতে তন্মধ্যস্থ সুন্দর কীর্ত্তি গুলির ইতিহাস ও সৌন্দর্য্য ক্রমে যথাসাধ্য প্রকাশ করিব।

ক্রমশঃ।

কাব্যকাহিনী।

ভায়োলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ভায়োলা ডিউক কর্ত্তৃক পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার দত্ত অলঙ্কার লইয়া ওলিভিয়ার নিকট গমন করিলেন। লেডি ওলিভিয়া এবারে যুবাবেশধারী ভায়োলার প্রতি ব্যবহারে আরও অনুগ্রহ এবং অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

ভায়োলা উত্তর করিলেন, "আপনার দাসের নাম সেসেরিও।"

ও। আমার দাস? ইহা কপটসৌজন্য। যুবক, তুমি কাউণ্ট ওর্সাইনোর দাস।

ভা। আমার প্রভু আপনার দাস, তাঁহার যাহা কিছু সকলই আপনার। অতএব আমি আপনার দাসানুদাস।

ও। তোমার প্রভুর কথা আমি ভাবিতেছি না।

ভা। আমি তাঁহার কথাই আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি।

ও। তোমাকে মিনতি করি, তাঁহার কথা আমার নিকট আর বলিও না। কিন্তু আর এক জনের কথা যদি বলিতে চাও বল, তাহা আমার নিকট স্বর্গের সঙ্গীতের তুল্য মধুর বোধ হইবে।

ভায়োলা তাঁহার কথায় বাধা দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ওলিভিয়া না শুনিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তোমার নিকট আমি একটি অঙ্গুরীয় তোমার বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তুমি আমাকে কত লজ্জাহীনা জ্ঞান করিয়াছ, আমার মনের ভাব সকলই বুঝিয়াছ, এখন তোমার কি বলিবার আছে বল।"

ভা। আপনার উপর আমার কেবল দয়া হয়।

ও। দয়া ও ভালবাসা প্রায় তুল্য ভাব।

ভা। না একটুও না। অনেক সময় আমরা শত্রুর প্রতিও দয়া প্রকাশ করি।

ও। তবে আমি আর দুঃখ করিব না। যুবক, তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমাকে আর বিরক্ত করিব, আমি তোমার মনের ভাব জানিলাম তুমি প্রস্থান কর। সে নারী সৌভাগ্যবতী যে তোমাকে স্বামিরূপে লাভ করিবে।

ভা। আপনার মঙ্গল হউক। তবে আমার প্রভুকে আপনার আর কিছু বলিবার নাই?

ভায়োলা প্রস্থানোদ্যত হইলে ওলিভিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাকেই আমি ভালবাসি। আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও সে ভালবাসা লুকাইতে পারিব না। আমি তোমার ভালবাসা চাহিতেছি বলিয়া মনে করিও না যে তোমার

আমাকে ভালবাসিবার কথা নয়। জানিও চাহিয়া চাহিয়া ভালবাসা পাওয়া অপেক্ষা অযাচিত ভালবাসা ভাল।”

ভা। আমিও শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার হৃদয় কখনও কোন স্ত্রীলোকের হইবে না, ইহা আমারই থাকিবে। বিদায় হই, আর আমি ভবিষ্যতে আমার প্রভুর প্রণয়বার্ত্তা লইয়া আপনার নিকট আসিব না।

ও। না না, আবার আসিও, তুমিই হয় তো তোমার প্রভুর প্রতি আমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে।” অবশেষে ভায়োলা প্রস্থান করিলেন।

ভায়োলার যমজ ভ্রাতা সিবাষ্টাইন এই সময় ইলিরিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—এণ্টোনিও নামক তদ্দেশস্থ এক জন বণিকের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল, তাঁহারই আলয়ে সিবাষ্টাইন অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিবাষ্টাইন্ দেশদর্শনে যাইবার ইচ্ছা করাতে এণ্টোনিও আপন মুদ্রার থলি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিলেন।

ও দিকে সার্ এনড্রু নামে আর এক জন ধনবান্ ব্যক্তি লেডি ওলিভিয়ার পরিণয়ার্থী হইয়াছিল। ভায়োলা ওলিভিয়ার নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইবার সময় সে পথিমধ্যে ছদ্মবেশধারী ভায়োলার সহিত অসিযুদ্ধের উপক্রম করিল। ভায়োলা মহা ভীত হইলেন, তিনি স্ত্রীলোক, কিরূপে অসিযুদ্ধ করিবেন। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় এণ্টোনিও তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ভায়োলাকে প্রিয় বন্ধু সিবাষ্টাইন্ ভ্রমে অন্য এক ব্যক্তির সহিত বিবাদের উপক্রম দেখিয়া সার্ এনড্রুকে বলিলেন, “নিরস্ত হও, যদি এই যুবা কোন দোষ করিয়া থাকেন সে দোষ আমার, আমি তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিব।” এই বলিয়া তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া সংগ্রামে উদ্যত হইলেন। এমন সময় কতক গুলি পুলিসের কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা পূর্ব্ব অপরাধের জন্য এণ্টোনিওকে ধৃত করিল, এবং কারাগারে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। এণ্টোনিও অবিবেচনা পূর্ব্বক প্রকাশ্য রাজপথে গিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে ধিক্কার করিয়া ভায়োলার নিকট হইতে আপনার মুদ্রার থলি ফিরাইয়া চাহিলেন। তিনি ভায়োলাকে সিবাষ্টাইন জ্ঞান করিয়াছিলেন। ভায়োলা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আমিত আপনার মুদ্রার বিষয় জানি না। আপনাকে আমি চিনি না। তবে আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া আমার নিজের অর্থ কিছু আপনাকে ঋণস্বরূপ দিতে পারি। আমার অধিক নাই, যাহা আছে তাহার অর্দ্ধাংশ আপনাকে দিতেছি।”

এণ্টোনিও মহা ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হইয়া

অকৃতজ্ঞ বলিয়া ভায়োলাকে গালি দিতে লাগিলেন। বলিলেন, “আমি এই যুবাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছি এখন এ ব্যক্তি বলিতেছে আমাকে জানে না। পুলিস কর্ম্মচারিগণ এণ্টোনিওকে লইয়া প্রস্থান করিল। ভায়োলা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, হয়ত তাঁহার ভ্রাতা সিবাষ্টাইন নদীগর্ভ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এবং জীবিত আছেন। সিবাষ্টাইন ভ্রমে উক্ত বণিক তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। তাঁহার মনে অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরে সিবাষ্টাইন রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে লেডি ওলিভিয়ার গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। ওলিভিয়া এক জন অনুচরকে ভায়োলাকে অহ্বান করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে সিবাষ্টাইনকে পথিমধ্যে দর্শন করিয়া ভায়োলাজ্ঞানে তাঁহাকে বার বার অহ্বান করিতে লাগিল। সিবাষ্টাইন বিস্মিত হইয়া যাইতে অস্বীকার করিতে লাগিলেন। এই সময় পূর্ব্বোক্ত সংগ্রামপ্রার্থী ব্যক্তি ঐ স্থানে উপস্থিত হইল এবং সিবাষ্টাইনের সহিত যুদ্ধ যাচ্ঞা করিয়া তাঁহাকে অসির আঘাত করিল। সিবাষ্টাইন রুষ্ট হইয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। গৃহদ্বারে গোলযোগ শুনিয়া লেডি ওলিভিয়া ত্বরায় উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধ নিষেধ করিয়া সুমিষ্ট বাক্যে সিবাষ্টাইনকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি সিবাষ্টাইনকে ভায়োলা মনে করিয়াছিলেন। সিবাষ্টাইন অপরিচিত ভদ্রমহিলা দ্বারা আহুত হইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সাদর আহ্বান অনুসারে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ।

বিচার।

এ সংসারে বিচার করিতে সকলেই পটু। পরকে বিচার করিতে সকলেই ভালবাসে। পরের দোষ গুলি অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা কাহার নাই। অন্যের সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমাদের সকলেরই বিলক্ষণ আছে। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে সকলেই অল্পাধিক অন্ধ। মনুষ্যসমাজের একটি প্রধান শাসন পরস্পরকে বিচার। এই বিচার দ্বারা নৈতিক বন্ধন দৃঢ় থাকে। এক জন যদি অপরকে বিচার না করিত, সকলে যাহা ইচ্ছা করিত। নিজের রুচি অনুসারে সকলে চলিত, যাহার যাহা ভাল লাগিত সে তাহাই অনায়াসে করিয়া যাইত। মানুষের স্বভাবই এইরূপ যে পরস্পরকে বিচার করিতে ভাল বাসে। পরস্পরের কার্য্যের প্রতি এমনি দৃষ্টি, যে একজনের একটু অন্যায় অন্যের সহ্য হয় না। মনুষ্যসমাজ মধ্যে থাকিতে গেলে বিচারের হস্ত কেহ এড়াইতে

পারে না। কিন্তু বিচার অনেক সময় অবিচার হইয়া অপরের ক্লেশের কারণ হয়। মানুষ যে চক্ষে আপনার কার্য্য ব্যবহার ও ভাবের বিচার করে, অন্যের সম্বন্ধে সে দৃষ্টি রাখিতে পারে না। যে কাজ অন্যে করিলে অন্যায় অনুচিত বোধ হইয়া থাকে,আপনি অনেক সময়ে সে কাজ করিয়া ফেলে এবং করিয়াও আপনাকে দোষী বলিয়া মনে করে না। আপনাকে যে প্রণালীতে বিচার করে, অন্যের বিচার সে প্রণালীতে করিতে কেহ পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম, আপনার সম্বন্ধে দৃষ্টি অন্ধ! মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, "বিচার করিও না, কারণ তুমিও বিচারিত হইবে। অন্যের চক্ষে যে ধূলিকণা তাহা তুমি কেন দেখিতেছ, আর তোমার চক্ষের ভিতর বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে তাহা কেন তুমি দেখিতে পাইতেছ না? হে কপট মানব, অগ্রে তুমি তোমার চক্ষু হইতে কাষ্ঠ খণ্ড উৎপাটিত কর, পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষুর মধ্যস্থ ক্ষুদ্রধূলিকণা দেখিও।" বাস্তবিক মনুষ্যস্বভাব এইরূপ। আমরা অন্যকে যে চক্ষে বিচার করি, আপনাদিগকে যদি তাহাই করিতাম তবে আমরা দেবতা হইতে পারিতাম। অন্যের যে সকল ত্রুটি দেখিয়া ঘৃণা করি, নিজের স্বভাবে সেই সকল দোষ যদি সেই চক্ষে দেখিতে পাইতাম, আপনাকে কত হীন জ্ঞানে বিনীত হইতাম। মানুষ না বুঝিয়া পরস্পরের উপর কত অবিচার করে। পরের ভাল হইত যদি লোকে বিচার করিতে গিয়া অবিচার না করিত; ভাল হইত যদি আমরা অন্যের চক্ষের ধূলিকণা দেখিতে এত ব্যস্ত না হইতাম; ভাল হইত আমরা যদি আপনার ন্যায় পরকে বিচার করিতে পারিতাম। মানুষের জন্য বিচারের প্রয়োজন আছে। পরস্পরের শাসন পরস্পরের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু সে বিচার সকল সময়ে যদি সুবিচার হইত তবে ভাল হইত। যদি লোকে সকল সময় সুবিচার করিতে পারিত, তবে পর আপনার ভেদ থাকিত না, একের অবিচারে অন্যের ক্লেশ হইত না। পরস্পরের শাসনে কেবল মঙ্গলই হইত, মানুষ দেবস্বভাব পাইত এবং পৃথিবী স্বর্গ তুল্য হইত।

মনোরমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। যে ধনী ছিল সে দরিদ্র হইল, যে সুখী ছিল সে দুঃখী হইল, যে হাসিয়া ছিল সে কাঁদিল, যে কাঁদিত সে আবার হাসিল। ধনীর জন্য সময় বসিয়া থাকে না, দুঃখীর জন্যও সময় বিলম্ব করে না, কাহারও সুখে কাহারও

দুঃখে দিন গুলি কাটিয়া যায়। দুঃখী ভাবে দিন আর কাটিবে না, তাহারও দিন কাটিয়া যায়, সুখী ভাবে, এত শীঘ্র দিন কেন ফুরাইল, তবু দিন অস্ত হয়। সময়ের গতি কে ফিরাইবে, কে থামাইয়া রাখিবে? মনোরমার পিতার গৃহে বিষাদের অন্ধকার। এক মাত্র হৃদয়পুতলী হারাইয়া পিতা পিতামহ মাতা সকলেই ভগ্নহৃদয়। কত অন্বেষণ করা হইল, আর গৃহে সে আনন্দপ্রতিমা ফিরিল না। সে গৃহেও সময় কাটিল; ক্রমে পাঁচ বৎসর অতীত হইল। কত পরিবর্ত্তন ঘটিল। মনোরমার পিতামহের মৃত্যু হইয়াছে। হেম বাবু এক্ষণে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কিন্তু তাঁহার গৃহ যেন অরণ্যবৎ বোধ হইতে লাগিল। কোন প্রকারে তিনি এবং তাঁহার পত্নী সেই বৃহৎ প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পাঁচ বৎসর হইয়া গেল। ধনবান্ হেম বাবুর কন্যা এখন বর্দ্ধমানের গোপগৃহে আশ্রিতা। সে মনে করে, কেহ নাই বলিয়া তাহারা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। বালিকা অন্যান্য গোপবালিকাদের সঙ্গে এবাড়ী ওবাড়ী দুগ্ধ লইয়া যাইত। গোবিন্দ গোয়ালা বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীতে এবং অন্যান্য ধনীদের গৃহে দুগ্ধ যোগাইত। দেশের মধ্যে গোয়ালা মহলে তাহার ভারি নাম ডাক। টাকাকড়ি বেশ সঞ্চয় করিয়াছে। বাড়ী ঘর করিয়াছে, অনেকগুলি গরু আছে। রাজবাড়ীতে ক্ষীর দই দুগ্ধ মাখন যাহা দরকার হয় যোগাইয়া থাকে, পশারও বিলক্ষণ। এই গোয়ালার গৃহে আমাদের বালিকা মনোরমা বাস করে। সেই যত্নে পালিত দেহ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, গোলাপ কুসুম তুল্য গৌর রক্তিম বর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র মুখ খানি যেন সর্ব্বদা একটু বিষণ্ণ, যেন তাহার প্রাণের ভিতর কি অভাব রহিয়াছে। তাহার বিস্ফারিত প্রশান্ত চক্ষু দুইটি যেন সর্ব্বদা একটু সজল, একটু ভয়চকিত। সে যখন চক্ষু তুলিয়া কাহারও দিকে তাকায়, দর্শকের মনে হয় কি সুন্দর! মনোরমা গোয়ালা বাড়ীর অন্যান্য বালিকাদের সঙ্গে খেলা করে, বাড়ী বাড়ী দুগ্ধ ক্ষীর নবনী লইয়া যায়, পথে পথে খেলা করে। কেবল যখন নিস্তব্ধ রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে শয়ন করিত, তখন বালিকা কি ভাবিত, ভাবিয়া ভাবিয়া নয়নজলে উপাধান আর্দ্র করিত। বুঝি স্বপ্নবৎ সুখের শৈশবের ছবি অস্পষ্ট ভাবে তাহার স্মৃতিপটে চিত্রিত হইত। বুঝি স্নেহময় জনক জননীর মূর্ত্তি ছায়াবৎ মানসপটে এক এক বার প্রকাশ পাইত। বুঝি বালিকার হৃদয় তাঁহাদের জন্য আকুল হইত। কোথায় তাঁহারা, কোথায় বা বালিকা, এ জীবনে আর কি তাঁহাদের সহিত মিলন হইবে? কে জানে?

চতুর্থ অধ্যায়।

গোপগৃহে মনোরমার সে নামও আর নাই, তাহাকে সকলে শশী বলিয়া ডাকে। বাড়ীতে অনেকগুলি বালিকা —তারা, লক্ষ্মী, রাজু, দুর্গা, মঙ্গলা, সখী ইত্যাদি। কেহ বা আট, কেহ নয়, কেহ দশ, কেহ একাদশবৎসরবয়স্কা। সকলেই শশীকে দরিদ্র অনাথা বলিয়া একটু তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে দেখে, আশ্রিতদিগের প্রতি যেমন ঈষৎ ঘৃণা অবহেলার ভাব স্বভাবতঃ সকলের হয়, মনোরমাকে তাহারা তদ্রূপ ব্যবহার করে। মনোরমার যদি কোন দিন কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা বা বিলম্ব হয়, বাড়ীর গৃহিণী "বসে বসে কেবল ভাত গিলিতে পারে," "কাজের বেলা ঢেঁকি" বলিয়া তিরস্কার করে। কখনও বা সে কিলটা চাপড়টাও খায়। বালিকা ধীর ভাবে সে সকল সহ্য করে। বাড়ীতে গোপাল নামে একটি ১৩।১৪ বৎসরের বালক ছিল, সে মনোরমাকে বিরক্ত করিতে বড়ই ভালবাসিত। কখনও বা তাহার দুগ্ধের কলসী লুকাইয়া রাখিত, কখনও বা অন্ধকারে ভয় দেখাইত, এইরূপে নানা উপদ্রব করিত। গোপাল বাড়ীর আদুরে ছেলে, কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। বিশেষতঃ মনোরমা অনাথা আশ্রিতামাত্র, তাহার কথায় কে কর্ণপাত করে? বলিতে গেলে তাহারই গালি খাইতে হইত।

এক দিন মনোরমা সন্ধ্যা বেলা দুগ্ধের ছোট কলসী লইয়া রাম বাবুদের বাড়ী যাইতেছে, তাহার সঙ্গিনী লক্ষ্মী সে দিন অসুস্থ থাকায় সঙ্গে যাইতে পারে নাই। বালিকা একটু ভীত ভাবে একাকিনী রাজপথ দিয়া যাইতেছে—গোপাল ভাবিল এই বারে উহাকে ভয় দেখাইবার বড়ই মজা। কেহ সঙ্গে নাই, পথেও বড় লোক নাই। গোপালের একটা বৃহদাকার কুকুর ছিল, মনোরমা তাহাকে বড়ই ভয় করিত। সে আপন মনে যাইতেছে, গোপাল পথের ধারে গাছের আড়ালে কুকুর লইয়া লুকাইয়া ছিল। মনোরমা যেমন নিকটে গিয়াছে একেবারে কুকুরটাকে তাহার দিকে ছাড়িয়া তাড়া দিল। হঠাৎ জনশূন্য পথে সম্মুখে কুকুর দেখিয়া মনোরমার ক্ষুদ্র হস্ত হইতে দুগ্ধের কলসীটা ভূমিতে পড়িল, সমস্ত দুগ্ধও নষ্ট হইল। কুকুর তবু ক্ষান্ত হয় না, মনোরমাকে তাড়া করিল। মনোরমা ভয়ে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া এক বার এদিক ওদিক দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র পদদ্বয়ে যত শক্তি ছিল তত বেগে পথের পার্শ্বস্থ বৃক্ষ কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকার মাঠের দিকে প্রাণপনে ছুটিল, কুকুরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। গোপাল তখন যথেষ্ট আমোদ হইয়াছে ভাবিয়া কুকুরকে ডাকিল এবং হৃষ্ট মনে গৃহে ফিরিল। ভাবিল "আজ শশী বাড়ীতে খুব মার ও বকুনি খাইবে, অতটা দুদ্ নষ্ট করিয়াছে। যেমন আমার নামে লাগায় তেমনি জব্দ।" ওদিকে মনোরমা অতি দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে পদদ্বয় কণ্টকাঘাতে ছিন্ন হইতে লাগিল। অবশেষে এক বৃহৎ ইষ্টকখণ্ডে পদ আহত হইয়া সে ভূমিতলে পতিত হইল। পতন কালে নিকটস্থ এক বৃক্ষ সজোরে তাহার মস্তকে লাগিল, তখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া সেই নির্জ্জন প্রান্তরে পড়িয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

পরিব্রাজিকা হিন্দু মহিলা।

পরিব্রাজিকা মহিলা সম্ভ্রান্ত বঙ্গীয় ভদ্রকুলোদ্ভবা, সম্ভ্রান্ত লোকের সহধর্ম্মিণী। কয়েকটি পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে পর ইনি বিধবা হন। বিধবা হইয়াই ইনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। অঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করেন না। মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়াছেন, শুভ্র পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করেন না। বহু কাল হইতে ফলাহারী হইয়া আছেন, অনেক দিন নিরম্বু উপবাস থাকেন। অন্ন ভোজন একেবারে করেন না, কখন কখন অল্পমাত্র দুগ্ধ পান করেন, কোন দিনও স্নান করেন না। অথচ শরীর সুস্থ ও সবল আছে। যখন গৃহে বাস করেন, পুত্রকন্যাদির সেবা ও পর সেবা অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহসহকারে করিয়া থাকেন। অনশনে অথবা সামান্য ফল মূলমাত্র দিনান্তে ভোজন করিয়া এরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন যে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্ম। অনেক সময় অনেক ব্রাহ্মবন্ধু তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থিতি করেন। মাতা রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া পরম আদর ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন, পুত্রকে কোন বিষয় ভাবিতে হয় না। মাতার প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভার। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের প্রতি আদর সম্ভাষণ মাতাই করিয়া থাকেন। মাতা হিন্দু, কিন্তু ব্রাহ্মদিগকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা ও সঙ্গীতাদি শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত শ্রবণ করেন। তিনি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, কামাখ্যা, হরিদ্বার, প্রভৃতি প্রায় সমুদায় হিন্দু তীর্থ একাকিনী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। বহুদূরব্যাপী অরণ্যাকীর্ণ সমুচ্চ হিমালয় শ্রেণী পার হইয়া একাকিনী বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। পথের দুর্গমতা ও দুর্জ্জয় হিম এই বঙ্গীয় কন্যার গতিরোধ করিতে পারে নাই। অপরিচিত সঙ্কটাকীর্ণ গিরিবর্ত্মে তাঁহাকে মাসাধিক কাল কত কষ্ট করিয়া চলিতে হইয়াছিল। কোন বাধা বিঘ্ন তাঁহার উৎসাহ উদ্যম ভঙ্গ করিতে পারে নাই। বীরপুরুষগণও এরূপ দুর্গম পথে একাকী চলিতে সাহসী হয় না। পরিব্রাজিকার হস্তে ত্রিশূল, মস্তকে জটাভার, পৃষ্ঠে শীতবস্ত্র কম্বল। তিনি যেখানে যান, ধর্ম্মপরায়ণা সন্ন্যাসিনী বলিয়া তাঁহাকে লোকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি

করে। তিনি আবধৌতিক ও বৈদ্যশাস্ত্র-সম্মত নানা প্রকার ঔষধ জানেন। স্থানে স্থানে ঔষধ বিতরণ করিয়া রোগীদিগের সেবা করেন, তাহাতে অনেক লোক তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান্। যে সকল তীর্থস্থানে রেলের গাড়ী ও ষ্টীমারের গতিবিধি আছে, সে সকল স্থানে বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোত যোগেই গমনাগমন করিয়াছেন। কামাখ্যা যাইতে জাহাজের কাপ্তেনগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন ও আদর প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণ দ্বারকা ও রামেশ্বর গমনের মনস্থ করিয়াছেন। তথায়ও একাকিনী যাইবেন এরূপ তাঁহার সঙ্কল্প। এক্ষণ তাঁহার বয়স পঞ্চাশের অধিক হইবে না। লেখা পড়া জানেন। তীর্থভ্রমণ কালে স্বহস্তে সন্তানের নিকটে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। ধন্য তাঁহার সাহস অধ্যবসায় ও কষ্ট সহিষ্ণুতা। ইহার দৃষ্টান্ত নাই। তিনি একাকিনীই নানা দেশ পর্য্যটন করিতে ভালবাসেন, সঙ্গী পাইতে ইচ্ছা করেন না।

অলঙ্কার।

নারীগণ নিতান্ত অলঙ্কারপ্রিয়। প্রকৃতিতে সর্ব্বত্রই শোভা আছে সৌন্দর্য্য আছে, অথচ প্রকৃতিও অলঙ্কার পরিয়া থাকেন। তরুলতায় যদি ফুল না জন্মিয়া ফল হইত, তাহাতে কি জীবের প্রয়োজনসিদ্ধি হইত না? সমুদায় তরুলতা যদি একই সবুজ রং হইত, তাহাতেই ত চক্ষুর উপকার সাধিত হইত, তবে এত বিচিত্র বর্ণের প্রয়োজন কি? সমুদায় প্রকৃতিতে এমন করিয়া বর্ণ ফলান হইয়াছে, এবং সে গুলি এমনি বিচিত্রভাবে সাজান যে, প্রকৃতির দেবতা প্রকৃতিকে কেবল অলঙ্কার পরাইবার জন্যই সে গুলি করিয়াছেন বেশ বোঝা যায়। তবে নারীগণের অলঙ্কারপ্রিয়তা কি প্রকৃতিবহির্ভূত? না, তাহা হইতে পারে না। আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে পাঠিকাগণ মনে করিবেন, আমরা তবে আজ নারীগণ যে সকল অলঙ্কার পরেন, তাহারই কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সে অলঙ্কারের কথা বলিবার থাকিলেও আমরা বলিতে চাই না। আমরা বলিতে চাই, ভাষার অলঙ্কারের কথা। অলঙ্কার গুলি যেমন মহিলাদিগের অঙ্গের ভূষণ, অলঙ্কার তেমনি কাব্যের ভূষণ। অলঙ্কার একখানি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক গুলি যেমন নারীগণ পরিয়া থাকেন, কখন কখানি পরেন, তাহার বড় ঠিক থাকে না, কাব্যের অঙ্গ শোভাকর অলঙ্কার গুলিও যেন এক হইতে আরম্ভ করিয়া কতগুলি কাব্যে নিবিষ্ট হইবে তাহার কিছু একটা ঠিকানা নাই। স্থান বুঝিয়া এক বা অধিক অলঙ্কার শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কোন এক জন নারী অধিক অলঙ্কার পরিলে যেমন তাহাতে শোভা বৃদ্ধি হয় না,

কেবল আড়ম্বর প্রকাশ পায়, কাব্যে অলঙ্কার প্রয়োগের সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যে কাব্যে সমধিক অলঙ্কারের আড়ম্বর, অথবা বর্ণনা লোকাতীত হয়, সে কাব্যের বহু গুণ থাকিলেও চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। নৈষধে অনেক লোকাতীত ভাবের বর্ণন আছে বলিয়া তেমন রুচিকর নয়। তবে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা লোকাতীত বর্ণন ভাল বাসেন, এবং যে সকল কাব্যে তাদৃশ বর্ণন নাই তাহা তাঁহাদের রুচিকর হয় না। নৈষধকারের নিজের রুচি যেমন তিনি তেমনই কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার রুচির মত যে অনেকের রুচি আছে, তাহা তাঁহার রুচি দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে।

রুচির কথা যখন পড়িল, তখন রুচি কি আগে নির্ণয় করা উচিত। দুজন মানুষের রুচি যখন এক প্রকার নয়, তখন এটি সুরুচি এটি সুরুচি নয়, ইহা নির্ণয় হইবে কি প্রকারে? কেবল রুচি কেন, সকল বিষয়েই এই প্রকার লোকদিগের ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল বিষয়ের যেরূপে নিষ্পত্তি হয়, ইহারও অবশ্য সেইরূপে নিষ্পত্তি হইবে। এরূপ নিষ্পত্তিতে এইটি স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, সকল বিষয়েই মানুষের উন্নতি আছে। আমরা যখন বালক থাকি, তখন বুদ্ধি বিবেচনা রুচি প্রভৃতি এক প্রকার থাকে। যত বয়স বাড়িতে থাকে অনেক দেখিয়া শুনিয়া সে সকল পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তন ভাল বলিয়া আমরা সহজে ধরিয়া লই। প্রায় আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, তখন বালক ছিলাম কিছু বুঝিতাম না, এখন বয়স হইয়াছে, এখন কি আর এবিষয় বুঝি না? যদিও কোন কোন বিষয়ে বাল্যকালের শ্রেষ্ঠতা আছে, যদিও কোন কোন লোক বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুসংসর্গাদি বশতঃ মন্দ হইয়া যায়, তথাপি এ সাধারণ নিয়মটি কিছুতেই নষ্ট হইতেছে না যে ক্রমে মানুষের বুদ্ধি আদির উন্নতি হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তির বয়স হইয়াও সে কোন বিষয়ে বালকোচিত থাকিয়া যায়, তবে বলিতে হইবে সে ব্যক্তির উন্নতি হয় নাই সুতরাং প্রমাণস্থলে সে কখন গৃহীত হইতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি প্রবীণ হইয়াছেন, মন চঞ্চলতা পরিহার করিয়াছেন, সকল বিষয়ে বেশ অভিনিবিষ্ট, তাঁহারা রুচি আদি বিষয়ে প্রমাণ। মহাভরতে কথিত হইয়াছে।

"ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো মুনিঃ।
ন চ বাগঙ্গচপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণম্॥"

যাঁহার হস্তপদ চঞ্চল নহে, চক্ষু চঞ্চল নহে, বাক্য ও অঙ্গ চঞ্চল নহে, মৌনী, তিনি শিষ্ট। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যোগযুক্ত ব্যক্তি শিষ্ট। এই শিষ্টগণই প্রমাণস্থলে গৃহীত হইয়া থাকেন। স্থিরবুদ্ধি স্থিরচিত্তে একটি বিষয়ের মূল পর্য্যন্ত যিনি দেখিতে

পান, তিনি রুচি আদি বিষয়ে প্রমাণ হইবেন না তো আর কে হইবে?

আমরা বলিয়াছি, প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য ও শোভা থাকিলেও উহা আরও বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই প্রকৃতির দেবতা প্রকৃতিকে অলঙ্কার পরাইয়া থাকেন। অলঙ্কার দিয়া সাজান যখন স্বাভাবিক তখন বাক্যের ভূষণ অলঙ্কার ও যে স্বাভাবিক ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যখন সচরাচর কথা বলিয়া থাকি, তাহার মধ্যে যে কত অলঙ্কার লুকাইয়া থাকে, আমরা তাহার সংবাদ লই না। আমি বলিলাম, 'অমুকের বড় সূক্ষ্ম বুদ্ধি।' এই কথাটীর মধ্যে সাদৃশ্য লুকাইয়া রহিয়াছে। 'সূক্ষ্ম' এই শব্দটি জড়বস্তুসম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'সূক্ষ্মসূত্র' 'সূক্ষ্মবস্ত্র' 'সূক্ষ্ম বালুকাকণা' ইত্যাদি। বুদ্ধি তো জড় বস্তু নয়, তবে তাহাতে 'সূক্ষ্ম' শব্দের আরোপ কেবল সাদৃশ্য লইয়া। যে বস্তু সূক্ষ্ম, তাহা অনায়াসে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, যেমন 'সূক্ষ্ম সূত্র' 'সূক্ষ্ম বালুকাকণা'। বুদ্ধি যখন তাহার বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহাকে এই জন্য সূক্ষ্ম বলা হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত 'স্থূল বুদ্ধি'। এখানেও দেখা যাইতেছে, জড় বস্তু হইতে এ বিশেষণটিও গৃহীত হইয়াছে। আমি বলিলাম, 'আমার মনের বেগ কিছুতেই থামাইতে পারিতেছি না।' এই বেগ শব্দটি জড় পদার্থের বেগ দর্শন করিয়া তাহা হইতে মনে আরোপ করা হইয়াছে। একটি নয় দুইটি নয়, শত শত শব্দ এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থকে। বহির্জগতের বিষয় সমুদায় লইয়া প্রথমতঃ শব্দ সকল উপস্থিত হয়। মনোজগতের বিষয় বলিতে গিয়া আমরা উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পাই না। তাই বহির্জগদ্ঘটিত শব্দ গুলি সাদৃশ্যদর্শনে মনোজগতে আরোপ করি। এ পন্থা কিন্তু আলঙ্কারিকের পন্থা কেন না অলঙ্কারিকেরা অধিকাংশ স্থলে সাদৃশ্য লইয়া অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে কেবল শব্দঘটিত প্রচ্ছন্ন অলঙ্কারের কথা বলা হইল। এ সকল ত আর কেহ অলঙ্কার বলিয়া গণ্য করে না। না করিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। এসকল প্রয়োগ ভাষাকে ভূষিত করিবার জন্য নয়, অভাব পূরণ করিবার জন্য। যেখানে অভাবপূরণ জন্য কিছু করা হয়, সেখানে চমৎকারিতা থাকে না, নিতান্ত সামান্য ব্যবহারিক ব্যাপার হইয়া পড়ে। এইরূপে ব্যবহৃত শত শত শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও সে সকল সাদৃশ্য আমাদিগের মনকে চমৎকৃত করে না। যেখানে সাদৃশ্য বলিয়া জ্ঞান থাকে না, কেবল প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতেছি মনে হয় সেখানে কোন চমৎকারিতা থাকিবে না, এ আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সুতরাং একএকটিশব্দনিহিত প্রচ্ছন্ন অলঙ্কারকে আমরা অলঙ্কার হইতে বাদ দিতে বাধ্য

হইতেছি। অলঙ্কারের প্রকৃত স্থল কোথায় আমরা বলিতেছি।

ভাবোত্রিক্ত হৃদয় হইতে সহজে অলঙ্কার উৎপন্ন হয়। আমরা যখন কোন ভাবের অধীন না হইয়া প্রচলিত ভাবে কথা বলি, তখন বলিতে পারা যায় তাহাতে কোন অলঙ্কার থাকে না। কিন্তু হৃদয় যখন ভাবের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়, তখন ভাষা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে। যদি কোন বিশেষ অলঙ্কারও না থাকে তথাপি সে ভাষা আর ব্যবহারিক ভাষায় অনেক প্রভেদ। মনে কর, আমার সন্তানের অত্যন্ত অসুখ, আমার মনে তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কা উপস্থিত। এই সময়ে সে তীব্র বেদনায় বিছানায় ছট ফট করিতে লাগিল, আমি আর আমার ভাব সামলাইতে পারিলাম না, বলিয়া উঠিলাম "ওরে আমার বাছার কি হলো রে।" এখানে কোন অলঙ্কার নাই, তবু এর ভাষা, আর 'মহাশয় আমার ছেলের কি হয়েছে?' এ ভাষা এত দূর পৃথক্ যে, দুটিকে কখনই এক শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায় না। 'ওরে, আমার বাছার কি হলো রে,' ইহার মধ্যে অলঙ্কার না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ অলঙ্কারের প্রবেশের অবকাশ যে উপস্থিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর একটু শোকের আবেগ হইলেই বলিয়া ফেলিব 'ওরে, আমার বাছার চাঁদমুখ যে শুকাইয়া গেল।' এখানে দেখ 'চাঁদমুখ' এই কথায় অলঙ্কার আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। অলঙ্কারের প্রবেশাধিকার হয় বলিয়াই ভাবোদ্রিক্ত বাক্যমাত্রই কাব্য, এবং সেই কাব্যের ভূষণ অলঙ্কার। এ অলঙ্কার যে স্বভাবের প্রেরণায় উপস্থিত হয়, আমরা যাহা বলিলাম তাহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে। বুড়ী দিদীমাও যে অনেক সময়ে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অলঙ্কার ব্যহার করিয়া থাকেন, ইহা তো আমরা প্রতি দিনই দেখিতেছি। দিদীমা বলিলেন, 'আমার চাঁদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।' এখানে দেখ কত বড় একটা অলঙ্কার উপস্থিত। যাউক আমরা আজ এই পর্য্যন্ত বলিলাম, যদি কোন ব্যাঘাত না হয়, আমরা অল্পে অল্পে অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠিকাগণকে বিদিত করিব ইচ্ছা রহিল।

ছুয়ে এক কিরূপে?

প্রেম দুই ব্যক্তিকে এক করে। যখন দুই ব্যক্তি এক হইয়া যায়, তখন তাহাদের ভাব রুচি প্রকৃতি সকলি এমনি ভাবে এক হইয়া যায় যে, এক জনের যে অভাব হয় অপর ব্যক্তি তাহা অনুভব করে। সহানুভূতি এরূপ গাঢ়তর হইয়া উঠে যে একজনের পীড়া হইলে আর একজন রুগ্ন ও ক্লিষ্ট হয়, এক জনের ক্ষুধা হইলে অপর ব্যক্তি কষ্ট অনুভব করেন। দুই ব্যক্তির রুচি এমনি এক

হইয়া যায় যে, এক ব্যক্তি বিশেষ কোন দ্রব্য খাইতে বা পরিতে ভাল বসিলে অপর ব্যক্তি তাহা আপনাপনি এমনি বুঝিতে পারেন যে, তাহা মুখে না ব্যক্ত হইলেও তিনি ঠিক সেইরূপ খাদ্য ও পরিধেয় প্রস্তুত করিয়া রাখেন। একজন যদি উদার বা প্রেমিক হন অপর ব্যক্তির মন অজ্ঞাতসারে উদারতা বা প্রেমের দিকে ধাবিত হয়। এক ব্যক্তি জ্ঞানী হইলে অপর ব্যক্তির মনে বিদ্যার প্রতি অনুরক্ত হয়, এবং তাঁহার ভাব ভঙ্গি সকলি পণ্ডিতের মত অমনি অমনি হইয়া উঠে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নী যিনি, তাঁহার ঘটে সংস্কৃত বিদ্যা থাকুক বা না থাকুক তাঁহার বাহ্য চাল চলন দেখিলে তিনি যে পণ্ডিতের স্ত্রী তাহা সহজে বুঝা যায়। শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধই হউক মুখে অনর্গল দুই চারিটি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া দেন। পণ্ডিত ঠাকুরাণী বলিয়া মেয়ে মহোলে তাঁহার বড় মান। দাম্পত্য প্রেম স্বাভাবিক। ইহার গূঢ়তত্ত্ব এত অপূর্ব্ব যে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এক জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ বিভিন্ন বংশে উদ্ভূত, ভিন্ন গ্রামবাসী, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহারা পরস্পরকে পর বলিয়া জানিতেন, কোন স্নেহ বা প্রেম দুজনের মনে বর্ত্তমান ছিল না। বিবাহরজনীতে উদ্বাহমন্ত্র পাঠ হইলেই কোন গূঢ় প্রস্রবণ হইতে প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইয়া পরস্পরের হৃদয়কে পরিপ্লাবিত যে করিল তাহা কে বলিতে পারে? দাম্পত্য প্রেমতত্ত্ব ভাবিলে তাহার ভিতর সাক্ষাৎ ভগবানের হস্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও অবাক্ হইতে হয়, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক হইলেও ইহাকে নিয়মিত ও পবিত্র করিবার জন্য সাধন চাই। সাধন না হইলে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। দাম্পত্যপ্রণয়সাধনহীন রমণীর মনে এই স্বর্গীয় ভাব স্বাভাবিক আকারে বিদ্যমান থাকে। ক্ষণিগর্ভস্থ কর্দ্দম-মিশ্রিত সুবর্ণরেণুর ন্যায় ইহা ভাল মন্দে মিশ্রিত থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখিয়াছি যে, স্বামীর একটু পীড়া হইলে স্ত্রী চীৎকার রবে কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষে করাঘাত করিয়া আকাশ পাতালকে এক করিয়া ফেলেন, কিন্তু সেই স্বামী আরোগ্য লাভ করিলে সামান্য সামান্য কথা লইয়া তাঁহাকে এমনি কষ্ট প্রদান করেন যে, তাহাতে তাঁহার অন্তরে মৃত্যু অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা অনুভূত হয়। তাঁহার যদি মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয়, স্ত্রী অমনি তিক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন, গরম জলে স্নান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা জল আনিয়া বসেন, এবং কলায়ের দাল খাইতে চাহিলে অরহর দাল প্রস্তুত করিয়া বলিতে থাকেন ইহা খাইতে হয় খাও। আমি কি তোমার চাকরাণী যে তোমার সেবা করিতে পান থেকে চূণ খসিবে না। রাত্রিতে গৃহের দ্বার খুলিয়া শুইতে

ইচ্ছা করিলে গৃহিণী চারি দিকের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরকে একটি সিন্ধুকের মত প্রস্তুত করিয়া দেন। যদি স্বামী একটু আপন রুচি বা ইচ্ছার কথা স্ত্রীকে অবগত করেন অমনি লাঠালাঠি, মহা বিবাদ। ছোট ছোট বিষয়ে স্বামীর রুচি সুখ সচ্ছন্দতা বুঝিয়া যে স্ত্রী বলিতে না পারেন, তাঁহার দাম্পত্য প্রণয় সাধন হয় নাই। তাঁহার গৃহে শান্তি নাই ও কথায় কথায় স্বামীর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হয়। সে গৃহের ছেলে মেয়েরা সদ্দৃষ্টান্তের অভাবে বিপথগামী হয়। আবার যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর রুচি বুঝিয়া চলিতে না পারেন, তথায়ও শান্তি থাকিতে পারে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া সর্ব্বদা বিবাদ করিতে করিতে স্ত্রীর মত খিট্‌খিটে ক্রোধান্ধ ও শান্তিবিহীন হন, এমন কি তাঁহার শরীর পর্য্যন্ত রুগ্ন হইয়া যায়। আমরা অনেক সময় এরূপ দেখিয়াছি যে, স্ত্রী নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চান, গৃহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাত্ত্বিকভাবে রাখিতে চান, কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি বিপরীত প্রকারের, তিনি অপরিষ্কারকে অপরিষ্কার বলিয়া বুঝিতে অক্ষম, এমন করিয়া ব্যবহার করিয়া ফেলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর অত্যন্ত বিরক্তি হইয়া পড়ে এবং মনোভঙ্গ ও গৃহে বিবাদাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। স্ত্রী পুরুষ দুই জনে যখন এক হইলেন, তখন ক্ষুদ্র ও বড় সাংসারিক ও অরাপর সকল বিষয়ে যদি তাঁহারা এক না হইতে পারেন তাহা হইলে পদে পদে বিপদ। একটি শরীরের এক অঙ্গ অপর অঙ্গের প্রতিকূলে দাঁড়াইলে যেরূপ ভয়ানক ব্যাপার হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘটিত হইয়া উঠে। ধর্ম্ম ও নীতিতে তো তাঁহারা দুই জনে এক হইবেনই। এক মাতার কোলে বসিয়া তাঁহার সুপুত্র ও সুকন্যা মার দুইটি স্তন পান করিতে করিতে তৃপ্তিরসে মগ্ন হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে পরস্পরের ভাবে পরস্পরে মগ্ন হইলে যেরূপ হয় জগন্মাতার কোলে স্ত্রী ও পুরুষ দুই জনে প্রেমরসে এক হইয়া গেলে সেইরূপ ভাবাপন্ন হইবেন। যে দম্পতি ছোট বিষয়ে এক হইতে পারেন না, তাঁহারা কখনই বড় বিষয়ে এক হইতে সক্ষম হইবেন না। যথার্থ পতিপ্রেম যে রমণী সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, স্বামীর রোগ হইলে তিনি আপনি রুগ্না হন, স্বামী দরিদ্র হইলে তিনি নিজে দরিদ্রা হন, স্বামী কোন শোক দুঃখে দুঃখিত হইলে তিনি অগ্রে দুঃখিতা হন। তিনি স্বামীর রুচি ভাব সকল এমনি বুঝিয়া চলেন যে, স্বামীর যে দিন যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা ব্যক্ত না হইলেও ঠিক প্রেমযোগে তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই খাদ্য গৃহে প্রস্তুত করিয়া রাখেন। স্বামীর রুচিভাব সমস্তই সহানুভূতির নিগূঢ় নিয়মে

তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। স্বামীও এমনি স্ত্রীর ভাবে ভাবাপন্ন হন যে, তাঁহার আচার ব্যবহার চাল চলন স্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুরূপ হয়। দুই জনকে দেখিলে বোধ হয় যে,তাঁহারা এক বৃক্ষের দুই শাখা, এক শরীরের দুইটি অঙ্গ,তাঁহারা দুইজনে এক। এরূপ একতা কেবল পুণ্যেতেই হইতে পারে। রাগ হিংসা, স্বার্থপরতা অথবা বিলাস বাসনা থাকিলে এরূপ একতা কখনই সম্ভবে না। নরকের সয়তানেরা পরস্পরের সহিত যেরূপ মিলিতে হইতে চির কালই অক্ষম, স্ত্রী ও পুরুষ তদ্রূপ পাপ, বিলাসবাসনা ও ইন্দ্রিয়াসক্তিতে দুই জনে কখন এক হইতে পারেন না। রাগ, হিংসা স্বার্থপরতা অথবা বিলাস যদি উভয়ের মনে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত তাঁহাদের একতার কারণ না হইয়া আরও অশান্তি ও বিবাদের হেতু হইয়া উঠে। অতএব ভগবান্‌কে মধ্যে রাখিয়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সকল বিষয়ে এক হইয়া যাও।

স্বর্ণরেণু।

যেখানে ভালবাসা সেখানেই অন্ধতা। মানুষ যদি বিচার করিয়া ভাল বাসিত তবে এ সংসারে কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারিত না।

পরামর্শ দান করা অপেক্ষা গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়া অধিক মহৎ।

যে অপরকে বিচার করিতে ব্যস্ত হয় সে অগ্রে যেন আপনাকে বিচার করে।

বন্ধুতার প্রথম সোপান বিশ্বাস, দ্বিতীয় শ্রদ্ধা, এই দুই বস্তু বিনা বন্ধুতা স্থায়ী হয় না।

ভক্ত যেমন ভগবান্ ছাড়া নহেন, ভগবান্ তেমনি কখনও ভক্ত ছাড়া নহেন।

ভক্ত যেমন ভগবানের ইচ্ছা মত কার্য্য করেন, ভগবানও তেমনি ভক্তের সকল বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

বিবেক আত্মার বাণী, রিপু সকল শরীরের প্রবৃত্তি।

দয়াশূন্য দান অপেক্ষা অন্তরের সহিত দুটি মিষ্ট কথাও ভাল।

সকল অবস্থার মধ্যে যে তুল্য ব্যবহার করে সেই যথার্থ আত্মীয়।

নারীর পরিচ্ছদ, ব্যবহার, আলাপ, দৃষ্টি, মন, আত্মা, সকলি পবিত্র হওয়া উচিত।

যে যোগ ও বন্ধন ইহ জীবনে আরম্ভ এবং এখানেই শেষ হয় তাহা অনিত্য, কিন্তু যে বন্ধন ইহজীবনে আরম্ভ হইয়া পরজীবনে অনন্তকাল থাকিবে তাহাই প্রাণ অন্বেষণ করুক।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৮ সংখ্যা।] অগ্রহায়ণ, সন ১২৯৫। [১১ খণ্ড।

মোর্শেদাবাদ।

মোর্শেদাবাদ নগর বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে দেড়শত মাইলের অধিক দূরে নহে। এ নগরের বৃত্তান্ত পরিচারিকায় কেন লিখিতে প্রবৃত্ত, ইহার শ্রী সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য এখন এমন কি আছে যে, উল্লেখযোগ্য হইতে পারে? পাঠিকাগণ এ প্রশ্ন করিতে পারেন। হাঁ, এখন মোর্শেদাবাদের শ্রীসম্পদ্ বিশেষ কিছুই নাই, যাহা ছিল তাহা বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এ নগর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, এই মোর্শেদাবাদ একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী এবং এ দেশের সৌভাগ্য ও গৌরবের ভূমি ছিল। বঙ্গের রাজধানী গৌড়নগর ধ্বংস হইলে পর প্রায় তিন শত বৎসর হইল নবাব মোর্শেদ কোলি খাঁ স্বনাম অনুসারে এই মোর্শেদাবাদ নগর স্থাপন ও এখানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। বণিগ্বেশধারী ইংরেজগণ প্রথমে এই মোর্শেদাবাদেই আপনাদের অধিকার স্থাপন করিয়া ক্রমে অল্প দিনের মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারত রাজ্য গ্রাস করিয়া বসেন। যাঁহা হইতে ইংরেজ কোম্পানির বঙ্গদেশে রাজত্বের সূত্রপাত হয় সেই লর্ড ক্লাইভ, মোর্শেদাবাদের সন্নিহিত বহরমপুরে স্থিতি করিতেন। প্রথমতঃ কোম্পানির প্রধান ধনাগার ও বিচারালয়াদি এবং প্রকাণ্ড সেনানিবেশ সেখানে ছিল। সেই সমস্ত অট্টালিকা শ্রেণীবদ্ধরূপে এখনও বিদ্যমান। এখন অনেক গুলি অট্টালিকা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, কতক গুলি বিচারালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, কতকগুলিতে জজ মাজিষ্ট্রেট আদি রাজ কর্ম্মচারিগণ বাস করিতেছেন, অন্য অন্য রাজকার্য্যালয় ও জেইল ইত্যাদি সেই অট্টালিকা শ্রেণীর এক এক বিভাগ আশ্রয় করিয়া আছে। পূর্ব্বে এখানকার সেনানিবেশের ন্যায় বৃহৎ সেনানিবেশ অন্য কোথাও ছিল না। ইংরেজরা অল্প দিন মোর্শেদাবাদে রাজধানী রাখিয়া পরে কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করেন।

পাঠিকাগণ নবাব সেরাজোদ্দওলার নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইনি বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব বা সুবাদার। সেরাজোদ্দওলা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র। সেরাজোদ্দওলা অত্যন্ত

ইন্দ্রিয়পরায়ন, অত্যাচারী, উদ্ধত, দুরাচার ও মূর্খ ছিলেন। "যৌবনং ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকতা, একৈকমপ্যনর্থায় কিমুতত্র চতুষ্টয়ং।" অর্থাৎ যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবেকতা এই চারির একটিই অনর্থের কারণ। যাহাতে চারিটির যোগ হইয়াছে তাহা হইতে যে কত অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। সেরাজোদ্দওলার জীবনে সেই চারিটির একত্র মিলন হইয়াছিল। প্রথম যৌবনে উনিশ কি একুশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সেরাজোদ্দলা বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা রাজ্য শাসন ভার স্বীয় বৃদ্ধ মাতামহ আলিবর্দ্দি খাঁ হইতে প্রাপ্ত হন। তিন বৎসর মাত্র নবাবী করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ মোহপরবশ হইয়া সেই অযোগ্য পাত্রে এই গুরু ভার অর্পণ করেন। দিল্লির বাদশাহের সনন্দ ব্যতীত কেহ কোন দেশের নবাব হইতে পারিত না। তদানীন্তন ভারতসম্রাট্ দিল্লির বাদশাহ এরূপ নিষ্প্রভ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সেরাজোদ্দওলার বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিতে তাঁহার নিকটে আর সনন্দ প্রার্থনার প্রয়োজন হয় নাই। সেরাজোদ্দওলা নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়া বহুদর্শী ও বিচক্ষণ প্রাচীন মন্ত্রী ও প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে অপমানিত ও পদচ্যুত করিলেন, তাহাদের স্থানে ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্দ্দান্ত নবযুবা সকল তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইল। তখন হইতে তিনি নিয়ত স্ত্রী পুরুষের প্রতি লোমহর্ষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সন্তান জরায়ুকোষে কি ভাবে স্থিতি করে তাহা দর্শন করিবার জন্য গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের উদর পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করা হইত। তাঁহার ভীষণ অত্যাচারে সকল লোক সর্ব্বদা সশঙ্কিত ছিল ও ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল। বণিগ্বেশেধারী ইংরেজগণ এই সময় কলিকাতায় বাণিজ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা সেরাজোদ্দওলার বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। তিনি তাঁহাদিগকে যার পর নাই লাঞ্ছিত ও বিপন্ন করেন। ইংরেজদিগের প্রতি এই অত্যাচারই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ ও ভারতে ইংরেজরাজ্যের সূত্রপাত হইল। কিয়দ্দিনের মধ্যে ইংরেজগণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেরাজোদ্দওলার বিরুদ্ধে মোর্শেদাবাদ অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। বহরমপুরের দশ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে ভাগীরথী তীরস্থ পলাশী নামক স্থানে সেরাজোদ্দওলার সৈন্যের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ হয়। নবাবের প্রধান সেনাপতি মিরজাফের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদিগের সঙ্গে যোগদানপূর্ব্বক কপটভাবে সংগ্রাম করেন, সুতরাং সহজেই ইংরেজেরা জয়ী হন। সেরাজোদ্দওলা স্বীয় পরাজয় দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া জল পথে রাজমহল অভিমুখে পলায়ন করেন। তিনি পথে ধরা পড়িয়া মোর্শেদাবাদে আনীত হন। মিরজাফেরের পুত্র মিরণের

আজ্ঞাক্রমে তাঁহার এক অনুচর সেরাজোদ্দওলার শিরশ্ছেদন করে। ১৭৫৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন মিরজাফের ইংরেজ কোম্পানি কর্ত্তৃক বাঙ্গালার সুবেদারের পদে আরূঢ় হন। সেই সময় মিরজাফের নামেমাত্র নবাব, কর্ত্তৃত্ব এক প্রকার ইংরেজদিগের হস্তে ছিল। পরে মিরজাফেরের জামাতা মিরকাশেম কিছুকাল নবাব হন। তিনি বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্বীকার করিয়া কোম্পানির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। এখন হইতে ইংরেজ কোম্পানি রীতিমত বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার রাজা হইলেন। পরে তাঁহারা কিছু দিনের মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা প্রভু হইয়া উঠেন, সমুদায় রাজা মহারাজ তাঁহাদের পদানত হইয়া পড়েন। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা। কি সামান্য সূত্র হইতে মহাব্যাপার হইল। বর্ত্তমান নবাব উপাধিধারী হোসেন আলিমির্জা মির জাফেরের বংশসম্ভূত। এই নবাব বংশ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, নবাব হোসেন আলি মির্জার অনেক গুলি লম্বা লম্বা উপাধি আছে। ইনি বিলাতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে একটী বিবী আনিয়া অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়াছেন। শুনিয়াছি বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অপর অনেক যুবতী ইহাঁর অন্তঃপুরে আছে। পশু সকলকে শস্যক্ষেত্রে চরিতে দেখিলে যেমন খোওয়ারে আনিয়া বদ্ধ করা হয় তদ্রূপ বাদশাহ নবাব প্রভৃতি হতভাগা বড় মানুষেরা কোন সুন্দরী যুবতী কোথাও পাইলে আপন অন্তঃপুরে বদ্ধ করেন। হোসেন আলি মির্জা ইয়ুরোপে খ্রীষ্টীয় সমাজে অনেক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এক ভাবে ইনি বেশ ভাল মানুষ, কিন্তু ইয়ুরোপীয় সভ্যতা ও খ্রীষ্টীয় বিশুদ্ধ নীতি ইহাঁর চরিত্র ও জীবনকে সংস্কৃত ও সমুন্নত করিতে পারে নাই। শুনিতে পাই পূর্ব্ববৎ এখনও নবাবের অন্তঃপুরে একটির পর একটি করিয়া ৩।৪ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পাহারা তৎপর খোজার পাহারা চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে বর্ত্তমান নবাব ব্যক্তিগত ভাবে মাসিক ষোল হাজার টাকা পেন্‌সন প্রাপ্ত হন। সমগ্র নবাব পরিবারের জন্য বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকামাত্র বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। ইহাঁর দুই পুত্র এখন ইংলণ্ডে আছেন। এই নবাবের পিতাও বিলাতে গিয়াছিলেন। তখন নবাব পরিবারের জন্য বার্ষিক ১৬৲ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। উক্ত নবাব সমুদায় টাকা নিয়মিত রূপে পাইতেন না, সেই টাকা উদ্ধার বা বৃত্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। শ্রুত হইল সাক্ষাৎ মাত্র মহারাণী ভিক্‌টরিয়া রীতিমত তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি হস্ত অপবিত্র হইল ভাবিয়া সাবান দ্বারা প্রক্ষালন করেন। মহারণী তাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন, ভোজে

তিনি কিছুই ভোজন করেন নাই। আবার এদিকে তিনি একটি নীচ শ্রেণীর বিবীকে গ্রহণ করেন। এজন্য ইংলণ্ডে তাঁহার অতিশয় অখ্যাতি ও অসম্মান হয়। তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক পরে হ্রাস হইয়া যায়। পূর্ব্বে মোর্শেদাবাদে নবাব পরিবারের জন্য বার্ষিক ৫৩৲ লক্ষ্য টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল, পরে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া ১৬৲ লক্ষ হয়, এক্ষণ ছয় লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

মোর্শেদাবাদে নবাবের প্যালেস দর্শনযোগ্য। ইহা সহস্র দ্বারযুক্ত সুবৃহৎ ত্রিতল প্রাসাদ। মির জাফের হইতে সমুদায় নবাবের ও তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদির অনেক গুলি অত্যুৎকৃষ্ট ও বৃহৎ তৈলচিত্র এখানে রক্ষিত আছে। কিন্তু নবাবপরিবারের পুরুষের ছবি ব্যতীত একটি বালিকারও ছবি নাই। ইউরোপের অনেক রাজা ও বড় মানুষের চিত্র আছে। নবাব ও রাজাদের ছবির সঙ্গে কয়েকটি অর্দ্ধ নগ্ন বাইজীর ছবি এক স্থানে রক্ষিত। ইহাতে অতি কুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রাসাদে এক শত এক বাতির একটি সুবৃহৎ সুন্দর কাচের ঝাড় আছে। মোর্শেদাবাদের এমামবাড়ী অত্যন্ত বৃহৎ। নবাবপরিবার শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং মহরমের সময় অত্যন্ত সমারোহ হয়। নবাবের অন্তঃপুরস্থ অট্টালিকাশ্রেণী প্রায়ই একতালা, উপরে উঠিলে কোন বেগমের উপরে বা কাহার চক পড়ে, কোন বেগম বা অন্য পুরুষকে দর্শন করেন, এই ভয়ে বোধ করি দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। নেজামতকলেজ নামক এখানে একটি কলেজ আছে। নবাববংশের বালকগণ এই কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন। নবাববাড়ীসংক্রান্ত সমুদায় অট্টালিকা ভাগীরথীর উত্তর কূলে শোভমান। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর ও নবাব সেরাজ্জোদ্দওলার প্রাসাদ গঙ্গার অপর পারে ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার কোন চিহ্ন নাই। কেবল দক্ষিণ কূলে খোসবাগনামক স্থানে আলিবর্দ্দি খাঁর ও সেরাজ্জোদ্দওলার এবং সেই বংশের অপর কয়েকটি লোকের কবর আছে। একটি জামামস্‌জেদের সম্মুখভাগে অন্য একটি অট্টালিকার ভিতরে সেরাজ্জোদ্দওলার ও তাহার মাতামহের সমাধি বিদ্যমান। কবরের উপরে মৃত ব্যক্তিদের নাম বা অন্য কোন বিবরণ লিখিত নাই। কেবল তত্রত্য লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়। অপর এক স্থানে দুইটি কবরের উপর প্রস্তরফলকে কোরাণের কতকগুলি বচন অঙ্কিত আছে। একটির প্রস্তরফলকের এক প্রান্তে আশ্‌রফোদ্দওলা, ১২০২ হেজরি সালে মৃত্যু, আরব্য ভাষায় এই কথা অঙ্কিত আছে। আশ্‌রফোদ্দওলা নাকি সেরাজ্জোদ্দওলার ভ্রাতা ছিলেন। মোর্শেদাবাদে একটি গোরস্থান আছে, তাহাতে মির জাফের ও মণিবেগম প্রভৃতির সমাধি

বিদ্যমান। এখানেও কোন কবরে রীতিমত কিছুই লিখিত নাই। এই গোরস্থানের অনতিদূরস্থ কাটরানামক স্থানে আদি নবাব মোর্শেদকোলি খাঁর সমাধি রহিয়াছে। একটি বৃহৎ মস্‌জেদের সম্মুখস্থ সমুচ্চ প্রাঙ্গণের সোপানাবলীর নিম্নে মোর্শেদকোলিখাঁর কবর। তিনি মৃত্যুকালে এরূপ স্থানে তাঁহার দেহ সমাহিত করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের উপর দিয়া নমাজ পড়িতে লোকে যেন মস্‌জেদে গমনাগমন করে, এই উদ্দেশ্য ছিল। সেই মস্‌জেদে এখন আর কেহ নমাজ পড়ে না, উহা ভগ্ন ও পতনোন্মুখ হইয়া আছে। মস্‌জেদের দ্বারের উপর প্রস্তরফলকে একটি পারস্য কবিতা লিখিত আছে। শ্রুত হইল মোর্শেদকোলিখাঁ ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মোসলমান হন।

গোরা বাজার হইতে আরম্ভ করিয়া জিয়াগঞ্জ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী ১২ মাইল পথ এক প্রকার মোর্শেদাবাদ নগরের অন্তর্গত। মধ্যে করবলা নামে অভিহিত প্রান্তর কতক দূর স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং অপর কয়েক স্থান ও লোকালয় শূন্য আছে। বহরমপুরের পশ্চিমাংশে খাগড়া, খাগড়াতে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। এখানে ৩। ৪ টি মুদ্রা যন্ত্র আছে, এবং তিন চারি খানা সাময়িক পত্র এ স্থান হইতে প্রকাশিত হয়। খাগড়ার কাঁসার থালা বাটী গেলাস প্রসিদ্ধ। এখানে হস্তিদন্তে যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য হয়, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। গোরাবাজার বহরমপুর খাগড়া সৈয়দাবাদ এই কয়েক স্থানে হাকেম ও আমলা উকিল এবং অন্য অন্য ভদ্রলোকের বাস। লালবাগ ও জাফেরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মোসলমানেরই অধিক বসতি। বিষয় কর্ম্ম ও ব্যবসায় বণিজ্য উপলক্ষে পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক হিন্দু মোসলমান মোর্শেদাবাদে আসিয়া বসতি করে। বংশপরম্পরা সেই অবধি এখানেই আছে। এক্ষণে তাহারা এক প্রকার বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। নবাববাড়ী ও তৎসংক্রান্ত সমুদায় অট্টালিকাদি জাফেরগঞ্জে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বিদ্যমান। বর্ত্তমান নবাবের বৃদ্ধা পিতামহী প্রাসাদে বাস না করিয়া সর্ব্বদা একটি বৃহৎ বজরায় গঙ্গাতে বাস করেন। ছিপ দিয়া মৎস্য শিকার করার তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ, এজন্য তিনি নিরন্তর পোতোপরি স্থিতি করিতেছেন, কেহ কেহ বলেন যে, ভূমিকম্পে বা অট্টালিকা পড়িয়া যায় এই ভয়ে বৃদ্ধা জলে বাস করেন। জিয়াগঞ্জে ও বালুচরে এবং ভাগীরথীর অপর পার আজিমগঞ্জে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ধনী বড় মানুষদিগের বসতি। রেশম ও মণিমুক্তা ইত্যাদির বাণিজ্যে ইহাঁদের অনেকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। বালুচরের খ্যা-

তনামা ধনী লক্ষ্মীপত সিংহের এবং আজিমগঞ্জের ধনপত সিংহের ঘরে এখন লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি সেরূপ নাই। লক্ষ্মীপত বহু লক্ষ টাকার ঋণগ্রস্ত। লক্ষ্মীপতসিংহ পরলোক গত, তাঁহার পুত্র ছত্র সিংহ বিদ্যমান। লক্ষ্মীপত-সিংহের একটি বৃহৎ উদ্যানবাটী আছে, সেখানে তাঁহার তোষাখানা ও জৈন-মন্দির রহিয়াছে, সেই উদ্যান দর্শন-যোগ্য। নশিপুরে প্রসিদ্ধ ধনী জগৎ শেটের নির্ম্মিত দেবালয় বিদ্যমান। মোর্শেদাবাদের এক স্থানে একটি বৃহৎ পুরাতন কামান পড়িয়া রহিয়াছে, বোধ হয় তাহা ঢাকা নগরের চক বাজারস্থিত কামান অপেক্ষা বৃহৎ। হেমমঞ্জেল ও মতিঝিলবাড়ী প্রভৃতি মোর্শেদাবা-দের দর্শনীয় সামগ্রীর মধ্যে গণ্য। শুনা যায় মতিঝিলের ঝিনুকে মুক্তা জন্মিত, তাহাতেই উহা মতিঝিল নামে পরিচিত হইয়াছে। এই ঝিলের কূলে দর্শনযোগ্য প্রাসাদ আছে। পূর্ব্বে বাণিজ্যোপলক্ষে পোর্টগিজ ফরাশি ও ওলেন্দাজ প্রভৃতি বহু ইয়ুরোপীয় লোক মোর্শেদাবাদে বাস করিত। মোর্শেদা-বাদ রেশোমের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল, এখানে তাহাদের রেশমের কুটি ছিল। অনেকের কার্পাস ও নীলের কারবারও ছিল। মোর্শেদাবাদের যে স্থানে ফরাশিদিগের বসতি ছিল তাহা ফরাশডাঙ্গা নামে পরিচিত, উহার অনেক দূর নদীতে ভগ্ন হইয়াছে। বহরমপুরের অতিদূরস্থ কাশেম বাজা-রের দিকে বহু ইয়ুরোপীয় লোকের গোরস্থান সকল রহিয়াছে। সম্প্রতি একজন ওলন্দাজ ভদ্রলোক আপন পিতামহ বা প্রপিতামহের সমাধি দর্শন করিতে কাশেমবাজারে গিয়াছিলেন। এখনও মোর্শেদাবাদে উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন ও মহামূল্য পট্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, কিন্তু পূর্ব্বরূপ বাণিজ্যের উন্নতি আর নাই। মোর্শেদাবাদ জেলায় অনেক রাজা জমিদার বড় মানুষ আছেন। প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালিনী ভূম্যাধিকারিণী সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশেমবাজারে স্থিতি করেন। তাঁহার ব্যয়েই এক্ষণে বহরম-পুর কলেজ চলিতেছে। তিনি প্রতি-দিন নিজ বাটীতে প্রায় ৫০০ শত কাঙ্গালিকে অন্ন দান করেন। মোর্শে-দাবাদে নবাবী আমলের শাহী শড়ক নামে একটি শড়ক ছিল, তাহা গঙ্গা অনেক দূর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই জিলায় তিনটি সবডিবিজন, লালবাগ, কান্দি ও জঙ্গিপুর। মহারাণী স্বর্ণময়ী অপেক্ষাও কান্দির রাজাদিগের জমী-দারী বৃহৎ। শ্রুত হইল মহারাণী স্বর্ণ-ময়ীর বার্ষিক আয় আট লক্ষ টাকা। জঙ্গিপুর বাণিজ্যপ্রধান নগর। এখানে রেশমের বিশেষ আমদানি। প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্র পলাশি প্রান্তরে ইংরেজ গবর্ণ-মেণ্ট একটি মনোমেণ্ট স্থাপন করি-য়াছেন। পূর্ব্বে এ স্থানে সচরাচর ডাকাতি হইত, এক্ষণে লোকের বসতি

হইয়াছে। এখানে একটি আমের বাগান ছিল যুদ্ধকালে সেই সকল আম্র বৃক্ষে যে সমস্ত গোলা গুলি বিদ্ধ হইয়া-ছিল তাহার চিহ্ন স্পষ্টতঃ ছিল। এক্ষণে সেই আমের গাছ একটিও নাই, সমু-দায় মরিয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের কোন নগরে যাহা নাই, মোর্শেদাবাদে এমন এক জিনিষ আছে, উহা পশ্চিম অঞ্চ-লের অপূর্ব্ব এক্কা গাড়ী। অন্যবিধ ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীও এখানে সুলভ। কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে বা ষ্টীমারে বরাবর ভাগীরথীদিয়া মো-র্শেদাবাদে যাওয়া যায়। স্থলপথে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়তে নলহাটি যাইয়া পরে তথা হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইতে হয়, সেখান হইতে ক্ষুদ্র জাহাজযোগে মোর্শেদাবাদের সকল বিভাগে যাওয়া যাইতে পারে। এই উপায়ে কলিকাতা হইতে এক দিনেই মোর্শেদাবাদে যাওয়া যায়।

চিতোর।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বে যে "ছোটা কীর্ত্তমের" কথা বলা হইয়াছে, ইতিহাসে দেখা যায়, উহা ১৩০০ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীআলাত অর্থাৎ উলুজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। উক্ত সময় চিতোরের কিরূপ দুর্দ্দিন তাহা উপরেই লিখিত হইয়াছে, সে সময় অত বড় জয়স্তম্ভ কখনই নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব নহে, বিশেষতঃ ঐ সময় বা উহার পর শ্রীআলাত বা উলুজী নামে কোন রাজা দূরে থাকুক সর্দ্দারেরও নাম দেখা যায় না। একখানি প্রাচীন জৈন পাণ্ডু-লেখ্যে বর্ণিত আছে, ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে "উল্লুট" নামে এক জন পরাক্রান্ত রাজা সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই উল্লুট শ্রী-আলাত বা উলুজী নামে পরিচিত হইতে পারেন। সম্ভবতঃ ইনি জৈন ছিলেন, কারণ ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে ইহাঁর নাম বা কোন কীর্ত্তির উল্লেখ নাই। কেবল অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত এত গুলি রাজা রাজত্ব করিয়াছেন এই মাত্র লিখিত আছে। অনুমান হয় ঐ নিরুল্লেখিত রাজারা সকলেই জৈন ছিলেন। বিশেষতঃ উল্লুটের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই পূর্ব্ব নৃপতি মহারাজ খোমান শেষ জীবনে জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা ও ব্রাহ্মণ-দিগকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া দেন। খোমান ৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, "খোমান রাস" নামক একখানি ইতিহাসগ্রন্থে দেখা যায় ইহাঁর সময় প্রসিদ্ধ সম্রাট হারুণ অল-রসিদের পুত্র সম্রাটে আলমামুন পশ্চিম-ভারত জয় করিয়া চিতোর আক্রমণার্থ আগমন করেন। কিন্তু মহাবীর খোমা-নের নিকট এমন ভাবে পরাস্ত হন যে তাঁহাকে বন্দী হইয়া চিতোরের কারা-গারে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সম্রাট আলি মামুন ৮১৩ হইতে ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, খোমান ৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার পরে দুইজন রাজার অতি অল্প সময়ের জন্য সিংহাসন অধিকার করার পর ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উল্লুট রাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের ঘটনা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, আল মামুনকে জয় করিয়া রাজা খোমান উক্ত জয়স্তম্ভের সূত্রপাত করেন, কিন্তু উল্লুটের সময় উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন ইহার বয়স ১০৫৫ বৎসর।

এই স্তম্ভটিও আলাউদ্দীনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহার গাত্রে বৃহদাকার জৈন মূর্ত্তি সকল এমন সুন্দরভাবে খোদিত যে, তাহাদিগের হস্ত পদাদি মুখভঙ্গী হইতে কেশরাজি পর্য্যন্ত কিছুর মধ্যেই শিল্পীর গুণপনার ত্রুটি দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন হিন্দু মন্দিরের গাত্রে যে প্রকার চিত্র বিচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে তাহারও অভাব নাই, কিন্তু ইহার গঠনপ্রণালি ও কারুকার্য্য "বড় কীর্ত্তম" অর্থাৎ রাণা কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ অপেক্ষা মূল্যবান্। ফলতঃ ইহার স্থিতিতেই যে মহাকীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে তদ্দ্বারা ইহা শেষোক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার ভিতরে প্রবেশের পূর্ব্বে উনিশটি সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বারে উপনীত হইতে হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা আর অধিক দিন দণ্ডায়মান থাকিবে না। একটি বড় রকম ঝড় লাগিলেই ভূতলশায়ী হইতে পারে, কারণ কেবল যে সরল রেখা পরিত্যাগ করিয়া বক্রভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহা নহে, ইহার প্রকোষ্ঠ গুলির বাহিরে যে সমস্ত স্তম্ভরাজি উপর তলাকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিত, এখন তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে যাহার যে দিকে ইচ্ছা হেলিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠের উত্তর দিকে যে বারাণ্ডাটী ছিল সেটি একেবারে উক্ত প্রকোষ্ঠের পর্য্যন্ত কতক অংশ লইয়া নিম্নে পতিত হইয়াছে, এবং অপরাপর অংশ এমন অবস্থাপন্ন যে ভিতরে প্রবেশ করিতে ভয় হয়, করাও উচিত নহে। ইংরাজ বাহাদুর প্রাচীন কীর্ত্তি সকল রক্ষা করিবার জন্য অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন, এখানেও রাণী পদ্মিনী প্রভৃতির প্রাসাদ গুলি সংস্কার করিয়া হিন্দু জাতির ধন্যবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রাচীন স্তম্ভটি যদি রক্ষিত হইবার উপায় করেন, তাহা হইলে রাজপুত বীরত্বের প্রধান চিহ্ন রক্ষা পায়। সম্রাট হারুণ অল রসিদের পুত্র সম্রাট আল মামুনের বিপুল সেনাকে পরাস্ত করিয়া সম্রাটকে নিজ কারাগারে বন্দী করা বীরবর খোমানের অসামান্য কীর্ত্তি তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষত এইযুদ্ধে ভারতের সমগ্র হিন্দু রাজা যে প্রকার একতা প্রদর্শন করিয়া আপন আপন

প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহাও চিরস্মরণীয়। দ্বিতীয়তঃ এই স্তম্ভ অপেক্ষা আর কোন কীর্ত্তিই চিতোরে অধিক পুরাতন নাই।

"বড়াকীর্ত্তম" বা রাণা কুম্ভকর্ণের জয়স্তম্ভ। ইহার কতক বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এবার আমরা ইহার ইতিহাস ও শিল্পের বিশেষ বৃত্তান্ত বলিব। রাণা কুম্ভ বা কুম্ভকর্ণ ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৪৪০ অব্দে মালব ও গুজরাটের মুসলমান নৃপতিরা সমবেত হইয়া চিতোর আক্রমণ করিতে আইসেন। মিবার ও মালবের সীমায় উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয়। রাণাকুম্ভ এক লক্ষ অশ্বারোহী ও চতুর্দ্দশ শত রণহস্তী লইয়া গিয়াছিলেন। মুসলমান পক্ষেও আয়োজন অল্প ছিল না। স্তম্ভগাত্রে লিখিত আছে "তাহারা সমুদ্রসমান সৈন্য লইয়া পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে আসিয়াছিল।" কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, এবং মালবপতি মহম্মদ কুম্ভহস্তে বন্দী হইয়া চিতোরের কারাগারে নীত হন। এই ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ নগরপ্রাঙ্গণে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। ইহার সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে অতি বৃহৎ দুই খণ্ড শিলালিপিতে প্রায় দুই শত শ্লোকে কৃষ্ণের স্তব, মিবারের রাজবংশীয় তালিকা ও এই যুদ্ধের বিশেষ বৃত্তান্ত খোদিত আছে। উহাতে লিখিত আছে, সংবৎ ১৫০৭ সালে এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। সুতরাং একাদশবৎসর সময়ের মধ্যে ১২২ ফুট উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের বিবিধকারুকার্য্যবিশিষ্ট স্তম্ভ নির্ম্মাণ হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া ঈদৃশ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা ভাবিলে নির্ম্মাতার কৌশলকে কে না ধন্যবাদ দিবে। ইহার উপরে উঠিবার সিঁড়িগুলি কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তিকর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় দর্শকের অধ্যবসায় পরীক্ষার জন্য এ প্রকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। বাস্তবিক নির্ম্মাতার উদ্যম অধ্যবসায়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়া কিঞ্চিৎ অধ্যবসায় শিক্ষা করিবার জন্য এ কষ্ট লওয়া উচিত। প্রথমে রাস্তা হইতে ১৪টি ধাপ উঠিতে হইবে, তাহা স্তম্ভের বহির্গাত্রের চারিদিক বেষ্টন না করিলে উঠিবার উপায় নাই, তৎপরে দক্ষিণ দিকের রোয়াকে আসিয়া আর ৬টি ধাপ উঠিলে দ্বারে প্রবেশ করা যায়। দ্বারটী অত্যন্ত নীচু, মাথা হেঁট করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরে ঘোর অন্ধকার, তথায় চারিটি ধাপ উঠিলে প্রথম তলার চাতাল। চাতাল গুলিতে বেশ আলো আছে। কারণ আমরা গতবারেই বলিয়াছি, উহাদিগের চারিদিকে চারিটি করিয়া জানালা ও তাহার বাহিরে বারাণ্ডা আছে। এইরূপে প্রত্যেক চাতালের তিন কোণ না বেড়াইলে তদুপরি উঠিবার সিঁড়ি পাওয়া যায় না। ২য় তলায় উঠিতে ১১টি ধাপ, এই ভাবে ক্রমে ১৭টি, ১৪, ১৬, ১৫, ১৬,

এবং ১৪টি ধাপ উঠিলে অষ্টম তলায় উঠা যায়। এখান হইতে সর্ব্বোপরি উঠিবার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং ভারা বাঁধিয়া কোন রকমে না উঠিলে উপরের সুন্দর কারুকার্য্য দেখা যায় না। কিছু কাল পূর্ব্বে নবম তলার ছাদটি বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহারই চাপে এই সিঁড়িগুলি পড়িয়া যায়। রাণা স্বরূপ সিংহ ছাদটির সংস্কার করিয়াছেন, কিন্তু সিঁড়ি গুলি স্তম্ভগাত্রে সংলগ্ন আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। উঠিবার অন্য কোন উপায় কেন করিয়া দেন নাই বুঝা যায় না। পঞ্চম তলার বহির্ভাগে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। এই রূপ কষ্টে ১২৭টি ধাপ উঠিতে হয় পূর্ব্বে ১৩৯টি ছিল। উঠিবার সময় তৃতীয় ও অষ্টম তলার পথে বড় বড় আরবী অক্ষরে "আল্লা" নাম খোদিত আছে। কুম্ভের ন্যায় এক জন বৈষ্ণবের বিজয়স্তম্ভে এ প্রকারে বিপরীত ভাবের হেতু যে কি তাহার অর্থ কেহ বলিতে পারে না। পরন্তু বিশেষ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে কোন মুসলমানে এ প্রকারে খোদকারী করে নাই। আমাদের মনে হয় যে মুসলমানের ইষ্টদেবতা আল্লা পরাজিত হইয়া নিম্ন তলে গিয়াছেন, রাণার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ জয় লাভ করিয়া সর্ব্বোপরি আরূঢ় হইয়াছেন, এইটি দেখাইবার জন্য নিম্নতলে আল্লা এবং নবম তলে শ্রীকৃষ্ণের আমোদ প্রকাশক রাসলীলার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। যাউক, নবম তলার চারিদিকে সাড়ে ১৭ ফুট কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি খোদিত আছে। তদুপরি যে কারুকার্য্যবিশিষ্ট খিলান তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অতি সুন্দর ছবি খোদিত রহিয়াছে। মধ্যে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, তাঁহার চারিদিকে সখীগণ বাদ্য যন্ত্র সহ নৃত্য করিতেছে।

কাব্যকাহিনী।

ভায়োলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেডি ওলিভিয়া সিবাষ্টাইনকে নিজগৃহে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। এবং সেসেরিও নামধারী ভায়োলা জ্ঞানে তাঁহার প্রতি আলাপ ও ব্যবহারে অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সিবাষ্টাইন ও ওলিভিয়ার অতুল রূপলাবণ্য ও ব্যবহারের মাধুর্য্যে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইলেন। ওলিভিয়া মনে করিলেন, সেসেরিওর কঠোর অনুরাগশূন্য হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সে অবশেষে তাঁহার ভালবাসার প্রতিদান করিতে সক্ষম হইয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত সুখী হইলেন। সেই দিবসই সিবাষ্টাইনের সম্পূর্ণ সম্মতিতে পুরোহিত দ্বারা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। সিবাষ্টাইন তৎসময়ের জন্য বিবাহ-

বিষয় গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। ওলিভিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। বিবাহের পরই সিবাষ্টাইন বন্ধু এণ্টোনিওর অন্বেষণ জন্য গমন করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ডিউক ওরসাইনো ছদ্মবেশধারী ভায়োলা ও অন্যান্য অনুচরবর্গ সঙ্গে লেডি ওলিভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ মানসে তাঁহার অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারস্থিত ভৃত্যকে লেডি ওলিভিয়াকে সংবাদ দিতে বলিয়া তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সিবাষ্টাইনের পূর্ব্বলিখিত বন্ধু এণ্টোনিও পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। ভায়োলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "প্রভু এই ব্যক্তিই আমাকে তখন সাহায্য করিয়া রক্ষা করিয়াছিল।" (এণ্টোনিও সিবাষ্টাইন ভ্রমে ভায়োলাকে সার্ এনড্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন।) ডিউক বলিলেন—"এই ব্যক্তিকে আমি বেশ জানি এ একজন সাহসী দস্যু নাবিক আমাদের জাহাজ আক্রমণ করিয়াছিল"। কর্ম্মচারী বলিল "হাঁ প্রভু এই ব্যক্তিই আপনার তরী আক্রমণ করিয়াছিল, এবং ইহারই সহিত যুদ্ধে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আহত হইয়াছিলেন। এ ব্যক্তি রাজ পথ মধ্যে বিবাদ করিতেছিল, আমরা তৎকালে ইহাকে ধৃত করিয়াছি।"

ভায়োলা—বিপদ কালে এ ব্যক্তি দয়া করিয়া আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু পরে অসংলগ্ন কথা কতকগুলি কি বলিতে লাগিল তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

ডিউক—হে দস্যু তস্কর নাবিক কি সাহসে তুমি যাহাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলে তাহাদের অধিকার মধ্যে আসিয়াছ?

এণ্টোনিও—হে ডিউকওর্সাইনো আমি দস্যুও নহি তস্করও নহি। যদিও আমি এক সময় আপনার শত্রুতা করিয়াছিলাম। আপানার পার্শ্বস্থ ঐ অকৃতজ্ঞ বালককে আমি সমুদ্র গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়া ছিলাম, এবং তিন মাসকাল অতি স্নেহ যত্নে ইহাকে নিকটে রাখিয়াছিলাম। ইহারই প্রণয়ের অনুরোধে আমি এই দেশে আসিয়া ইহাকে শত্রু হস্ত হইতে বাঁচাইতে গিয়া রাজ পথ মধ্যে ধৃত হইয়াছি। কিন্তু ধিক উহাকে, এ যুবক সকলের সম্মুখে আমাকে অপরিচিত বলিয়া অস্বীকার করিল, এবং আমারই গচ্ছিত অর্থ আমাকে দিতে অসম্মত হইল।

ভা—ইহা অসম্ভব।

ডি—এ যুবা নগরে কবে আসিয়াছিল?

এ—অদ্যই। গত তিন মাস দিবা রাত্রি আমারই নিকট ছিল।

এই সময়ে লেডি ওলিভিয়া অনুচরবর্গ সঙ্গে তথায় আগমন করিলেন। ডিউক ওর্সাইনো তাঁহাকে দেখিয়া

আর সকল কথা বিস্মৃত হইলেন, এবং মহা হৃষ্ট চিত্তে বলিলেন "এই যে লেডি ওলিভিয়া আসিয়াছেন। স্বর্গ যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল।"

দেখ এণ্টোনিও তুমি উন্মাদ, নতুবা এমন অসম্ভব কথা কেন বলিতেছ। এই যুবক আজ তিন মাস আমার পরিচর্য্যা করিতেছে, তোমার নিকটে সে তবে কেমন করিয়া থাকিবে? কর্ম্মচারিগণ ইহাকে এখন লইয়া যাও, পরে ইহার মীমাংসা হইবে।

ওলিভিয়া—ডিউক ওরসাইনো, আমার প্রতি কি আদেশ? আমি যথাসাধ্য আপনার উপকার করিতে প্রস্তুত আছি। সেসেরিও, তুমি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহাত রক্ষা করিতেছ না।

ভা—আপনার কথার অর্থ কি আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ডি—লেডি ওলিভিয়া ও আপনি কি বলিতে চান? সেসেরিও, তুমি কি বলিতেছ?

ভা—আমার প্রভু আপনার সহিত কথা বলিতে চান, আমার কর্ত্তব্য যে আমি এখন নিস্তব্ধ থাকি।

ও—যদি সেই পুরাতন কথা আবার বলিতে চান তবে নিরস্ত হউন, সুমিষ্ট সঙ্গীতের পর চীৎকার শুনিলে যেমন বিরক্ত বোধ হয় এসব বিষয়ের কথা আমার কর্ণে তদ্রূপ বোধ হইবে।

ডি—এখনো এত নিষ্ঠুর?

ও—আমি এখনো এতদূর—

ডি—আমার গভীর ভালবাসার কি এই প্রতিদান। এখনো তোমার চিত্ত এত কঠোর আমি কি করিব?

ও—যাহা আপনার ইচ্ছা এবং উচিত তাহাই করুন।

ডি—আমার ইচ্ছা হইলে আমি কি না করিতে পারি? আমি মনে করিলে এখনি আমার প্রণয়ের পাত্রীকে বিনাশ করিতে পারি। ওলিভিয়া তবে শোন, তুমি যেমন আমার ভালবাসার প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার শাস্তি স্বরূপ আমি এই যুবাকে চিরদিনের জন্য তোমার চক্ষুর অন্তরাল করিব। কারণ আমি বুঝিয়াছি এই যুবাই তোমার প্রণয়পাত্র। ইহাকে আমিও স্নেহ করি। কিন্তু আমি তোমার মনে ক্লেশ দিবার জন্য ইহারও অনিষ্ট করিব—এই বলিয়া ক্রুদ্ধ ডিউক প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

ভা—আপনার মনে যদি শান্তি হয় আমি ইচ্ছার সহিত শতবার মৃত্যুমুখে যাইতে প্রস্তুত।

ও—সেসেরিও, তুমি কোথায় যাইতেছ?

ভা—আমি জীবন অপেক্ষা সকল অপেক্ষা যদি কখনও পত্নী হয় তাহা অপেক্ষা যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার সহিত যাইতেছি। যদি আমি মিথ্যা বলি তবে যেন তিনি আমাকে শাস্তি দেন।

ও—হায় তবে আমি কি প্রতারিত হইলাম, আমাকে ধিক্।

ভা—কে তোমাকে প্রতারণ করিল?

ও—তুমি কি এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছ?—তোমার কি কিছু স্মরণ নাই? ভৃত্য পুরোহিতকে আহ্বান কর।

ডিউক—সেসেরিও, আমার সহিত চল।

ও—স্বামিন্, তুমি কোথায় যাইতেছ, অপেক্ষা কর।

ডিউক, এই যুবাই তোমার স্বামী।

ও—হাঁ আমার স্বামী—ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ডি—বল তুমি কি ইহার স্বামী?

ভা—না প্রভু আমি ইহাঁর স্বামী নহি।

ও—হায় ভয়ে তুমি কি উচিত অনুচিত জ্ঞান ত্যাগ করিলে? ভয় করিও না। প্রিয় সেসেরিও তুমি যাহা তাহা স্বীকার কর, নিজের যথার্থ পরিচয় দাও, এবং আপনার উচ্চ পদ গ্রহণ কর।

পুরোহিত আগমন করিলে ওলিভিয়া বলিলেন "পিতঃ, আমি অনুরোধ করিতেছি আপনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন, এখন তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

পুরোহিত—দুই ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে চির প্রণয়ের দৃঢ়বন্ধনে পবিত্র বিবাহসূত্রে আমি ইহাঁদিগকে বদ্ধ করিয়াছি।

ডিউক—ভাণ্ডলাকে সম্বোধন করিয়া মহা রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তবে রে প্রবঞ্চক ধূর্ত্ত বালক, এত অল্প বয়সে তুই যদি এমন ভয়ানক শঠ হইয়াছিস্, তবে না জানি ভবিষ্যতে কি ভয়ানক প্রকৃতি তোর হইবে। আমার নিকট হইতে বিদায় হ, তোর পত্নীকে তুই গ্রহণ কর, কিন্তু সাবধান হ, ভবিষ্যতে যেন আমার সহিত আর তোর সাক্ষাৎ না হয়।

ভা—প্রভু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—

ওলি—ক্ষান্ত হও শপথ করিও না। অতি ভয়ে এরূপ পাপ করিও না।

এই সময়ে সার্ এনড্রু আহত মস্তকে শশব্যস্তে তথায় প্রবেশ করিল, এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই আপনাদের, এক জন চিকিৎসক ডাকুন, আমার প্রাণ যায়।" ওলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বল?"

সার্ এনড্রু—"দেখুন আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, সার্ টোবির ওলিভিয়ার এক জন সম্পর্কীয় লোক এই দশা করিয়াছে। দোহাই আপনাদের, এক জন ভাল ডাক্তার আনিতে আজ্ঞা দিন।"

ওলি—"কে তোমার এমন দশা করিল।"

সার্ এনড্রু—"কেন, ডিউক মহোদয়ের অনুচর সেসেরিও আর কে, আমরা মনে করিয়াছিলাম তাহার বুঝি সাহস নাই, কিন্তু শয়তানের ন্যায় তাহার বল।"

ডিউক বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কি

বলিলে, আমার দাস সেসেরিও তোমার এমন দশা করিয়াছে" ?

সার্ এনড্রু ভায়োলাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "তাইত এখানেই যে সে উপস্থিত। তুমি অকারণ আমাকে আঘাত করিয়াছ, আমার কিছুই দোষ নাই, সার্ টোবিও আমাকে তোমার সহিত বিবাদ করিতে বলিয়াছিল।"

ভা—আমাকে কেন এরূপ বলিতেছেন? আমি আপনাকে কখনও আঘাত করি নাই, আপানিইত অকারণ আমাকে অসি লইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহার পরিবর্ত্তে আপনাকে আঘাত করি নাই।

এইরূপ কথোপকথনের সময় সার্ টোবিও আহত শরীরে সেই স্থলে উপস্থিত হইল লেডি ওলিভিয়া ভৃত্য দিগের উভয়কে গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে আদেশ করিলেন। এমন সময় সিবাষ্টাইন আবার তথায় আগমন করিলেন, সকলে তাঁহাকে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইয়া রহিলেন। কারণ পুরুষ বেশধারী ভায়োলা এবং সিবাষ্টাইন উভয়ের আকৃতিতে কোন প্রভেদ ছিল না। উভয়ে ঠিক যেন একব্যক্তি। সিবাষ্টাইন কিছুই জানেন না, লেডি ওলিভিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার আত্মীয়কে আঘাত করিয়াছি বলিয়া দুঃখিত আছি, কিন্তু সে আমার প্রতি অকারণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল আমার সহোদর ভ্রাতা হইলেও আমি ক্ষমা করিতে পারিতাম না। তুমি বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইয়াছ, কিন্তু তুমি আমাকে স্বামী সম্বোধন করিয়াছ, এই অনুরোধে আমাকে ক্ষমা কর।

ডিউক—কি আশ্চর্য্য! এক মুখ এক অবয়ব এক আকৃতি। অথচ দুই ভিন্ন মনুষ্য! সিবাষ্টাইন এণ্টোনিওকে রুদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এণ্টোনিও, প্রিয় এণ্টোনিও, আমি তোমার বিচ্ছেদে এই কয় ঘণ্টা কত কষ্টে কাটাইয়াছি বলিতে পারি না।"

এ—"তুমিই কি সিবাষ্টাইন।"

সি—"তোমার কি সে বিষয়ে সন্দেহ আছে?"

এ—"তুমি কিরূপে দুই রূপ ধরিলে? একটা ফল দুই ভাগে কর্ত্তন করিলেও এত তুল্য আকার হয় না! তোমাদের মধ্যে কে যথার্থ সিবাষ্টাইন্ বল।"

ভলি—"কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য!"

সিবা—"ঠিক যেন আমি ওখানে দাঁড়াইয়াছি। আমারত ভ্রাতা ছিল না। আমি দেবতা নই যে, দুই রূপ ধরিব। আমার একটি ভগিনী ছিল, সমুদ্র তাহাকে গ্রাস করিয়া ছিল—আমি মিনতি করিতেছি বল, তুমি আমার কে? তুমি কোন দেশস্থ, তোমার নাম কি? তোমার পিতার নাম কি?"

ভা—মেসেলাইন আমার জন্মভূমি, আমার পিতার নাম সিবাষ্টাইন ছিল।

সিবাষ্টাইন নামে তোমার তুল্য আমার একটি ভ্রাতা ছিল, সেও তোমারই ন্যায় সমুদ্রজলে মগ্ন হয়। যদি মৃত আত্ম দেহ ধারণ করিয়া আসিতে পারে তুমিই আমার সেই ভ্রাতা।

সি—তুমি যদি স্ত্রীলোক হইতে তবে আজ আমি তোমাকে আমার সেই হারাণো প্রাণের ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিতাম।

ভা। আমার পিতার ললাটে একটি তিল ছিল, ভায়োলার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স কালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সিবা। সত্যই বলিয়াছ আমার ভগিনী ভায়োলার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সাংবৎসরিকে পিতার পরলোক গমন হয়।

ভা—যদি আমার এই পুরুষ বেশ ভিন্ন আমাকে ভগিনী বলিবার তোমার আর বাধা না থাকে তবে আগে সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতে দাও যে, আমি যথার্থই তোমার ভগিনী।

ভায়োলা। আরও প্রমাণ দেখাইব। এই নগরে এক জন কাপ্তেন আছেন, তিনি আমাকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পুরুষ বেশে এই মহামান্য ডিউকের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই গৃহে আমার প্রকৃত পরিচ্ছদ আছে। পুরুষবেশী দূত হইয়া আমি লেডি ওলিভিয়ার নিকট এই ডিউকের বার্ত্তাবহ হইয়া গমনাগমন করিয়াছিলাম।

সিবাষ্টাইন ওলিভিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এইরূপে তুমি প্রতারিত হইয়াছিলে এবং পুরুষ ভ্রমে নারীর প্রতি প্রণয় স্থাপন করিয়াছিলে। তুমিত প্রতারিত হও নাই, কিন্তু প্রকৃত স্বামী লাভ করিয়াছ।

ডিউক—যদি এ কথা সত্য হয় তবে তোমাদের এই সুখের ভ্রমে আমিও অংশ লইব। (ভাওলার প্রতি) বালক, তুমি অনেকবার আমাকে বলিয়াছিলে, আমার তুল্য কোন স্ত্রীলোককে কখনও ভাল বাসিবে না।

ভা—সে কথা আমি এখনও বার বার বলিতে প্রস্তুত সূর্য্যের গতি যেমন কখন পরিবর্ত্তিত হয় না, সেরূপ আমার মনও কখন পরিবর্ত্তিত হইবে না।

ডিউক—আমাকে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মতি দাও। তুমি আর এ বেশে থাকিও না, তোমার প্রকৃত পরিচ্ছদ তুমি পরিধান কর।

ভা—যে কাপ্তেন আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারই নিকট আমার পরিচ্ছদ আছে।

* * *

ও—মহারাজ আপনি আজ হইতে আমাকে অপরের পত্নী বলিয়া জানিবেন, এবং আমাকে ভগিনী জ্ঞান করিবেন, যদি আপনার ইচ্ছা হয় আমার এই অনুরোধ আজই আপনার বিবাহ কার্য্য আমার গৃহে সম্পন্ন হয়।

ডি—আমি আপনার প্রস্তাবে আন-

ন্দের সহিত সম্মতি দিলাম—(ভায়োলার প্রতি) আজ হইতে তোমার প্রভু তোমাকে কার্য্য হইতে অবসর দিলেন। তুমি এত দিন তোমার উচ্চবংশ এবং প্রকৃতির অনুপযোগী কার্য্য করিয়া সেবা করিয়াছ, এবং প্রভু সম্বোধনে আমাকে ডাকিয়াছ, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ আমার হস্ত তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি এখন হইতে তোমার প্রভুর হৃদয় মনের কর্ত্রী হইলে।

ওলি—তুমি আজ হইতে আমার ভগিনী হইলে।

* * *

ডি—আজ অমাদের উভয় আত্মা পবিত্রবন্ধনে সম্বন্ধ হইবে। প্রিয় ভগিনী তোমার গৃহে আমরা এখন অবস্থান করিলাম। সেসেরিও এস—যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার প্রকৃত বেশ ধারণ করিয়া ওরসাইনোর হৃদয় রাজ্যের অধিশ্বরী না হও সে পর্য্যন্ত আমি তোমাকে সেসেরিও নামে আহ্বান করিব।

এই বলিয়া সকলে আনন্দ মনে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, উপযুক্ত ও মনোমত পাত্রে ভায়োলা এবং ওলিভিয়া পরিণীত হইলেন, ভায়োলার কাহিনীও এখানে শেষ হইল।

ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা।

অনন্ত পুরুষের অনন্ত মহিমা
মানব কি পায় তাঁর দয়ার সীমা,
প্রচারিত সর্ব্বত্র অনন্ত করুণা,
মানবের জ্ঞানে তা হয় কি ধারণা,
চির-তুষারপূর্ণ হিমানীপ্রদেশে
তপন তপ্ত রশ্মি যথা না প্রকাশে,
কার জ্ঞান সেই হিম দেশের জীবে
দেহাবরণে দেয় লম্ব লোম সবে,
কার জ্ঞান পুনঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে
আবরে জীবের দেহ সুসূক্ষ্ম কেশে,
কার জ্ঞান বারি-শূন্য সুমরুভূমে
তপ্ত বালু-রেণু যথা কৃষাণু ভ্রমে
মরু দেশ নিবাসী মানবের হিতে
তরীরূপে সৃজে উষ্ট্র মরু ভূমিতে,
গন্ধ-বিহীন বারি বারি-শূন্য দেশে
গন্ধ-হীন নহে তথা উষ্ট্রের নাসে,
পিপাসী আরোহীর আপন জীবন
বারি-গন্ধে বারিলাভে করে সে রক্ষণ,
বারিশূন্য ভূমিতে জলপূর্ণ-ফল
কার দয়া প্রকাশে বলনা সকল,
দেখনা ক্রমান্বয়ে ঋতু মাস বার
প্রকাশে কতই না মহিমা তাঁহার।
কার জ্ঞান বিহগের ক্ষুদ্র হৃদয়ে
ভাবী শিশুর স্নেহ হৃদয়ে উদয়ে,
কার জ্ঞানে বিহঙ্গম অণ্ড প্রসবে
যথা কালে কুলায় নির্ম্মাণে নীরবে,
হিত ইচ্ছা তাঁর জীবের মঙ্গলে
সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ ঘোষিছে সকলে।

[সু]

সমুদ্র।

কল্লোল-পূরিত বিস্তৃত সাগর
তুলিয়া উত্তাল লহরী-নিকর
পৃথিবী বেষ্টিয়া নাচিয়া নাচিয়া
দেশে দেশে যাও অবাধে চলিয়া
মঙ্গল বিধানে করিছ ধাবন,
উদ্দেশ্য মহৎ করিতে সাধন,
তোমার সলিলে উর্ব্বরা পৃথিবী,
তোমার সলিলে পুষ্পিতা অটবী,
তোমার সলিলে প্রবাল বর্দ্ধিত,
তোমার সলিলে রতন নিহিত,
তোমার সলিলে নাবিক নিয়ত
করিছে বণিক্ বাণিজ্য বিস্তৃত,
তোমার সলিলে দ্বিপপুঞ্জ কত
ভাসে পোতবৎ বক্ষে শত শত,
তোমার সলিলে তুষ্ট যাদোকুল
বিহরে আনন্দে নহে ভয়াকুল,
তোমার সলিল দেশেতে দেশেতে
করিছে মিলন অপূর্ব্ব ভাবেতে,—
তোমার সলিলে জর্ম্মাণ জাপান
ইটালি, মার্কিণ, চীন হিন্দুস্থান,
মিলায়ে সবারে মিলন মন্ত্রেতে
এক সূত্রে যেন বাঁধিছে প্রেমেতে।
তোমারি সলিলে গভীর গর্ভেতে
অবস্থিত উচ্চ মগ্ন-গিরি যাতে,
বাড়ব-অনল হয় উদ্দীপন,
অনলে সলিলে প্রেমের মিলন,
বিজাতি বিভিন্ন প্রকৃতির মাঝে
মানস মোহন মিলন বিরাজে,
পর-শিক্ষা পর হিতের বিধানে
জন্ম তব, সিন্ধো, বিদিত ভুবনে।

[সু—]

পর্ব্বত।

প্রকৃতি পুস্তকের একটি প্রধান চিত্র পর্ব্বত। বিশ্ব রাজ্যের একটি সুন্দর অলঙ্কার পর্ব্বতমালা। পর্ব্বতের শ্রী সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্যের ন্যায় আর কি আছে? দেখিলে মন মুগ্ধ হয়, অথচ মহৎ হয়, গম্ভীর হয় শান্ত হয়, স্তম্ভিত হয় এমন আর কি আছে। পর্ব্বতের উচ্চতা গাম্ভীর্য্য দর্শনে মন বিস্মিত চকিত এবং আপনা আপনি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সেই বিশ্বস্রষ্টার মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, এবং তাঁহার চরণে অবনত হয়। আমাদের দেশে আর্য্যজাতির ক্রীড়াভূমি এই পর্ব্বত। প্রিয় হিন্দুস্থানে পর্ব্বতের যেমন শোভা এমন বুঝি আর কোথাও নাই। পুরাকালীন যোগী ঋষিদিগের আবাসস্থান সেই শোভা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নীলগিরি বিন্ধ্যাচল হিমালয় এই ভারতে বিরাজিত। বহু দিন হইল হিমালয় শিখরে যে পর্ব্বতমালার শোভা দেখিয়াছি, তাহা আজও মনে আছে। মধ্যস্থলে প্রদোষের মৃদু আলোকে এক উচ্চ পর্ব্বত শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম যেন চারি দিকে তরঙ্গায়িত সাগর তুল্য পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজমান। খণ্ড খণ্ড পর্ব্বত উচ্চ উচ্চ বহু তরঙ্গের তুল্য চূড়া তুলিয়া একটির পর আর একটি চারিদিকে বহু দূর ব্যাপিয়া ঘন ঘন সাজান রহিয়াছে, ঠিক যেন প্রশস্ত বক্ষ সাগরে তরঙ্গ উঠি-

তেছে। জলের তরঙ্গের সহিত তাহার এই মাত্র প্রভেদ যে উহা তরল অস্থির চঞ্চল, আর এ তরঙ্গ স্থির নিশ্চল দৃঢ় এক ভাবে স্থিত। তাহাদের বর্ণই বা কি অপরূপ ঘন ঘোরাল মেঘ তুল্য সুন্দর। মনে হয় বুঝি পূর্ব্বে একদিন ঐ পর্ব্বতমালা তরঙ্গায়িত সাগর ছিল, বায়ু সঙ্গে প্রবলবেগে তাহার ঊর্ম্মিমালা ক্রীড়া করিতেছিল, হটাৎ কোন মহাশক্তির প্রভাবে, কোন অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছায় তরলসলিলসাগর কঠিন অচল স্থির হইয়া প্রস্তরকায় প্রাপ্ত হইল। যে সকল তরঙ্গ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল আর নামিল না, একইভাবে নিশ্চল ও দৃঢ় হইয়া পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া রহিল। আর একবার দূর হইতে পর্ব্বতশিরে অনন্ত হিমানীর প্রকাশ দেখিয়াছিলাম সেও বড় সুন্দর। যখন নব সূর্য্য কেবলমাত্র উদয় হইতেছিলেন, তাঁহার তরুণ রশ্মি গিরিশৃঙ্গে সেই শুভ্র তুষারের উপর পড়িয়াছিল, পড়িয়া ঠিক যেন জ্যোতির্ম্ময় হীরকচূড় বহু সংখ্যক দেব মন্দিরের ন্যায় দেখাইয়াছিল, পর্ব্বত চূড়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মনে হইল ওখানেই বুঝি সেই কৈলাসগিরি। প্রভাময় তুষারমণ্ডিত গিরিশিখরের শোভা দেখিয়াই বুঝি হিন্দু তথায় হরগৌরীর বাসমন্দির বলিয়া কল্পনা করেন।

পর্ব্বতের বিষয় আমরা এখন আলোচনা করিয়া দেখি। দেশের জল বায়ু অনেকটা এই পর্ব্বতের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। পর্ব্বতের এবং তাহার নিকটস্থ দেশ সকল সচরাচর স্বাস্থ্যকর। অন্যান্য দেশ তেমন নয়। পর্ব্বতের সৃষ্টি হটাৎ এক দিনে হয় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বহু সংখ্যক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইলে ও অন্যান্য কারণে সমতল ভূমি অল্পে অল্পে স্ফীত হইলে পর্ব্বতের বিস্তীর্ণ অঙ্গ গঠিত হয়। পর্ব্বত অপরিসর সূক্ষ্ম কায় চূড়ার ন্যায় নহে যে একবারে হটাৎ ইহার গঠন হইবে। ইহা যেমন উচ্চ তেমনই আবার সমতল ভূমির ন্যায় অতি বিস্তৃত। স্থানে স্থানে চূড়া আছে বটে, কিন্তু ইহার উপরে এত প্রশস্ত স্থান আছে যে তাহার উপর অসংখ্য মানুষ জীব জন্তু বাস করিতে পারে, নানা ফল শস্য বৃক্ষ লতারও উৎপত্তি হয়, ইহার কোথাও বা উপত্যকা, কোথাও নির্ঝর, কোথাও হ্রদ, কোথাও সূক্ষ্ম চূড়া ও শৃঙ্গ কোথাও সমতল ভূমি তুল্য প্রশস্ত পরিসর স্থান, কিছুরই অভাব নাই। বাস্তবিক পর্ব্বত যেন একটি বিভিন্ন রাজ্য। কত প্রকার সুন্দর সুন্দর পত্র ইহার অঙ্গে শোভিত। কত প্রকার ফল ফুলের উৎপত্তি ইহাতে। বিশ সহস্র ফীট উচ্চ এবং সহস্র সহস্র ফীট প্রশস্ত পর্ব্বতের সৃষ্টি এক দিনে হয় নাই, কোন কোন গুলি বার বার অগ্ন্যুৎপাতের ফল, কোন কোন গুলি নৈসর্গিক কোন বিশেষ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে

ভূমি ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া স্তরের পর স্তর গঠিত হইয়া পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। ঐ সকল স্তর পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানবিদ্গণ বুঝিতে পারেন, কোন্ কালে কোন্ স্তরের গঠন হইয়াছে, এবং তাহা কি কি পদার্থে ও ভিন্ন রূপে কেন গঠিত তাহাও অনুমান করিতে পারেন। দুই হাজার ফীট উচ্চ হইলে তাহাকে পর্ব্বত বলা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা নিম্ন হইলে অতি ক্ষুদ্র পাহাড় বলা যায়। পর্ব্বতের এক দিক সচরাচর ক্রমশঃ অল্প অল্প গড়ান ভাবে নীচের দিকে গিয়াছে, অপর দিক সরল ভাবে একেবারে নিম্নে গিয়াছে। কতক গুলি পর্ব্বত আছে তাহাদিগকে আগ্নেয় গিরি বলে। পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে যে অপরিসর উপত্যকা সকল আছে তাহা দ্বারা গমনাগমন বাণিজ্য ব্যবসায় ইত্যাদির সুবিধা হয়। স্থানে স্থানে এই সকল সঙ্কীর্ণ উপত্যকার সাহায্যে পৃথিবীর কত প্রধান প্রধান যুদ্ধ সংগ্রাম এবং সাহসিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ইংরাজেরা স্থানে স্থানে পর্ব্বত কাটিয়া রেল গাড়ী যাইবার (টনেল) সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পর্ব্বতের অঙ্গে শকট ও মনুষ্য চলিবার রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন, গিরিঅঙ্গে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তুলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উচ্চ পর্ব্বতে এমন সকল স্থান আছে যাহা মানুষের অগম্য এবং ইংরাজবুদ্ধিও তথায় দন্তস্ফুট করিতে পারে না। পর্ব্বতে কত প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার আছে শুনা যায়। নাইনীতাল পাহাড়ের এক স্থানে খনন করিতে করিতে একটি দ্বারের ন্যায় বাহির হইল, দ্বার খুলিয়া কর্ম্মকারগণ দেখে যে ভিতরে অন্ধকার এবং বিস্তৃত জলরাশি। কথিত আছে, মধ্যে মধ্যে ভিতর হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রুত হয়। সিমলা অঞ্চলে এক স্থানে বৎসরের মধ্যে কোন বিশেষ সময়ে উপর হইতে শঙ্খ ঘণ্টা ও পূজার বাদ্য শ্রুত হয়, নিম্নে মেলা হয়, পাহাড়ীগণ সমবেত হইয়া নৃত্য গীত আনন্দ উৎসব করে।

হিন্দুস্থানের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী, গঙ্গার উৎপত্তি হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ এবং ৩০০ মাইল প্রশস্ত, কোন কোন স্থানে ইহার শৃঙ্গ প্রায় সাতাইশ আটাইশ হাজার ফিট উচ্চ।

গৌরীশঙ্কর নামে ইহার এক শৃঙ্গ ২৯০০২ ফিট উচ্চ, এবং ধবলাগিরি নামে শৃঙ্গ ২৬৪২৬ ফিট, কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ প্রায় ২৮১৫৬ ফিট উচ্চ। বিন্ধ্যাগিরি ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে দাক্ষিণাত্যের উত্তর সীমায় এবং আর্য্যবর্ত্তের দক্ষিণে। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় ঘাটগিধি উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তদ্ভিন্ন বোম্বাই সহরে মালাবার পর্ব্বত এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে নীল গিরি বিরাজিত। ১৩। ১৪ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে হিমালয় পর্ব্বতে অনন্ত হিমানী শোভিত। পশ্চিম ঘাট ৩০০০ হইতে

৫৭০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ, পূর্ব্ব ঘাট ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফিট অবধি উচ্চ। নীলগিরি ৬০০০। ৭০০০ ফিট উচ্চ। কোন শৃঙ্গ ৮০০০ ফিটের অধিক উচ্চ। হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে ব্রহ্মপুত্র নদ ব্যবধান, তাহার অপর দিকে আসাম অঞ্চলের গিরিশ্রেণী। ভারতবর্ষে এত গুলি প্রধান প্রধান পর্ব্বত। তদ্ভিন্ন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় নানা স্থানে আছে! হিমালয়-শৃঙ্গ ধবলাগিরি বা এভারেষ্ট পৃথিবীর সকল পর্ব্বত শৃঙ্গ অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া কথিত আছে। বাস্তবিক হিমালয়কে যে হিন্দুগণ গিরিরাজ বলেন তাহা কিছু অত্যুক্তি নহে।

মহাবীর নেপোলিয়ানের সহৃদয়তা।

বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান যেমন মহা যোদ্ধা, সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং অসাধারণ উৎসাহী আত্মসুখত্যাগী কঠোর লোক ছিলেন, তেমনি আর এক দিকে তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। শোণিতস্রোতে প্লাবিত সমরক্ষেত্রে সহস্র সহস্র সৈন্যের মৃত এবং অর্দ্ধমৃত দেহ রণতুরঙ্গের লৌহময় পদে দলিত করিয়া যখন শত্রু পক্ষের পশ্চাতে তিনি ধাবিত হইতেন তখনও তাঁহার হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইত। অসাধারণ মানসিক উদ্যমে অসাধারণ কর্ম্ম তিনি করিতেন, কিন্তু তাহার ভিতরে চিত্ত শান্ত স্থির, উদ্বেগবিহীন থাকিত। আপনার মনের উপর তাঁহার অতি আশ্চর্য্য কর্তৃত্ব ছিল।

এক স্থানে বলিয়াছেন, "আলমারির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেরাজে যেমন ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী সজ্জিত থাকে, আমার মস্তকের মধ্যে তেমনি বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য-প্রণালী স্থিতি করে। কোন এক চিন্তা-প্রবাহকে যখন আমি বন্ধ রাখিতে চাই তখন তাহার দেরাজ বন্ধ করিয়া দিই, এবং অপর কোন দেরাজ খুলি। তাহারা একটার সঙ্গে একটা মিশিয়া গোলমাল হইয়া যায় না, এবং তজ্জন্য অন্তরে কোন প্রকার শ্রান্তি বা অসুবিধা হয় না। মনের কোন একটা চিন্তা অজ্ঞাতসারে আমাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। যদি আমার বিশ্রামের আবশ্যকতা হয়, আমি স্বইচ্ছায় মনের সমস্ত দেরাজ বন্ধ করিয়া ফেলি, এবং তৎক্ষণাৎ নিদ্রা যাই।" কোন বিশেষ সংগ্রামে জয় লাভের জন্য ক্রমাগত কিছু দিন ধরিয়া তাঁহাকে অহোরাত্রি জাগিতে হইত, তদনন্তর যুদ্ধের যাবতীয় আয়োজন সমাধা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কামানের গোলার ভীষণ গর্জ্জনের মধ্যে সমরক্ষেত্রে তিনি অল্পক্ষণের নিমিত্ত ঘুমাইয়া লইতেন।

একদা ইটালী দেশে অষ্ট্রীয়া সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া নেপোলিয়ান চন্দ্রালোকশোভিত গভীর নিশাকালে রণভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। শোণিতাক্ত কলেবর মৃতপ্রায় সৈন্যগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহার ভিতর হইতে একটা কুকুর হঠাৎ বাহির হইয়া প্রমত্তভাবে নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইল, এবং ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়া পুনরায় স্বীয় প্রভুর ক্ষতাঙ্গ লেহনপূর্ব্বক কাতরধ্বনি করিতে লাগিল। বীরবর এই দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় বিগলিত হন। এই ঘটনার অনেক বৎসর পর তিনি বলিয়াছিলেন, "মনুষ্যজীবন কি এক আশ্চর্য্য রহস্য! যে সকল মহাযুদ্ধে দেশীয় সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে তাহাতে আমি সেনাপতির কাজ করিয়াছি, এক ফোটা জলও কখনো চক্ষু দিয়া পড়ে নাই, কিন্তু এই কুকুরের শোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার অন্তরে দুর্জ্জয়বেগে গভীর সহানুভূতি উত্থিত হইতেছে।

জোসেফাইনের সহিত যখন তাঁহার বিবাহ হয় তখন স্ত্রীর একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি ছবি তিনি প্রাপ্ত হন। সে ছবি খানি ফিতায় বাঁধিয়া নেপোলিয়ান গলায় ঝুলাইয়া রাখিতেন। ছবির গণ্ডস্থল নিরন্তর তদীয় হৃৎপিণ্ডের উপর সংলগ্ন হইয়া থাকিত। যুদ্ধযাত্রা কালে পথে চলিতে চলিতে এই ছবি তিনি বারংবার প্রেমচক্ষে দর্শন করিতেন।

স্ত্রীকে তিনি একবার এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন;—"হে আমার সুমিষ্ট প্রেম, কি কৌশলে তুমি আমার সমস্ত মনোবৃত্তি এবং পার্থিব জীবনকে ধৃত করিয়া তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়াছ? ইহা এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব, আমার জীবন শেষ না হইলে আর ইহা শেষ হইবে না। হে আমার আরাধ্যা বনিতা, ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে জানি না, কিন্তু অদৃষ্ট বশতঃ যদি আমি তোমাবিহীন হইয়া বহু দিন জীবিত থাকি, তাহা হইলে এ জীবন ধারণ বড় কঠিন হইবে। এমন সময় ছিল যখন আমি আমার সাহসের বিষয়ে অহঙ্কার করিতাম, এবং নির্ভয়ে বহুতর বিপদ অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিতাম, কিন্তু এখন যদি এরূপ মনেও হয় যে জোসেফাইন পীড়িত হইতে পারেন, কিম্বা তিনি আমাকে কম ভালবাসিতে পারেন, তাহা হইলে সেই নিষ্ঠুর চিন্তায় আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, তখন আর নিরাশ হইবারও শক্তি আমার থাকে না। পূর্ব্বে আমি আপনাকে আপনি বলিতাম, যে ব্যক্তির মৃত্যুতেও কোন খেদ নাই তাহাকে কেহই আঘাত করিতে পারে না। কিন্তু এখন জোসেফাইনের ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া মরা আমার পক্ষে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক কথা। হে আমার অতুলনীয়া সহচরি, অদৃষ্ট তোমাকে আমার জীবনপথের সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছে, যে দিন আমি তোমার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইব, সে দিন আমার বড় সর্ব্বনাশের দিন হইবে।"

এতাধিক প্রগাঢ় ভালবাসা সত্ত্বেও তিনি অধিকাংশ সময় স্ত্রীসঙ্গ ছাড়িয়া একাকী রাজকার্য্যে এবং যুদ্ধে ব্রতী থাকিতেন।

কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন, "নেপোলিয়ানের বহু প্রকার মানসিক বৃত্তি ছিল, এবং প্রত্যেক বৃত্তি দ্বারা তিনি বিখ্যাত হইবার উপযুক্ত।" বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই মহত্ত্বের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত।

দুয়ে এক কেন হয় না?

দুইয়ে এক কি রূপে হয় আর তাহা হইবার কি প্রতিবন্ধক, পরিচারিকার পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। একটা দিক তাহাতে দেখা গেল। এখন আমরা আর একটা দিক পাঠিকাগণের সম্মুখে ধরিতেছি। দুইয়ে এক কেন হয় না আর তাহার জন্য স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে কে অধিক দোষী পাঠিকারাই বিচার করুন। দুইয়ে এক কেন হয় না এ বিষয়ে স্ত্রীর স্বামী অপেক্ষা অধিক ত্রুটি আছে কি না তদ্বিষয় আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। স্বামী মনে করেন "আমি সকল বিষয়ে পত্নী অপেক্ষা অধিক বুঝি তবে কেন স্ত্রী বিনা ওজরে আমার সকল কথায় সায় দেয় না? এই জন্যইত এত অশান্তি"। স্ত্রী মনে করেন বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা স্ত্রী, তিনি ভাবেন "কেন আমি কি মানুষ নই, আমার কি বিবেচনা বুদ্ধি কিছুই নাই? সকল কথায় কেন সায় দিব? যেটা ভাল বুঝিব তাই করা উচিত।" এখন এই দুই কথার মীমাংসা কিসে হয়? স্বামী ভাবেন তাঁর কথায় চলিলেই যদি সকল কথা নিষ্পত্তি হয় তবে স্ত্রী কি জন্য তাহা করিবেন না? অনেক স্বামী এরূপ আছেন স্ত্রী চব্বিশ ঘণ্টা খাটিতেছেন তাহার প্রতি দৃক্‌পাত নাই, কেন তিনি ঘড়ি ধরিয়া ঠিক ঠিক সময়ে সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পরেন না এটা তাঁর মহৎ দোষ। স্বামীর কোন্ জিনিস কোন দিন খাবার ইচ্ছা হয়, স্ত্রী কেন আপনাআপনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না? এটা তাঁর ভারি ত্রুটি। কোন দিন স্বামীর মিষ্ট দ্রব্যে কোন দিন তিক্ত দ্রব্যে রুচি তাহা যে ব্যক্ত না করিলেও স্ত্রীর স্বতঃই জানিয়া রাখা উচিত। বাস্তবিক এমন অনেক স্বামী আছেন স্ত্রীকে তাঁহারা নিজের দাসী জ্ঞান করেন, কেবল যে বাহিরের বিষয়ে তাহা নহে, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধেও তাঁহাদের মতে স্ত্রী অনেক হীন। স্ত্রীকে তাঁহারা চুল চিরিয়া বিচার করিতে খুব পটু কিন্তু নিজে যাহা ইচ্ছা করুন স্ত্রীর কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। পত্নী সদা মিষ্ট কথায় সহাস্য মুখে তাঁহাদিকে তুষ্ট করুন এই ইচ্ছা, কিন্তু নিজেরা কর্কশ কথা বলুন উগ্র ব্যবহার করুন তাহাতে স্ত্রী বেচারাদের ক্ষুণ্ণ বা অসন্তুষ্ট হইবার কোন অধিকার নাই। শুনিয়াছি বিলাতে কার্য্যালয় হইতে

গৃহে ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীর অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া অনেক স্বামী Clubএ ক্লব ঘরে পলায়ন করেন, এবং পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া সেখানে আমোদ আহ্লাদ আহার বিহার করিয়া কিছু ক্ষণ কাটাইয়া দেন। স্ত্রীদের ঘর কন্না সন্তান ইত্যাদি ফেলিয়া স্বামীর অপ্রসন্নতা হইতে আর কোথাও দুদণ্ড পলাইবার যো নাই। যাহা হউক ঘরে বসিয়াই সহিতে হয়। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বাস্তবিক সংসারে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর অনেক সহিতে হয়। আরও কষ্ট এই অনেক কষ্ট সহিয়াও স্ত্রীর মুখের প্রসন্নতা ব্যবহারের প্রফুল্লতা রাখিতে হয়। নতুবা স্বামী মহাশয় যে বিরক্ত হইবেন। সুখের সংসার তখনই হইতে পারে, দুয়ে এক তখনই হইতে পারে যখন স্ত্রী যেমন সর্ব্বদা স্বামীর সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, স্বামীর রুচি ইচ্ছা ভাবকে আপন রুচি ইচ্ছা ভাব করিয়া লয়েন, সকল বিষয়ে স্বামীর সহিত সহানুভূতি করিতে পারেন, স্বামীও যখন তেমনি স্ত্রীর রুচি ইচ্ছার সহিত আপন রুচি ইচ্ছা মিলাইতে পারিবেন, স্ত্রীর ভাবে আপনার ভাব মিলাইতে পারিবেন, স্ত্রীর সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিতে পারিবেন, স্ত্রীকে হেয়জ্ঞানে তুচ্ছ না করিয়া সমান দৃষ্টিতে দেখিবেন। কেহ কেহ এরূপ আছেন, স্ত্রীলোকদিগকে অন্যায় স্বাধীনতা দেন, স্ত্রী যাহা করেন তাহাতেই সায় দেন, যেন ঠিক তাঁহাদের অর্চ্চনা করেন। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা আমাদের দেশের পুরাতন শাস্ত্রকারদের মতে চলেন, অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাসের অযোগ্য, তরল প্রকৃতি দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখেন, এই উভয়ের কোন মতাবলম্বী আমরা নই। যেমন এক দিকে অন্যায় স্বাধীনতা দান অনুচিত, তেমনি স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের সকল মতও ঠিক নহে। শাস্ত্রের উক্তি সকল পুরুষ হস্তে লিখিত না হইয়া যদি নারীহস্তে লিখিত হইত তবে স্ত্রীচরিত্রবিরুদ্ধে ওরূপ যুক্তি শাস্ত্রে কখন থাকিত না। সময়ে সময়ে স্ত্রীচরিত্রের স্ত্রীহৃদয়ে এমন বল সাহস দৃঢ়তা পবিত্রতা দেখা গিয়াছে সেরূপ কোন পুরুষের আছে কিনা সন্দেহ। পুরুষচরিত্রের পবিত্রতা চেষ্টা সাপেক্ষ, নারী হৃদয়ের পবিত্রতা স্বাভাবিক ঈশ্বরদত্ত। অবশ্য ভালমন্দ উভয়ের ভিতর আছে। ত্রুটি উভয়েরই আছে। যদি উভয়ের ত্রুটি উভয়ে ক্ষমা করিয়া কেবল গুণ মহত্ত্ব দেখেন, এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন ও পরস্পরের সেই সকল গুণ যাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করেন তবে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন ও শান্তি হইবার সম্ভব। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সংসারক্ষেত্রে পরস্পরকে সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাসদাসী জানিয়া দোষ ত্রুটি ক্ষমা এবং গুণ গ্রহণ করিয়া যদি চলিতে পারেন তবেই দুইয়ে এক হইতে পারে।

সংবাদ।

গত ২০এ নবেম্বর কমলকুটিরস্থ দেবালয়ে কুচবিহারের মহারাজের তৃতীয় পুত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হয়। প্রাতঃকালের উপাসনার মধ্যভাগে মহারাজা স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিয়া উপাসনায় যোগ দেন, পরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা কালে কুমার নিদ্রিত ছিল বলিয়া জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের গবর্ণেস্ কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া মহারাজের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হয়। প্রার্থনার পর উপাচার্য্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কুমার "ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ" এই নামে আখ্যাত করেন। বিলাতের মহারাণী ভারতেশ্বরী রাজকুমারের ধর্ম্মমাতা হইতে পূর্ব্বেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁহারই ইচ্ছায় "ভিক্টর নাম প্রদত্ত হইল, এবং তৎসঙ্গে শিশুর স্বনাম "নিত্যেন্দ্রনারায়ণ" হইল। নামকরণ উপলক্ষে দেবালয় পুষ্পপত্র ঝাড় লণ্ঠন কার্পেট ইত্যাদি দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল, নহবত ইংরাজিবাদ্য দেশী বাদ্য বাজিয়াছিল। পর দিন এক বৃহৎ ভোজ ও বাজি পোড়ান হয় এবং ভীষ্মের শরশয্যা নামে যাত্রা দেওয়া হইয়াছিল। ভারতেশ্বরী ভারতবাসীর একটি সন্তানের এই প্রথম ধর্ম্মমাতা হইলেন। ইহাতে তাঁহার এ দেশের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে।

গত ৫ই ডিসেম্বর ভূতপূর্ব্ব বড় লাটপত্নী মহোদয়া লেডি ডফরিণকে বঙ্গীয় মহিলাগণ অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তদুপলক্ষে বড় লাটের প্রাসাদে এক বৃহৎ সভা হয়, তাহাতে ইউরোপীয় এবং দেশীয় অনেক মহিলা সমবেত হয়েন। ছোটলাটপত্নী লেডি বেলি এই সভাতে প্রেসিডেন্ট এবং কুচবিহারের মহারাণী ভাইস প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন কতক গুলি মহিলা কমিটির মেম্বর হইয়াছিলেন। লেডি বেলি ইংরাজিতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। লাট সাহেবের কন্যাদ্বয় সে দিবস সকল অভ্যাগতগণকে সাদর অভ্যর্থনা দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং লেডি ডফরিণও সকলের সহিত আলাপাদি করিয়া অপ্যায়িত করিয়াছেন।

গত ৬ই ডিসেম্বর লেডি ডফারিণ এবং তাঁহার কুমারীদ্বয় কুচবিহারের মহারাজের আলিপুরস্থ উডল্যাণ্ড ভবনে চার নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কতকগুলি ভদ্র বঙ্গমহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং কুচবিহারের মহারাণী লেডি ডফরিণ কৃত সকল উপকারের জন্য বঙ্গীয় মহিলাদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্পণ করেন। লেডি ডফারিণ বিদায় কালীন তাঁহার এ দেশের প্রতি ভালবাসার জন্য বিশেষ ভালবাসার চিহ্ন দেখাইয়া গিয়াছেন।

স্বর্ণরেণু।

পুরুষ এবং নারী ইহার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? স্ত্রী যখন সম্পূর্ণ রূপে আত্ম ইচ্ছা বলিদান দিয়া স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হয়েন তখন তিনি মহৎ, এবং স্বামী যখন স্ত্রীকে আসক্তিশূন্য প্রেম দিতে পারেন তখনই তিনি শ্রেষ্ঠ।

বীণা যন্ত্রের যেমন একটি তার শিথিল হইলে সুরের সমুদয় মিষ্টতা চলিয়া যায়। চরিত্রের সকল গুণ সত্ত্বেও ধর্ম্মের অভাবে তদ্রূপ হয়।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১১।১২ সংখ্যা।] ফাল্গুন, চৈত্র, সন ১২৯৫। [১১ খণ্ড।

জীবন-পঙ্কজ।

পঙ্কজ বলিতে যাহা পঙ্কে জন্মে সেই বস্তু বুঝায়। তবে জীবনকে কেন পঙ্কজ বলা হইল? জীবন কি পঙ্কে জন্মে? বস্তুতঃ ভাল করিয়া চিন্তা করিলে জীবনের সঙ্গে পঙ্কজের সাদৃশ্য আছে, বুঝা যায়। মনুষ্যকে শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান্ পঙ্কজের সৃষ্টি করিয়াছেন। পঙ্কজ পঙ্কে জন্মে, পঙ্কেই জীবিত থাকে, পঙ্ক হইতেই শ্রীসৌন্দর্য্য সমুদয় লাভ করে। পঙ্ক শুকাইলে পঙ্কজের শ্রী সৌন্দর্য্য কিছুই থাকে না, মরিয়া যায়, কিন্তু পঙ্কজে পঙ্ক লাগে না। [illegible] জকে পঙ্কের ভিতরে শত শত [illegible] ইতে থা[illegible], পঙ্কজ কদাচ পঙ্কলিপ্ত হইবে না। [illegible]টি পঙ্কজের ম[illegible] মনুষ্য সংসারে পঙ্কজের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সংসার পাপপঙ্কময় স্থান, এই পাপ পঙ্কের ভিতরে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মনুষ্যজীবন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শ্রী সৌন্দর্য্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। যখন মনুষ্যজীবন শৈশবে অবস্থিতি করে, তখন ইহার সৌ[illegible] ধরে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জীবন যৌবনপ্রাপ্ত হয়, আর সংসারের পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া আপন শ্রী সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে। তাই ভগবান্ মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য পঙ্কের ভিতরে পঙ্কজের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সকল মানুষ এ শিক্ষায় শিক্ষিত হইল না, সকলে ভগবানের এই অপূর্ব্ব কৌশল বুঝিতে পারিল না, সুতরাং পাপ লিপ্ত হইল। অধিকাংশ মনুষ্যজীবন শূকরের ন্যায়, সহস্র যত্ন করিলেও সে সে যত্নে অনাদর করিয়া কর্দ্দমে গড়াগড়ি দেয়। সেই জন্য অধিকাংশ মনুষ্যজীবনের সঙ্গে পঙ্কজের উপমা চলে না, কিন্তু এমন অনেক জীবন এ সংসারে আছে যাহার অপাপলিপ্ত শ্রী সৌন্দর্য্যে [illegible] পরাজিত হয়।

সংসারে [illegible], অভিমান, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পাপ [illegible], এখানে পরনিন্দা, ও আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি [illegible] আছে, অন্যায় [illegible]বুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি ও [illegible] যাতনা [illegible] দুর্দ্দমে ক্লেশ আছে—এই সকল পাপপঙ্কে জীবনকে প্রলিপ্ত করিতে মানুষ ভাল বাসে, অগুরু চন্দনের সুগন্ধ অপেক্ষা ইহার গন্ধ তাহাদিগের নিকট মিষ্ট বোধ হয়; সুতরাং

ইহার প্রতি ঘৃণা করিয়া মানুষ ইহাতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ ইহা যথার্থ মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে, এ ভাব পশুজীবনের। কার্য্যাকার্য্য হিতাহিত বিচার করিতে পশুজীবনের সামর্থ্য নাই। পশুরা স্থিরচিত্তে ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিতে পারে না, এবং সপ্রতিজ্ঞ ভাবে দৃঢ়তার সহিত অনিষ্ট ত্যাগ ও ইষ্ট গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য পারে। এই জন্য মানুষ সংসারের সহজ পাপকলঙ্কে ও নির্লিপ্ত থাকিতে পারে। ঈশ্বর পশু অপেক্ষা মনুষ্যকে এই বিশেষ ভাব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পশুজীবনে মনুষ্যজীবনে এই বিভিন্নতা আছে, তাই ভগবান্ মানুষের নিকটে এই চান যে সে সংসারের পাপপঙ্কে লিপ্ত না হয় তিনি চান যে মানুষ পঙ্কজের ন্যায় পঙ্কের ভিতরে নির্লিপ্ত থাকিয়া পুণ্য পবিত্রতার শ্রী সৌন্দর্য্য উপার্জন করে। সেই মনুষ্যজীবনকে পঙ্কজ বলা যায়, যাহা সংসারে থাকিয়াও সংসারপঙ্কে লিপ্ত হয় না। এখানকার বিবাদ বিসংবাদে যাহার চিত্ত উত্তেজিত হয় না—এখানকার নিন্দা স্তুতিতেও যাহার মন বিচলিত হয় না—এখানকার স্বার্থ যাহার চিত্তকে প্রলোভিত করিতে পারে না—সেই জীবন পঙ্কজ। এখানে বহু প্রকার বিকার আছে, সেই সকল বিকার যাহার চিত্তকে বিকৃত করিতে পারে না সেই জীবনকে পঙ্কজ বলা যায়। এখানকার বিদ্যা ও ধনমদ যাহাকে স্ফীত করে না—এখানকার কর্তৃত্বাভিমান প্রভুত্বপ্রিয়তা যাহাকে মত্ত করিতে পারে না—সেই জীবন পঙ্কজ তুল্য।

নরনারী বলিয়া এস্থলে কোন প্রভেদ নাই। ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা নরনারী সকলেরই পক্ষে তুল্য রূপে দেয় কিন্তু তত্রাচ নরজীবন অপেক্ষা নারীজীবনের সৌন্দর্য্য ও গৌরব অধিক। যেমন অধিক গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া ভগবান্ নারীজীবনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তিনি নারীজীবনের নিকট অধিক আশা করেন। নারী যদি ভক্তবৎসল ভগবানের ইচ্ছানুরূপ শ্রী সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারেন, পঙ্কজ তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ নারীজীবনই পঙ্কজের সঙ্গে তুলিত হইবার উপযুক্ত বস্তু। কেন না ইহা যেমন কোমল তেমনি নির্ম্মল, ইহা যেমন আলোকময় তেমনি স্নিগ্ধ, ইহা যেমন বিশুদ্ধ তেমনি সুন্দর। নারী যদি এই স্বর্গের ধন নরকে নিক্ষিপ্ত না করেন, নারী যদি আপনার জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সেই গৌরব সম্ভোগ করিতে পারেন, তাহা হইলেই সে জীবন পঙ্কজ হইয়া যায়।

সমাজ-বিজ্ঞান।

পৃথিবীতে দুই প্রকার জীব আছে, এক প্রকার সাপেক্ষ, আর এক প্রকার নিরপেক্ষ। যাহারা সকল বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা করে তাহারা সাপেক্ষ, যাহাদের ভিতরে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না তাহারা নিরপেক্ষ। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের ভিতরেও এইরূপ সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ উভয়েরই সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাপেক্ষ জীবের মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান, মনুষ্য একদিন এক মুহূর্ত্ত অন্যের অপেক্ষা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। মানুষের জীবনের জন্য যত বস্তুর প্রয়োজন, অন্ন বস্ত্র গৃহ ও গৃহসামগ্রী সমুদয় পরের সাহায্যে লাভ হয়। এক জন মনুষ্যের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যত বস্তুর প্রয়োজন, তাহা সে স্বয়ং নিজের যত্নে প্রস্তুত বা উপার্জ্জন করিতে পারে না। কেহ কৃষি, কেহ বাণিজ্য কার্য্য করে, কেহ শিল্প সাহিত্য চর্চ্চা করে, কেহ বিজ্ঞান দর্শনাদির বিষয় চিন্তা করে, এইরূপে পৃথক পৃথক মনুষ্য পৃথক পৃথক বস্তুজাত প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের জীবনযাত্রার সাহায্য করে। এই জন্য কোন মনুষ্য নিরপেক্ষ হইয়া একাকী স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। দরিদ্রের জন্য ধনীর প্রয়োজন, আবার ধনীর জন্যও দরিদ্রের প্রয়োজন। রাজার জন্য প্রজার প্রয়োজন, আবার প্রজার জন্যও রাজার প্রয়োজন। প্রভুর জন্য ভৃত্য চাই, ভৃত্যের জন্যও প্রভু চাই। মূর্খের জন্য পণ্ডিত চাই, পণ্ডিতের জন্যও মূর্খ চাই। শিল্পীর পণ্যজীবী চাই, পণ্যজীবীর জন্যও শিল্পী চাই। এমন কি একটি সামান্য দীপ শলাকার জন্য মনুষ্যকে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। এই যে পরস্পরের আপেক্ষিকতা, এই আপেক্ষিতার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার পূর্ব্বক নহে কিন্তু মানুষের প্রয়োজনই তাহাকে গ্রামে বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছে। মানুষ পরস্পর হইতে উপকার পাইবার আশায় গ্রামে বাস করে। মানুষেরা যুক্তি পরামর্শ করিয়া গ্রাম রচনা করে নাই, কিন্তু তাহারা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম নগরাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আর কতক গুলি জীব আছে নিরপেক্ষ; যেমন বাঘ ভালুক প্রভৃতি। ইহারা কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। ইহাদের শীতবস্ত্র পরিধেয়বস্ত্রের প্রয়োজন নাই; ইহাদের কৃষি বাণিজ্য শিল্প সাহিত্যের প্রয়োজন নাই; ইহাদের গৃহ ও গৃহসামগ্রীর প্রয়োজন নাই; ইহাদিগের ঔষধ পথ্য ও ডাক্তার কবিরাজের প্রয়োজন নাই। সুতরাং ইহারা নিরপেক্ষ। ইহাদিগের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অপেক্ষার ভাবও আছে। ইহারা যখন নিতান্ত শিশু থাকে তখন

মাতার অপেক্ষা করে। যত দিন আত্মরক্ষায় অসমর্থ থাকে, তত দিনই এই অপেক্ষার ভাব থাকে, তার পর সমর্থ হইলে আর তাহার জননীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। এ স্থলেও মনুষ্যশিশুর সঙ্গে ব্যাঘ্রশিশুর আপেক্ষিকতার অনেক পার্থক্য আছে। একটি ব্যাঘ্রশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই হাটিতে শিখে ও স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দুগ্ধপানাদি করে, মনুষ্যশিশু তাহা পারে না। তাহাকে বহুদিন জননীর অঙ্কে থাকিয়া লালিত-পালিত হইতে হয়। তৎপর পিতা ভ্রাতা খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত মাতৃষসা পিতৃষসা প্রভৃতি পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত থাকিয়া তাঁহাদিগের জীবনের স্নেহ বাৎসল্যময় মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে হয়। সুতরাং মনুষ্য সামাজিক বা সাপেক্ষ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু পশু পক্ষীকে সেরূপ করিতে হয় না। আবার পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের ভিতরে ও ঈশ্বর যে সকল জীবকে সামাজিক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের সুমিষ্ট সামাজিক ভাব দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়, বিবর, সারস মধুমক্ষিকা উই প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যদিও এই সকল জীবের সামাজিক ভাবের ভিতরে অনেক সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আছে, তত্রাচ মানুষের জ্ঞান ধর্ম্ম বিমিশ্রিত সমাজের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। মানুষের উন্নতিশীল বুদ্ধিচাতুর্য্য, মানুষের শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদি সামাজিক উপকরণ ও আয়োজনের কাছে ইহাদিগের আয়োজন উপকরণ অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই।

এইত গেল মানুষের সাংসারিক সামাজিকতা। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধে ও মানুষ সামাজিক না হইয়া, পরস্পরের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বর যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরে ও মানুষকে অনেক সুন্দর বস্তু প্রদান করিয়াছেন। তাহার ঈশ্বর নিষ্ঠা বিশ্বাস, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য প্রভৃতি অনেক সহজলব্ধ সম্পদ আছে সত্য কিন্তু সেই সকল সম্পদের পরিমাণ পরিমিত বা অল্প। মানুষের জ্ঞান আছে কিন্তু অতি অল্প, প্রেম আছে কিন্তু অতি-অল্প, পুণ্য আছে তাহাও অল্প। এই অল্পতা বা অভাব দূর করিবার জন্য সামাজিক সাহায্যের প্রয়োজন। মানুষ যদি সামাজিক হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে এই অভাব বা দারিদ্র আর থাকিতে পারে না। একজন একটি বিষয় বুঝিল, আর একজন আর একটি বিষয় বুঝিল, আর একজন অপর একটি বিষয় বুঝিল এইরূপে সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতে থাকে প্রেম পুণ্য ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি সকলই ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর উচ্চতম অবস্থায় পরিণত হইতে পারে যদি প্রত্যেক মনুষ্য বিনীত হইয়া সাহায্য দেয় এবং সাহায্য গ্রহণ করে। এই

অপূর্ব্ব কৌশলে অপূর্ণ মানব পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়। এবং দুঃখের দশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর মানুষকে সামাজিক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু বাঘ ভালুকের ন্যায় অসমাজিক করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। এই মানুষ যদি ব্যাঘ্রাদির ন্যায় হিংস্র স্বভাব ধারণ করিয়া সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে, এই মানুষ যদি পশুর ন্যায় সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ প্রবৃত্ত থাকে, সে যদি গুণের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দোষ লইয়া আলোচনা করে—অধিকন্তু যদি কল্পনা করিয়া, মিথ্যা করিয়া পর নিন্দায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে আপনাকে সুখী মনে করে, তাহা হইলে সে মানুষ যে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় তৎপক্ষে আর সংশয় নাই। পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিলাম এই জন্য যে পশুরা কল্পনা করিতে জানেনা এবং সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া সমর্থন করিতে পারে না কিন্তু মানুষ পারেও করে।

যিনি যথার্থ মনুষ্য জীবন, পুণ্য পবিত্রতায় ভূষিত জীবন লাভ করিয়া স্বর্গের দিকে উত্থিত হইতে অভিলাষী, তাঁহাকে সামাজিক ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। যাহাতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভগিনীতে ভগিনীতে যথার্থ অনুরাগের বন্ধন দিন দিন বৃদ্ধি হয়, এবং সেই বন্ধনে বদ্ধ হইয়া যাহাতে দিন দিন পরস্পর পরস্পরের হিতৈষণা ব্রতে ব্রতী হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা আবশ্যক। তাহা না করিলে কেহ সুখী হইতে পারিবেন না। বড়ই হন আর ছোটই হন, পরস্পরের অনুরাগ ভিন্ন সুখ নাই। কেহ ধনে বড় কেহ জনে বড়, কেহ বিদ্যাবুদ্ধিতে বড়, কেহ বা ধনমান বিদ্যা বুদ্ধিতে বড় না হইতে পারেন কিন্তু এমন এক গুণে তিনি বড় যে যাহার জন্য তাঁহার আনুগত্য করা তাঁহাকে ভালবাসা, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেওয়া আমার উচিত। যদি আমি অভিমানে স্ফীত হইয়া ধন মানের বা বিদ্যা বুদ্ধির অহঙ্কার করি, ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া, ভগিনীকে ভগিনী বলিয়া যদি সম্মান সমাদর করিতে ভুলিয়া যাই, কদাচ আমি মনুষ্যজীবনের পবিত্র সুখের অধিকারী হইতে পারিব না। কেন না ঈশ্বর আমাকে পর মুখাপেক্ষী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যদি মানুষেরগাত্রের চর্ম্ম রোমশ করিয়া দিতেন, কম্বল কিম্বা বনাতের আর তাহার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ঈশ্বর যাহা করেন নাই সে পথে চলিলে কি কেহ সুখী হইতে পারে? যিনি ঈশ্বরপ্রদর্শিত পথ অতিক্রম করিয়া সুখী হইতে চাহেন তিনি যে অসুখী হইবেন তাহা আর অনুমান করিয়া বুঝিতে হইবে না। যাঁহারা সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত থাকেন, সর্ব্বদা বিদ্বেষ ও অভিমানে

অভিভূত থাকেন, তাঁহারা যদি মনোযোগ দিয়া আপন হৃদয়ের সুখ দুঃখের পরিমাণ কত তাহা চিন্ত করিয়া দেখেন তাহা হইলে অতি সহজে বুঝিত পারেন যে এ পথে সুখ নাই। বিবাদ বিদ্বেষ প্রভৃতি মানুষের ভাব নহে, ইহা পশুর ভাব। মানুষ পশুর ভাব লইয়া সুখী হইবে ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, কিন্তু অনিচ্ছাতেও অনেককে নির্ব্বিবাদ সামাজিক পথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মনে কর, আমার প্রতি দিন লবণের প্রয়োজন। গ্রামে একখানি লবণের দোকান আছে সেই দোকানদারের সঙ্গে আমার বিবাদ। কাজেই আমাকে এক পয়সার লবণের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ক্রোশ হাটিয়া গ্রামান্তরে যাইতে হইবে। দুই এক দিন মনের উষ্ণতায় এইরূপ কার্য্যে কোন ক্লেশ বোধ হয় না, কিন্তু প্রতি দিন হাটিতে হাটিতে মনের উষ্ণতা কমিয়া আইসে, তখন সেই পণ্যজীবীর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া সুখী হই। এই প্রকার পদে পদে বিপদ, মানুষ অনেক সময়ে মানসিক উষ্ণতার জন্য বুঝিতে পারে না—অনেক সময়ে বুঝিয়াও কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না—তাই তাহার দুঃখ ঘোচে না। মানুষ যদি বোঝে, বুঝিয়া কার্য্য করে, তবে তাহার সুখ সৌভাগ্য হাতে বাঁধা।

ভাষাবিজ্ঞান *।

মনুষ্যগণের শিক্ষিতব্য বিষয় গুলিকে বিজ্ঞান ও বিদ্যা এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্যাকে উচ্চ বলা যায়, কিন্তু সাধারণ মতে বিজ্ঞানই উচ্চ। কোন একটি বস্তুকে যন্ত্রাদি দ্বারা দেখিয়া তাহার গূঢ় তত্ত্বনিরূপণ করাকে বিজ্ঞান কহে। বিদ্যা তাহাকে বলে, যদ্দ্বারা ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ হয়। মনুষ্যের জ্ঞাতব্য বিষয় মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাষাই প্রয়োজনীয়। যাহা দ্বারা মনুষ্য পরস্পরের মনের ভাব উভয়ের নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহাকে ভাষা কহে। পাণিনি ও পতঞ্জলি সূক্ষ্মরূপে ভাষাতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা ভাষার আবিষ্কর্ত্তা নহেন। কি প্রকারে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ভাষা হইল এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতগণ অনেক প্রকার বিতর্ক করেন। হাইরোগ্ল্যাফিকনামক ইজিপ্‌টে এক প্রকার অক্ষর ছিল। সে গুলি বিচিত্র অক্ষর। তাহাতে জীব জন্তুর প্রতিকৃতি আঁকা থাকিত। এই অক্ষর দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন প্রথমে লোকে বস্তুর চিত্র সেই বস্তুর স্থলে ব্যবহার করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিত। বাইবেলে লেখা আছে, যে সকল

* ভিক্‌টোরিয়া কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতার সার। এক জন ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত।

মনুষ্য জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটা খুব উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছিল যে, যখন সমুদ্রের জল স্ফীত হইবে তখন সেই স্তম্ভের উপর উঠিলে অত উঁচুতে জল উঠিতে পারিবে না। ঈশ্বর তাহাদিগের এই বিরোধী ভাব দেখিয়া তাহাদিগের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, ইহাতে তাহারা কেহ কাহারও কথা বুঝিতে পারিল না, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কথা কহিতে লাগিল। কথা না বুঝিতে পারায় স্তম্ভ আর হইল না। এক জন একটা জিনিষ চায়, আর এক জন তাহার উল্টা বুঝে। কেহ কেহ বলেন এই প্রকারে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রথমে যতগুলি এক সঙ্গে বাস করিত, তাহারা যে বস্তুর যে নাম দিয়াছে সেই গুলি সেই সকল লোকের ভাষা হইয়াছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল লোক ভিন্ন স্থানের লোকের সঙ্গে মেশাতে ভাষাও মিশ্র হইয়াছে। কাহারও কাহারও মত এই যে, বস্তু মাত্রের চিত্র দেখাইলেও সে বস্তু বুঝা যাইতে পারে, সুতরাং তাহার স্বতন্ত্র নামের প্রথমে প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু চলা যাওয়া বসা প্রভৃতি ক্রিয়ার কোন চিত্র নাই, সুতরাং সেই সকলের কথা হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। এই আবশ্যক হইতে যে শব্দগুলি হইয়াছে, সেইগুলি পরে সকল শব্দের মূল হইয়াছে। এই সকল মূলকে ধাতু বলে। একটি ধাতু হইতে কত প্রকার কথা উৎপন্ন হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ভাষা মনুষ্যের কি ঈশ্বরের রচিত? ভাষা মনুষ্যেরা বুদ্ধিপূর্ব্বক রচনা করিয়াছে, তাহা নহে, স্বভাবের প্রেরণায় উহা স্বতঃ হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবের মধ্যে স্বভাবের ঈশ্বরের ক্রিয়া কেনই বা না থাকিবে? মানুষ না জানিয়া শুনিয়া যে প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়া তুলে তাহার দৃষ্টান্ত মুদ্রাযন্ত্র। এক জন লোক খেলা করিতে করিতে গাছের ছালে কয়টি অক্ষরের ন্যায় আঁক কাটিয়া বরফের উপর মুদ্রিত করেন। তাহা হইতে এখন এত বড় মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপার উপস্থিত। যিনি প্রথমে ছাপা আবিষ্কার করেন, তিনি খেলা করিতে করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে পরে তাঁর এত সম্মান হইবে। ভাষার তিনটি অঙ্গ আছে, ১ম ব্যাকরণ, ২য় অলঙ্কার ৩য় ন্যায়। কতকগুলি কথা সংযুক্ত করিয়া এক বা ততোধিক বাক্য করা ও সে গুলিকে বিযুক্ত করা এবং কোন্ ধাতু হইতে সেই কথা গুলি উৎপন্ন হইয়াছে সেই সকল নিরূপণ করা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। ভাবোদ্দীপ্ত বাক্যকে অলঙ্কার কহে। যখন অত্যন্ত আনন্দ কিংবা দুঃখের সহিত কোন ভাবসংযুক্ত কথা বলা যায় তাহা অলঙ্কার মধ্যে গণ্য হয়।

যেমন কোন জিনিষকেই অলঙ্কার শূন্য হইলে ভাল দেখায় না সেই রূপ ভাষাতেও অলঙ্কার না থাকিলে ভাল শুনায় না। যুক্তিমূলক বাক্যকে ন্যায় বলে। যে বাক্য দ্বারা লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া যায় তাহা ন্যায়ের অন্তর্গত। পূর্ব্বে অলঙ্কার ও ন্যায় এক ছিল। কারণ তখন কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা সে বিষয় দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য এক ভাব উদ্দীপন করিলেই চলিত, লোকে তখন বিচার করিত না। ক্রমে অলঙ্কার ও ন্যায় বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতি।

প্রকৃতির বিচিত্রতা, অদ্ভুত কৌশল, ও গতিশক্তি ক্ষণ কাল স্থির হইয়া দেখিলে ও ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা প্রকৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, অথচ আমরা উহাকে ভাবি না, মনোযোগ পূর্ব্বক দেখি না। বাহ্য প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতিতে কেমন সামঞ্জস্য আমরা সামান্য জ্ঞানে অল্পই বুঝিতে পারি। প্রথমতঃ প্রকৃতি সহজ ও স্বাভাবিক; যথা জল, বায়ু, অগ্নি ভূমি, আকাশ। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল দূরস্থ হইয়াও কেমন নিগূঢ় যোগে আবদ্ধ। আবার এই ভৌতিক প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির কেমন মিলন। সুধু মিলন নহে যোগ ও আকর্ষণও আছে। অতি দূরে কত কোটি ক্রোশ অন্তরে সূর্য্য আছে, কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে কেমন তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ। আবার এই পৃথিবী সঙ্গে আমাদের শরীরের কেমন যোগ! আমরা অনেক সময় মনে করি এই যে জড় ধরা, ইহার সহিত আবার আমাদের কি যোগ থাকিবে। এ হইল অচেতন, আমরা হলাম মানুষ, অচেতনের সঙ্গে আমাদের কি যোগ? জড়ের ধার আমরা ধারি না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, পৃথিবী আমাদের মাতার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ যত্ন সহকারে কোলে করিয়া রক্ষা করিতেছে। মস্তকের উপরে এই যে অনন্ত আকাশ জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য, ইহা আমাদের পিতার ন্যায় পালন করিতেছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণের সঙ্গে আমাদের দেহ রক্ষণোপযোগী বস্তু গুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যখন বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করিয়া দেখি, তখন আকাশকে বৈদিক ঋষিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পিতা বলিয়া সম্বোধন করি। আমরা ছেলে বয়সে হাত বাড়াইয়া গগনের চাঁদ ধরিতে যাইতাম। কিন্তু যাই জ্ঞানের সঞ্চার হইল অমনি আপনাকে আপনি উপহাস করিলাম। কথায় বলে, বামন হয়ে হাত বাড়ালে কি গগনের চাঁদ ধরা যায়? এখন ভাবি সূর্য্য চন্দ্র আর এক রাজ্যে এ রাজ্যে নহে। চাঁদের দিকে চাহিয়া বলি, ওহে গগনচাঁদ, তোমাকে কি বুঝিব, কেমনে ধরিব!! ধরা বোঝা অসম্ভব,

কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার অতি নিগূঢ় যোগ। তুমি নামিয়া আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিতে পার না, আমিও উড়িয়া গিয়া তোমাকে ধরিতে পারি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার এ শরীরের কেমন যোগ। সূর্য্য তুমি অতি ভয়ানক। তুমি কত কোটি ক্রোশ দূরে রহিয়াছ, তোমার দিকে আমরা চাহিতে পারি না, একটু যদি পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হও, তাহা হইলে কিছুই থাকে না, ক্ষণকাল মধ্যে সকলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৎসরে সাত শত পঁয়ষট্টি কোটি আশি লক্ষ মোনেরও কিছু বেশি কয়লা খনি হইতে তোলা হয়, সেই সমুদায় কয়লা পুড়িলে যে উত্তাপ হয়, তার চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশি উত্তাপ হইলে তবে তুমি বৎসরে যে উত্তাপ দাও তার সঙ্গে তুলনা হয়। বল, তুমি এক দিনে যদি সে উত্তাপ ঢাল, পৃথিবী কোথায় থাকে? এত উত্তাপের বাহক তুমি, অথচ তুমি ঠিক স্থানে থাকিয়া আমাদের কত উপকার করিতেছ। এ জগত এক মুহূর্ত্ত বাঁচে না তোমা ভিন্ন। অতি সুন্দর গোলাপ জুই বেল মল্লিকা নানা জাতি পুষ্প তোমা হইতে উৎপন্ন হয়, আবার তোমার উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়। এই বায়ু ও বরুণ (জল) দুই ভাই, ইহাদের আমরা সর্ব্বক্ষণ চাই। আমাদের এই পঞ্চভূতময় অদ্ভুত দেহ জল বাতাস অগ্নি বিনা বাঁচে না, সর্ব্বক্ষণই এদের দরকার। দুগ্ধ পান করে শিশু যেমন বাঁচিয়া থাকে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের জীবন জল পান ও বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইতেছে। 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম'- এই পঞ্চভূতময় জগৎ সংসার পঞ্চভূতময়দেহের পুষ্টিসাধন করে। অগণ্য অসঙ্খ্য বৃক্ষরাজি, ইহারা কি কম উপকার করিতেছে? ইহাদেরই কাছে বা আমরা কত ঋণি। ইহারা যে কেবল ছায়া দিয়া ফল ফুল দিয়া উপকার করিতেছে তাহা নয়, আশ্চর্য্য সৃষ্টির কৌশলে ইহারা আমাদের শরীরের দূষিত বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিতেছে আর ইহাদের ভাল পরিষ্কার বায়ু আমাদের দিতেছে। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যাহা কিছু মন্দ বিষাক্ত (বায়ু অঙ্গারজন) বাহির করিয়া দিতেছি, যাহা ভাল বায়ু (অম্লজন) গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া যাইতেছি।

অপারপ্রকৃতিতত্ত্ব কে বলিয়া উঠিবে? প্রকাণ্ড সমুদ্র হইতে একটি মুক্তা তুলিতে চেষ্টা করা গেল তাও হইল না। রত্নাকরের কত রত্ন কার সাধ্য যে তার সমুদায় রত্ন তোলে? তবুও একটি মুক্তা তুলিতেও সাধ যায়। বুদ্ধি অল্প কিন্তু মনের আশা বড়, এক দিন না এক দিন প্রকৃতির পার পাইব, এই আশাতেই মনে মনে কত সুখ হয়। যাউক, এই যে বাহ্যপ্রকৃতি ইহা আরও কত প্রকারে শরীরের রক্ষক হইয়া আমাদের রক্ষা করিতেছে। একটু জল পাইতে বিলম্ব হইলে মনে হয় আর প্রাণ বুঝি

থাকে না। একটু বায়ু বন্ধ হলে শ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া আইসে প্রাণ যায়, যদি শস্যক্ষেত্রে ধান্য না হয় মানুষ বাঁচে না। কে এই প্রকৃতি? কেন এ আমাদের এত উপকার করে? অবশ্য প্রকৃতির যিনি কর্ত্তা তাঁহারই আদেশে এ আমাদের সেবায় নিয়ত নিরত। সে আমাদের প্রাণ রক্ষা করে, নয়ন মন তৃপ্তি করে। ভূতভাবন বিশ্বপতি বাহিরে যেমন প্রকৃতি রচনা করিলেন, তেমনি আমাদের অন্তরেও প্রকৃতি রচনা করিয়াছেন। বাহিরের প্রকৃতি এবং অন্তরের প্রকৃতি এ দুইকে মিলাইয়া লইতে হইবে। প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ না থাকিলেই বিপদ। জল পৃথিবীর এত উপকারী, কিন্তু অধিক জলে ক্ষতি হয়। যে জলে পৃথিবীর শস্য ফল ফুল হইয়া জীবের কল্যাণ হয়, সেই জল অধিক হইলে শস্য ফল ফুল সমস্ত নষ্ট হয়, পচিয়া যায়। বায়ু অগ্নি সকলের সম্বন্ধেই এই প্রকার বলিতে পারা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মে পরমাণুসমষ্টি ঠিক আছে, এবং ঠিক আছে বলিয়াই জগত রক্ষা পায়। আজ যদি ইহার ব্যতিক্রম হয় ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হয়, বিপদ্ কেন সমুদায় সুন্দর জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। আমাদের মনের বৃত্তিসকলও এই প্রকার। বৃত্তি স্বভাবে থাকিলে মনোরাজ্যের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে, কিন্তু স্বভাবকে উল্লঙ্ঘন করিলেই বিপদ্। রাগ লোভ অহঙ্কার স্বভাবের রেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু যাই রেখা অতিক্রম করে অমনি সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। পাপের প্রতিরোধ, স্বর্গীয় বস্তুর প্রতি লোভ, আমি ঈশ্বরের দাস বলিয়া অভিমান, কিছুতেই মন্দ বলিতে পারি না, এ রেখার ভিতরে থাকিলে কি আর ক্রোধাদিতে অনিষ্ট হইতে পারে? আন্তরিক প্রকৃতির মধ্যে এমন কতক বৃত্তি আছে, যাহার পরিমাণ বাহ্যপ্রকৃতির পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। জল বায়ু প্রভৃতির বৃদ্ধির একটা পরিমাণ আছে, সে পরিমাণ ছাড়িলেই অনিষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষমা দয়া বিনয় বিশ্বাস কোমলতা প্রভৃতি যত বাড়ে ততই মানবের মঙ্গল। এ গুলির বাড়িবার পরিমাণ নাই। কেন নাই? এই জন্য নাই যে ইহারা অনন্ত বিশ্বপতিকে লইয়া অনন্ত কাল বাড়িতে থাকিবে এবং তাঁহার সঙ্গে একত্ব লাভ করিবে। এই উভয়বিধ প্রকৃতি হইতে ভাবুক এক এক রত্ন গ্রহণ করেন। কবি জ্ঞানী বিজ্ঞানী মহাজন ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুরূপ রত্ন বাহির করেন। এই প্রকৃতিকে আমরা নমস্কার করি। ইনি সতী হইয়া ইঁহার পতির কথা নিরন্তর আমাদের শিক্ষা দেন। আমাদের আর্য্য মহোদয়গণ সাধে কি চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণকে পূজা করিতেন? প্রকৃতির ভিতরে প্রকৃতির স্বামীকে দেখিয়া বৃক্ষ পর্ব্বত সকলকেই, আমরা নমস্কার করি।

নেপোলিয়ানের পারিবারিক ঘটনা।

ফ্রান্সের বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ান খৃষ্টাব্দের ১৭৯৮ সালে এসিয়া জয় করিবার জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য এবং রণতরী লইয়া ইজিপ্ট দেশে আসিয়া প্রথমে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া তাহাকে স্বাধীন করিবেন ইহাও তাঁর সঙ্কল্প ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে যাত্রা তিনি ইংরাজদিগের হাতে পরাভূত হইলেন। আঠার মাস কাল স্বদেশের কোন সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছে নাই, ইংরাজেরা পত্রাদি গমনাগমনের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। অনেক কৌশলে অতি আশ্চর্য্য সাহসে ভর করিয়া নেপোলিয়ান কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

তাঁহার অনুপস্থিত কালে তদীয় পত্নী জোসেফাইন পারিস নগরে অবস্থিতি করিতেন। স্বামী যেমন মহাবলপরাক্রান্ত বীরাগ্রগণ্য, স্ত্রীও তেমনি রূপ লাবণ্যে ভদ্রতা সৌজন্যে তৎকালের নারীকুলের প্রধানা ছিলেন। জোসেফাইনের পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ হয়, এবং প্রথম স্বামীর ঔরসজাত গুটিকতক সন্তানও তাঁহার ছিল। নেপোলিয়ানের অপেক্ষা তিনি বয়সে কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমন ভালবাসা ছিল, যে সে সময়ে এরূপ দাম্পত্যপ্রণয়ের দৃষ্টান্ত বড় দেখা যাইত না। নেপোলিয়ানের যেমন সাহস বীরত্ব তেমনি প্রেম। যৎকালে তিনি ইজিপ্ট দেশে এক প্রকার বন্দীভাবে কাল যাপন করেন, জোসেফাইন তখন স্বামীর গৌরব বৃদ্ধি জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বে তিনি একটী সামান্যা নারী ছিলেন। এক্ষণে উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রসমাজে স্থান অধিকার করাতে অনেকানেক মহিলার চক্ষুশূল হইয়া পড়িলেন। বড় বড় বিজ্ঞানী পণ্ডিত, যোদ্ধা পুরুষ এবং রাজনীতিজ্ঞ জোসেফাইনের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইতেন। এই জন্য তাঁহার উপর কতকগুলি স্ত্রী এবং স্ত্রৈণ পুরুষের হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হয়। এমন কি নেপোলিয়নের কোন কোন ভাই ভগিনীও শত্রু হইয়া দাঁড়ান। এই সকল বিদ্বেষী লোককর্ত্তৃক জোসেফাইনের নামে নানা প্রকার মিথ্যা কলঙ্ক চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ান যে দেশে গিয়া পড়িয়াছিলেন, সেখানে বাড়ীর কি দেশের এক খানিও চিঠি পত্র পাইবার আশা নাই, ইংরাজেরা সব পথ আটকাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য হিংসা বিদ্বেষের গতি শক্তি! পথের সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া নেপোলিয়ানের নিকট জোসেফাইনের চরিত্রের বিরুদ্ধে এক পত্র গিয়া পৌঁছিল। তিনি শিবিরে বসিয়া আছেন, জনৈক

সহচর সেই পত্র তাঁহার নিকট পাঠ করিল। পত্র শ্রবণে তিনি ভয়ানকরূপে অস্থির হইলেন। সিংহশাবকের ন্যায় পদচালনা করিতে করিতে বলিলেন, "কেন আমি সে স্ত্রীলোককে ভালবাসিব? কেন আমি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিব না? তাই আমি করিব। আমি প্রকাশ্যরূপে এই দণ্ডে তাহাকে ত্যাগপত্র লিখিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া স্ত্রীকে এক খানি খুব কড়া চিঠি লিখিলেন। নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সে পত্রও জোসেফাইনের হস্তগত হয়।

অনন্তর বীরবর যখন বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পঞ্চাশ দিনের পর ফ্রান্সের অন্তর্গত লিয়ন নগরে পৌঁছিলেন। তখন বিদ্যুৎ বেগে দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার পৌঁছান সংবাদ প্রচারিত হইল। দেশের সমস্ত লোক উন্মাদের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। জোসেফাইন যাই সংবাদ পাইলেন, অমনি গাড়ির ডাকে উক্ত নগরের অভিমুখে স্বামীদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। আড়াই শত ক্রোশ পথ ক্রমাগত দিন রাত্রি জাগিয়া না খাইয়া চলিলেন। কিন্তু হায় কি দুর্ভাগ্য! তিনিও গম্যস্থানে পৌঁছিলেন, তাঁহার স্বামী অন্য এক পথ দিয়া পারিসে চলিয়া আসিলেন। একে জোসেফাইনের মনে নানা আশঙ্কা ছিল, তার পর এই ঘটনা, একেবারে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কি করিবেন, তৎক্ষণাৎ আবার নিজ বাসস্থানে ফিরিলেন। তাঁহার দুই দিন অগ্রে নেপোলিয়ান পারিসে উপনীত হন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন স্ত্রী গৃহে নাই, আরো সন্দেহ বাড়িল। জোসেফাইনের শত্রুরা সেই সন্দেহ আগুনে আহুতি দিতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কেবলই জানালা দিয়া দেখিতেছেন স্ত্রী আসিতেছে কি না। কোন বন্ধুবেশধারী গুপ্ত শত্রু বলিল, এখনি তিনি তাঁহার হাব ভাব সৌন্দর্য্য বিলাসের সহিত তোমাকে দেখা দিবেন, এবং সকল কথা অবগত করিবেন। তুমিও তাঁহাকে ক্ষমা করিবে, এবং পুনরায় সব গোল মিটিয়া যাইবে।" তদুত্তরে সিংহগর্জ্জনে নেপোলিয়ন ক্রোধকম্পিত ওষ্ঠাধরে বলিলেন, "কখন না! কখন আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না! আমাকে তুমি জান! যদি নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা না করিতাম, তাহা হইলে আমার এই হৃদয় ছিন্ন করিয়া আগুনে ফেলিয়া দিতাম!"

এ দিকে দেশ শুদ্ধ লোকে তাঁহাকে পাইয়া জয়ধ্বনি করিতেছে, মহা উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিতর তিনি ম্লানমুখে অতি ক্লেশে এই পারিবারিক অশান্তি বহন করিতেছেন। স্ত্রীর প্রতি যেমন প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, তেমনি তীব্রতর ঘৃণা জন্মিল। দুই দিন পরে জোসেফাইন শ্রান্ত ক্লান্ত মৃতপ্রায় হইয়া

বাড়ী পৌঁছিলেন। অন্যান্য সময়ে নিয়ম ছিল, তাঁহার গাড়ী পৌঁছিবামাত্র নেপোলিয়ান সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া আনিতেন। গভীর রাত্রে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন, পুত্র ইউজিনি তৎক্ষণাৎ মাতার কোলে গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কিন্তু নেপোলিয়ান প্রস্তরের মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া ডাইনের মত তার পানে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, "মহাশয়া, আমার ইচ্ছা যে আপনি এই দণ্ডে "ম্যালমাসন" বাড়ীতে চলিয়া যান।"

জোসেফাইন সেই বজ্রতুল্য বাণী শ্রবণে এবং সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন এবং কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্দণ্ডে ছয় ক্রোশ দূরে সেই বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন নেপোলিয়নের দয়া হইল, পুত্র ইউজিনিকে বলিলেন, এখন কিছু আহারাদি কর এবং বিশ্রাম কর। দুই দিন স্বামী স্ত্রী দুঃসহ বিরহানলে পুড়িয়া তথায় রহিলেন, কেহ কাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করিলেন না। তৃতীয় দিবসে নেপোলিয়নের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যেন হঠাৎ অজ্ঞাতসারে জোসেফাইনের প্রকোষ্ঠে আস্তে আস্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জোসেফাইন টেবিলের উপর গালে হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন, ভাবিতেছেন, আর সেই নিদারুণ পত্র খানি সম্মুখে খোলা পড়িয়া আছে। নেপোলিয়ন হঠাৎ করুণ স্বরে কাতর ভাবে ডাকিলেন "জোসেফাইন।" ডাক শুনিবামাত্র তিনি সচকিত হইয়া সজলনেত্রে "মনামি" (বিশেষ প্রিয় সম্বোধন) বলিয়া উত্তর করিলেন। তখন নেপোলিয়ান পরাস্ত হইয়া হস্ত বিস্তার করিলেন, জোসেফাইন আনন্দও শোকমিশ্র হৃদয়ে তাঁহার হাতের উপর পড়িয়া বুকে মাথা রাখিয়া এমনি কাঁদিতে লাগিলেন, যে মহা কম্প উপস্থিত হইল, ক্রন্দনে উভয়ের অঙ্গ ভাসিয়া গলিয়া গেল। পরে সব কথা তিনি আনুপূর্ব্বিক ভাঙ্গিয়া বলিলেন, সন্দেহ ক্রোধ সব চলিয়া গেল, প্রেম ফিরিয়া আসিল, সম্পূর্ণরূপে চিত্ত আরাম শান্তি পাইল, সে শান্তি আর কখন ভঙ্গ হয় নাই।

মনোরমা।

সপ্তম অধ্যায়।

পর দিবস প্রাতে পূর্ব্বোক্ত রাজেন্দ্র বাবু একটু অন্যমনা হইয়া হৌসে যাইতেছেন। ভাবিতেছেন একশত টাকার নোট খানা বৃথা গেল। মনোরমা আজ প্রত্যূষ হইতে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মনোরমা অন্য দিন অনিচ্ছার সহিত ভিক্ষা করিতে যায়। বৈষ্ণবী দেখিল সে দিন সে ভারি ব্যগ্র হইয়া ভিক্ষা করিতে যাইতেছে। বৈষ্ণবী

প্রীত হইল, ভাবিল "বোকা ছুঁড়ীর বুদ্ধি হয়েছে।" হবে না কেন? আমি রাস্‌মণি বৈষ্ণবী আমার কেমন শিক্ষা! অন্য অন্য দিন বালিকা ভিক্ষা করিতে যায়, দ্বিপ্রহরের পর শুষ্কমুখ ফিরিয়া আসে। আজ বৈষ্ণবী সদয় হইয়া তাহাকে আঁচল ভরিয়া জলপান দিল। কিন্তু খাইবে কে মনোরমার কি ক্ষুধা আছে? সে ভাবিতেছে, কত ক্ষণে দয়ালু যুবকের নোটখানি ফিরাইয়া দিবে। সে দিন আর সে ভিক্ষা করিতে পারিল না, যদি কেহ দয়া করিয়া দুই এক পয়সা ফেলিয়া দিতে লাগিল তাহাই অন্য মনে কুড়াইতেছিল। পদশব্দ পাইলেই সচকিত হইয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। এমন সময়ে দেখিল, দূর হইতে রাজেন্দ্র বাবু আসিতেছেন। বালিকা উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নিকটে অসিবা মাত্র ক্ষুদ্র হস্তে নোট খানি তুলিয়া ধরিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমি কাল হইতে এখানি তুলিয়া রাখিয়াছি। আপনি আমাকে পয়সা দিবার সময় আপনার পকেট হইতে রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিল।" রাজেন্দ্র বাবু এত ক্ষণ নোট খানির জন্য ক্ষুণ্ণ চিত্ত ছিলেন, হঠাৎ তাহা পুনর্লাভে চমৎকৃত এবং আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু বালিকার সত্যপ্রিয়তা এবং কৃতজ্ঞতা দেখিয়া আরো আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। জনাকীর্ণ উত্তপ্ত রাজপথে বালিকার আগ্রহ, স্বেদরঞ্জিত ভাবোদ্দীপ্ত সুন্দর করুণ মুখখানি যেন হিমানীসিক্ত কুসুমবৎ প্রতীত হইতে লাগিল—রাজেন্দ্র বাবু অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। বালিকা আবার আগ্রহের সহিত কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বৈষ্ণবী যদি কাড়িয়া লয় এই ভয়ে আমি রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাই নাই, কাপড়ের মধ্যে রাখিয়াছিলাম, আজ তাড়াতাড়ি দিতে এয়েছি। কালই আপনাকে দিতে গিয়াছিলাম। আপনি দূরে চলিয়া গেলেন তাই দিতে পারি নাই।" রাজেন্দ্র বাবুর চমক ভাঙ্গিল, হাত পাতিয়া নোটখানি লইলেন। আর বালিকার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "আচ্ছা তুমি বড় ভাল মেয়ে তুমি দুঃখীর ঘরের হইয়া এক শত টাকার লোভ কিরূপে সামলাইলে, তা ভগবান্ তোমার মতি ভালই রাখুন। তোমার মত মেয়ে পেয়ে তোমার বাপ মা না জানি কত সুখী।" এই শেষ কথাটি তিনি আপন মনে একটু মৃদুস্বরে বলিলেন। "বাপ মা" মনোরমার কর্ণে গেল। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, সে মুখ হেঁট করিয়া বলিল আমার বাপ মা নাই। বৈষ্ণবী আমার মাসী নয়ত সে আমার কেহ নয়। কিন্তু মাসী না বলিলে আমার বড় মারে গালাগালি দেয়, তাই মাসী বলি ভয় চকিত স্বরে বালিকা বৈষ্ণবীর কথা বলিল। পরদুঃখে কাতর রাজেন্দ্র বাবুর মন বালিকার দুঃখে দয়ায় আর্দ্র

হইল। তিনি বলিলেন, "আহা তোমায় মারে, তবে তুমি কেন তার কাছে থাক, তোমার কি আর কেউ নাই?" বালিকা বলিল "আমি আর কোথা যাব? আমার যে কেউ নাই!" রাজেন্দ্র বাবু ভাবিলেন, "এ বালিকা নিশ্চয়ই ভদ্রঘরের। বৈষ্ণবী কোন কৌশলে ইহাকে শৈশব অবস্থায় অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়া থাকিবে। অবশেষে নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ইহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাইয়াছে। কি পরিতাপ! এমন কোমল বয়সে ইহার কি না পরের দাসত্ব লাঞ্ছনা সহিতে হইতেছে না জানি এ কন্যা কাহার ঘরের আনন্দ পুতলী ছিল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "বৈষ্ণবী কোথায় থাকে? আমায় লইয়া চল, আমি তাহার সহিত দেখা করিব, সে কেন তোমায় মারে জিজ্ঞাসা করিব।" বালিকা চারি দিকে চাহিয়া ভয়চকিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "না না সে আমায় তাহলে মারিয়া ফেলিবে, তাহাকে কিছু বলিয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজেন্দ্র বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "নোট পাইয়াছি শুনিয়া বিমলা কত সুখী হইবে। ইচ্ছা করে বিমলা এই বালিকাটীকে দেখে। আচ্ছা, বালিকাত আমার কেহ নয়, কিন্তু দুই দিন মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি। মনে হইতেছে তাহার মুখ খানি যেন আমার চিরপরিচিত।"

অষ্টম অধ্যায়।

যতক্ষণ রাজেন্দ্র বাবু বালিকার সহিত কথা কহিতেছিলেন, রাজপথের অপর পার্শ্বে এক জন ভদ্রবেশধারী পুরুষ জনতার মধ্যে এ দিক ও দিক বেড়াইতেছিল, আর এক এক বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বালিকাকে লক্ষ্য করিতেছিল। কিছু ক্ষণ লক্ষ্য করিয়া আপন মনে মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "ঠিক যেন সেই মেয়েটী। তেমনি চোক মুখ সব, কেবল একটু বড়। স্বরও তেমনি। আচ্ছা সেই বা এখানে কেমন করিয়া আসিল? আমিত তাকে বর্দ্ধমানে গোয়ালার ঘরে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। দেখি, খোঁজ লইতে হইল। যে বাবুটির সঙ্গে সে কথা কহিতেছিল সেই বা কে। যেন চেনা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে।" রাজেন্দ্র বাবু কিছু দূর অগ্রসর হইবা মাত্র বালিকা যে পথে গিয়াছিল, সে সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া দেখিল, এক ক্ষুদ্র গলি, তাহার ভিতর বিস্তর খোলার ঘর। অনেক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ভিখারীদের বাস। সেই স্থানে সে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় দেখিল, সেই বালিকা এবং এক জন কৃষ্ণাঙ্গী বৈষ্ণবী একটি ঘর হইতে বাহির হইতেছে। বৈষ্ণবী হাত মুখ নাড়িয়া বলিতেছে, "কি লা এত ক্ষণ ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলি, এই কটা বই পয়সা আনিস্—নাই? এতক্ষণ বুঝি রাস্তায় খেলা কচ্ছিলি? আবার যা নইলে আজ টের পাবি, আজ

তোর উপোস্ করতে হবে, বজ্জাত ছুঁড়ি।"

বালিকা— (অবনত মুখে বলিল) "আমি অনেক পয়সা ত আনিয়াদিয়াছি ইহার বেশী—

বৈষ্ণবী—"চুপ কর আবার মুখের উপর কথা! এখনি যা, নইলে" এই বলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে বালিকার কেশ আকর্ষণ করিয়া রাস্তার দিকে লইয়া গেল. বালিকার চক্ষু দিয়া দর দর ধারা বহিতে লাগিল। সে কেবল এক বার অস্পষ্টস্বরে "মা গো" বলিয়া নীরব হইল। সেই অপরিচিত পুরুষটি এত ক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। বৈষ্ণবীর কঠোর ব্যবহার দেখিয়া অগ্রসর হইল এবং বলিয়া উঠিল, "ওকি ওকি থাম। অকারণ মারিও না।" বৈষ্ণবী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল,"তুই কে রে! আমার বহিনঝিকে আমি যা খুসী করিব তোর বাবার কি?" আগন্তুক কহিল, "আমি কে তার পরিচয় দিতেছি। তুই এখন একে ছেড়ে দে, নতুবা পুলিস ডাকিয়া দিব—তুই এ মেয়ের মাসী কি না আমি বিলক্ষণ জানি।" ধমক শুনিয়া বৈষ্ণবী একটু নরম হইল। দুষ্টকে ভয় না দেখাইলে কখন বশ হয় না এই রূপই সংসারের রীতি। বৈষ্ণবী বালিকার চুল ছাড়িয়া দিল। আগন্তুক বালিকাকে বলিল, 'যাওত বাছা, খেলা করিতে যাও।" বালিকা মুক্ত পথে পলায়ন করিয়া বাঁচিল।

তখন সেই ব্যক্তি বৈষ্ণবীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,"দেখ, মেয়েটীকে আর মারিও না। উটীকে যদি যত্নে রাখিতে পার এক সময়ে বিস্তর রোজগার করিতে পারিবে। আমি উহার পরিচয় জানি, খুব ধনীর ঘরের মেয়ে। এখন কিন্তু আমার কথা শুনিয়া চলিতে হইবে। এখন উহাকে এই ভাবেই রাখ যখন সময় হইবে,যথার্থ কথা প্রকাশ করিও।" বৈষ্ণবী অবাক্ হইয়া রহিল। আগন্তুক আবার বলিল, "দেখ ইহার পরিচয় খুব গোপনে রাখিও, যেন এখন কেহ কিছু টের না পায়। আজ আমি দেখিলাম, রাস্তার এক জন ভদ্র লোকের সঙ্গে বালিকা কথা কহিতেছিল, আর তার হাতে কি তুলিয়া দিল। আমার বোধ হইল যেন নোট, তুমি খোঁজ লইও ত।"

আগন্তুক প্রস্থান করিল নোটের কথা শুনিয়া বৈষ্ণবী অস্থির হইল। মনোরমা কখন ফিরিয়া আসিবে, তাহাকে সমুদয় জিজ্ঞাসা করিবে, এই প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অনেক বিলম্ব হইয়া গেল, সে আসিল না দেখিয়া বৈষ্ণবী আপনি ভিক্ষায় গেল। ভাবিল আসিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে। ওদিকে মনোরমা অনাহার এবং কেশাকর্ষণের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া পথে ভিক্ষা করিতে গেল, দুই চারি স্থানে ভিক্ষাও মিলিল। কিন্তু সে শীঘ্র ভয়ে বাড়ী ফিরিল না, বৈষ্ণবীর কঠোর ব্যবহার

তাহার যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। রাজপথপার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড ছায়াযুক্ত বটবৃক্ষ ছিল, তাহার নিম্নে বালিকা ক্ষুদ্র মলিন ছিন্ন অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিল, এবং বাহুতে মস্তক রক্ষা করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইল। বায়ুপ্রবাহ আসিয়া এক এক বার তাহার ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল এবং ললাটস্থ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সকল উড়াইতেছিল বালিকা অচেতন প্রায় হইয়া নিদ্রামগ্ন রহিল। নিদ্রিত অবস্থায় এক এক বার তাহার ক্ষীণ মুখ খানিতে ঈষৎ হাসি দেখা দিতেছিল, বৃষ্টি অবসানে মেঘপ্রান্তে ক্ষীণ বিদ্যুৎ রশ্মির তুল্য সে হাসির শোভা। কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগমন-কালে রাজেন্দ্র বাবুর বালিকার ভূতলশায়ী মূর্ত্তি দেখিয়া এই ভাব মনে উদয় হইল। তিনি ক্ষণ কাল তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রীত নয়নে এই দৃশ্য দেখিলেন। পরে গৃহাভিমুকে যাত্রা করিলেন, অল্প পথ গিয়াছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন এক জন বৈষ্ণবী হন্ হন্ করিয়া সেই দিকে আসিতেছে। বৈষ্ণবী এ দিক ওদিক্ চাহিয়া বৃক্ষতলস্থ বালিকাকে দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র রাক্ষসীর ন্যায় বিক্রমে নিদ্রিত বালিকার কেশাকর্ষণ করিয়া তুলিল। বালিকা যন্ত্রণায় হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন করিল এবং সম্মুখে বৈষ্ণবীর কর্কশ মূর্ত্তি দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইল বৈষ্ণবী সেই অবস্থায় তাহার হস্ত এবং কেশ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। রাজেন্দ্র বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, দ্রুত আসিয়া হস্তস্থ ছড়ি তুলিয়া বলিলেন "থাক, আর না—ছাড়—নতুবা এখনি পুলিস ডাকিয়া দিব।" বৈষ্ণবী চমকিত হইয়া বালিকাকে ছাড়িয়া দিল কিন্তু তাহার ক্রোধ তখনও যায় নাই। সেদিন প্রহার করিতে গিয়া দুই বার বাধা পাইল, আর কি তাহার সহ্য হয়? কিন্তু ভদ্রলোকের সম্মুখে কিছু করিতে পারিল না, মনে ভাবিল "আজ বাড়ী যাই দেখি উহাকে কে রাখে?" প্রকাশ্যে বলিল, "চল্ বাড়ী চল্।" বালিকা আর থাকিতে পারিল না, করুণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "না না আমি যাব না। তুমি আমায় ছেড়ে দাও গো। আমি এই গাছতলায় পড়ে থাকি।"

বৈষ্ণবী রুক্ষ হাসি হাসিয়া রাজেন্দ্র বাবুকে কহিল, "দেখুন না মহাশয়, আমার বহিনঝিটি পাগলের মত, কখন কি বলে ঠিক নাই। চল বাছা ঘরে চল।" রাজেন্দ্র বাবু ভাবিলেন. দুষ্টলোকের হাসি এবং কপট সৌজন্য কি ভয়ানক।" বালিকা আবার বলিল, "না না আমি তোমার সঙ্গে যাইব না—তুমি আমার কেউ নও। আমার কেহ নাই। আমি এখানে পড়ে থাকি। তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও।" এই বলিয়া

সে ক্ষুদ্র কোমল বাহুদ্বয় দ্বারা বৃক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। রাজেন্দ্র বাবুর চক্ষে জল আসিল, তিনি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিলেন, "বাছা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? চল" মনোরমা এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া মহাব্যাগ্র হইয়া বাহুদ্বয়কে বৃক্ষচ্যুত করিয়া রাজেন্দ্র বাবুর চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "যাব যাব, আমায় নিয়ে চলুন। বৈষ্ণবীর সঙ্গে আমাকে আর পাঠাইবেন না। দোহাই আপনার ও আমার কেহ নয়।" বৈষ্ণবী ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যোগ করিল। রাজেন্দ্র বাবু উত্তেজিত ভাবে হস্তের যষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ওখানেই থাক। আর না —এই বালিকাকে ছুঁইবি, আর আমি এখনি তোকে পুলিসে দিব। সরিয়া যা দেখিস্ যেন আমাকে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে না হয়" বৈষ্ণবী সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল. কিন্তু ক্রুর দৃষ্টিতে তখনো মনোরমার দিকে দেখিতে লাগিল। রাজেন্দ্র বাবু নত হইয়া বালিকাকে উঠাইতে গেলেন কিন্তু দেখিলেন সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধ বচনেতে বৈষ্ণবীকে বলিলেন "যদি এই বালিকার কিছু হয় তোমার নিস্তার নাই।" নিকট দিয়া একখানি শূন্য গাড়ী যাইতেছিল হস্ত সঙ্কেতে চালককে আহ্বান করিয়া তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে বালিকাকে লইয়া শকটারোহণ করিলেন এবং বাটীর ঠিকানা তাহাকে বলিয়া মূর্চ্ছিত বালিকার মূর্চ্ছা দূর করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বালিকার নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত হইল। সে বিস্ফারিত নয়নে রাজেন্দ্র বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, এবং করুণ স্বরে বলিল "না না আমি বৈষ্ণবীর কাছে যাব না আপনার পায়ে পড়ি আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।" কোমল হৃদয় রাজেন্দ্র বাবু বালিকার হস্ত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন এবং নানা প্রবোধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, আর বলিলেন যে, "তুমি এখন হইতে আমারই গৃহে আমার পত্নীর নিকট কন্যার ন্যায় থাকিবে আর বৈষ্ণবীর প্রহার তিরস্কার সহিতে হইবে না। বালিকা বিস্মিত মুখে সব শুনিল। কি আনন্দ! আর ভিক্ষা করিতে হইবে না, বৈষ্ণবীর নিকটে গালাগালি আর খাইতে হইবে না, আর অনাহারে ক্লেশ পাইতে হইবে না। মনোরমা অনেক দিন পরে কত হাসিল। অনেক দিন সে বালিকাস্বভাবসুলভ আমোদের হাসি হাসে নাই। রাজেন্দ্র বাবু তাহার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিলেন। তাঁহার বাটীর সম্মুখে গাড়ি থামিল মনোরমা চাহিয়া দেখিল দিব্য দ্বিতল পরিষ্কৃত ধপ্‌ধপে বাড়ী খানি। দরজায় একটি ভৃত্য বসিয়া আছে। রাজেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোরমার কি আনন্দ! এই গৃহে সে বাস

করিবে। এমনি কত বাড়ীর সম্মুখে সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবুর দয়ায় এই বাড়ীতে সে থাকিবে। সে কৃতজ্ঞ এবং সলজ্জদৃষ্টিতে রাজেন্দ্র বাবুর মুখের দিকে চাহিল। তিনি সে দৃষ্টির নীরব কৃতজ্ঞতা বুঝিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "চল তোমায় বাড়ীর ভিতর লইয়া যাই। আজ হইতে এই তোমার গৃহ।" গাড়ি বিদায় করিয়া দিয়া বালিকার হস্ত ধরিয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

পুত্রের জন্য পিতার প্রাণত্যাগ।

চারিশত বৎসরেরও অধিক হইল বাবর নামক মগল বংশীয় ভূপতি ভারত বর্ষের সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল, প্রথম পুত্রের নাম হোমায়ুন। একদা হোমায়ুন সম্বোল নামক স্থানে ছিলেন তথায় তিনি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। রোগ স্থায়ী হইয়া উঠে, কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হয় না। বাবর তখন রাজধানী দিল্লিতে ছিলেন। পুত্রের এইরূপ সঙ্কট পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভাবিত হন, নৌকাযোগে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে আপনার নিকটে আনয়ন করেন। সুনিপুণ চিকিৎসকমণ্ডলী তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। নানা প্রকার সুচিকিৎসা ও সদুপায় বিধান হইল, কিন্তু রোগের কিছুই উপশান্তি হইল না। যখন রোগ ও তাহার উপসর্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল, কোনরূপ চিকিৎসায়ই তাহার বিরাম হইল না, তখন তিনি যমুনাতটে বসিয়া পুত্রের পীড়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমির আবুওয়ল বকা নামক তাঁহার একজন প্রিয় পারিষদ তখন নিবেদন করিলেন যে প্রাচীন সুবিজ্ঞ লোকের প্রমুখাৎ এরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে যে, যাহার প্রতীকারে পৃথিবীর চিকিৎসকগণ অক্ষম হইয়া পড়েন ঈদৃশী পীড়ার নিবৃত্তির উপায় এই হয় যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রিয় সামগ্রী উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে আরোগ্যের প্রার্থনা করা। এই কথা শুনিয়া সম্রাট্ বাবর বলিলেন হোমায়ুনের নিকটে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রিয় বস্তু আমিই, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য হোমায়ুনের নিকটে কিছুই নাই। আমি আপনাকে তাহার জন্য উৎসর্গ করিব, বিশ্বপতে ঈশ্বর গ্রহণ করুন। এই কথা শ্রবণে খাজা খলিকানামক একজন পারিষদ নিবেদন করিলেন, মহারাজ, ঈশ্বর কৃপা করিয়া কুমার হোমায়ুনকে অচিরে আরোগ্য দান করিবেন, রাজকুমার সম্রাটের আশ্রয়ে সুস্থ শরীরে জীবন যাপন করিবেন। এরূপ ভয়ঙ্কর কথা কেন উচ্চারিত হইতেছে। পূর্ব্বতন তুর্কী লোক-

দিগের নিকটে এ বিষয়ে যাহা শ্রবণ করা গিয়াছে তাহার মর্ম্ম জীবন দান নহে, কোন পার্থিব মূল্যবান্ বস্তু রোগীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাই অভিপ্রেত। অতএব উচিত যে ঈশ্বর কৃপায় যে এক খণ্ড অমূল্য হীরক পরাজিত সোল্‌তান এব্রাহিম হইতে হস্তগত হইয়াছে তাহা দীন ভিক্ষুকদিগকে দান করা কর্ত্তব্য। সম্রাট্ বলিলেন সংসারিক সামগ্রীর কি মূল্য যে প্রিয়তম হোমায়ুনের জীবনের বিনিময়ে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। আমি আপনাকেই তাহার জন্য উৎসর্গ করিতেছি। তাহার রোগ সুকঠিন হইয়াছে, তাহার অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে আমি অক্ষম। তিনি ইহা বলিয়া বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া ঈশ্বর সাধনায় ও বিশেষ প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তিনবার হোমায়ুনকে প্রদক্ষিণ করিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার প্রার্থনা গৃহীত হইল তিনি তাহা স্বীয় অন্তরে অনুভব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছি, এরূপ বলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার শরীরে উত্তাপের সঞ্চার হইল, এবং কুমার হোমায়ুনের রোগের হ্রাস হইতে লাগিল, অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ ক্ষণে ক্ষণে অধিকতর দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ইহলোক পরিত্যাগের লক্ষণ তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইল। তিনি সমস্ত অমাত্যবর্গকে নিকটে ডাকিয়া হোমায়ুনের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিলেন, এবং তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া সময়োচিত উপদেশ দিলেন। পরে স্বয়ং ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহা আশ্চর্য্য মৃত্যু, এবং আশ্চর্য্য আরোগ্য। এইরূপ মৃত্যু সঙ্ঘটন ও স্বাস্থ্য লাভের প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিজ্ঞান ও কৌশল থাকিবে। বিশ্বাসের প্রভাবেও হইতে পারে। যাহা হউক বাদশাহাদিগের মধ্যে বিরল নহে যে, রাজ্য লোভে পুত্র হত্যা বা পুত্রকে অশেষ যন্ত্রণা দান ও বন্দী করিয়াছেন এবং পুত্র পিতৃ হত্যাদিও করিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট্ বাবর পুত্র বাৎসল্যবশতঃ আনন্দে নিজের প্রাণ ও সাম্রাজ্য উৎসর্গ করিলেন।

সুলোচনা।

৭ম অধ্যায়।

একখানি কেদেরাতে কেশবচন্দ্র উপবিষ্ট, তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার অনুযায়িবর্গ ও অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট। রবিবার বৈকালে কমলকুটীরে অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত থাকেন। কেন না আফিসের চাকুরে যাঁহারা তাঁহাদের সেটি অবসরের দিন। এই সময়ে তথায় সৎপ্রসঙ্গের তরঙ্গ উঠিয়া যায়, তাহাতে অনেক স্বর্গীয় ধন লাভ হয়। সকলে

যথানিয়মে উপবিষ্ট থাকিয়া সৎপ্রসঙ্গাদি করিতেছেন এমত সময়ে নরহরি ও হরিহর দুই ভাই অগ্রপশ্চাৎ ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া সেই মণ্ডলী মধ্যে প্রণাম করিলেন। কেশব চন্দ্র লৌকিক ভাব ভাল বাসিতেন না। কোন অতি বড় সম্ভ্রান্ত লোক আসিলেও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য (যেমন সকলে করে) বাহ্যিক ভদ্রতাসূচক ব্যস্ততা দেখাইতেন না। কেবল গভীর ভাবে সমাগত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। তিনি সেইরূপ করিলে অপর এক জন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

নর। আমাদিগের বাটী এই কলিকাতা, কর্ণোওয়ালীস্ষ্ট্রীটে। আমার নাম নরহরি গুপ্ত। আর ইনি আমার কনিষ্ঠ সহোদর, ইহাঁর নাম হরিহর গুপ্ত।

পরিচয় শ্রবণ করিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন, "আপনারা কলিকাতার প্রসিদ্ধ পরিচিত পরিবারের লোক, ইহা আমি জানি, কিন্তু কখন আলাপ হয়নি।"

নর। সেটি আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কেন না দেশদেশান্তর হইতে কত শত শত লোক আসিয়া আপনার নিকট হইতে অমূল্য ধর্ম্ম রত্ন সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমরা এই নিকটে থাকিয়া আলস্যে ধর্ম্ম ধনে বঞ্চিত রহিয়াছি।

কেশ। অদ্য আগমনের কি কারণ আছে বলুন।

নর। হ্যাঁ বলিব বটে কিন্তু সে কিছু অধিক সময় শোনা আবশ্যক, এখন কি সময় হইবে?

কেশব। হ্যাঁ প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় আছে, ইহার ভিতরে অনেক কথা হইতে পারিবে।

নর। প্রথমতঃ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি এই বিষয়ে কিছু শুনিবার আমার অভিলাষ।

কেশ। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব তিনটি। এক ঈশ্বর, দ্বিতীয় আমি, তৃতীয় আমার বাহিরে বিদ্যমান এই সমুদয় জগৎ। ঈশ্বর স্রষ্টা আমি সৃষ্ট, ঈশ্বর পিতা মাতা আমি পুত্র, ঈশ্বর গুরু আমি শিষ্য, ঈশ্বর রাজা আমি প্রজা, ঈশ্বর আশ্রয় আমি আশ্রিত। এই প্রকার আমার সঙ্গে ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, জগতের অপর নরনারীর সঙ্গেও তাঁহার সেই সম্বন্ধ। সুতরাং আমার সঙ্গে অপর নরনারীর সঙ্গে ঈশ্বরবিষয়ে তুল্য সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে বেদ পুরাণ বাইবেল দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদয় নিহিত আছে।

নর। এই কথা গুলি অতিশয় গভীর, আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিলে ভাল হয়।

কেশ। মনে করুন, ঈশ্বর আমার প্রিয়, এই জন্য আমি ঈশ্বরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। আমি

এবং জগতের অপর নরনারী ঈশ্বরের প্রিয় এই জন্য তিনিও আমাদিগকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। আমি এবং অপর নরনারী যদি ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ হই, তবে প্রিয়তম ঈশ্বরের প্রিয় বলিয়া জগতের অপর নরনারী সকলেই আমার প্রিয় হইবেন। অর্থাৎ আমার প্রিয়তম ঈশ্বরের যাঁহারা প্রিয়, আমারও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইবে। এই প্রকার ঈশ্বর স্রষ্টা হইলে আমি এবং আর আর সকলে তাঁহার সৃষ্ট বলিয়া প্রিয়, ঈশ্বর যদি পিতা মাতা হইলেন, তখন আমার ন্যায় অপর নরনারীরা ও তাঁহার পুত্র কন্যা সুতরাং আমার সম্বন্ধে তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনী সুতরাং প্রিয়।

নর। আপনার এ কথার সঙ্গে নববিধানের সম্বন্ধ কি তাহাত বুঝিতে পারিলাম না।

কেশ। ইহার সঙ্গে নববিধানের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব জানিতে হইলে, ঈশ্বরের তিনটি ভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। সেই তিনটি ভাব একটি নামের ভিতরে আছে, যথা—সচ্চিদানন্দ। "সচ্চিদানন্দ" এই নামটির ভিতরে তিনটি কথা আছে; একটি সৎ, আর একটি চিৎ, আর একটি আনন্দ। সৎ ইহার অর্থ বিদ্যমান অর্থাৎ তিনি আছেন। আছেন কেবল মাত্র এই ভাব হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় না। কেন না যেমন তিনি আছেন তেমনি গাছ পাতর মৃত্তিকা পাহাড় প্রভৃতি আর ও কত বস্তু আছে, সে থাকা দ্বারা আমার লাভ কি? অতএব তাঁহার থাকা-সম্বন্ধে ভাব অর্থাৎ তিনি আছেন কি ভাবে, তাহা জানা চাই—সেই জন্য সৎ ইহার সঙ্গে চিৎ মিলিত করিয়া সচ্চিৎ হইয়াছে। "চিৎ" ইহার অর্থ জ্ঞান, জ্ঞান অর্থে আত্মা; তিনি সকল জগতের আত্মা বা আশ্রয় রূপে আছেন। এই কথা আর ও পরিস্ফুট হইতে পারে দূরের ঈশ্বরকে নিকটে বুঝিলে। তিনি বাহ্যজগতে আছেন এবং জ্ঞানময় আত্মারূপে আবার অন্তরেও আছেন। এই দুইটি ভাবেও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ভাব প্রকাশ পায় না। এই জন্য 'সচ্চিৎ' ইহার সঙ্গে আনন্দ মিলিত হইয়াছে। আনন্দ শব্দের অর্থ হর্ষ। হর্ষের স্থিতি লীলাতে। ঈশ্বরের বিদ্যমানতা মাত্র দ্বারা পরিত্রাণ হয় না, পরিত্রাণ হয় লীলাতে। তাঁহাকে বাহিরে সর্ব্বত্র এবং ভিতরে আত্মাতে আনন্দময়রূপে, লীলাময় কর্ত্তারূপে বিদ্যমান দেখিলে পরিত্রাণ হয়। কেন না কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হয় না। এই পরিত্রাণ কার্য্য যিনি করেন তিনি বিধাতা বা আনন্দ। এইরূপে লীলাময় কর্ত্তারূপে আপনার জীবনে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে নিজের আর কর্ত্তা হইবার অভিলাষ থাকেনা। কিন্তু তাঁহার কার্য্য হইবার অর্থাৎ তিনি যেরূপ করেন সেইরূপ হইবার অভিলাষ জন্মে। এই

ভাব মনে যত অধিক স্ফূর্ত্তি পায়, তত মানুষ পুরাতন পাপ মলিনতা পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করে, এই নবজীবন লাভ আর নববিধান একই কথা। এই প্রকারে পাপীকে পরিত্রাণ দেন বলিয়া ঈশ্বর অতীব প্রিয়। যিনি প্রিয়, প্রিয়কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রিয় হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব্ব কথার সঙ্গে এই সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বর জীবনের বিধাতা—কখন পিতৃরূপে, কখন গুরুরূপে কখন রাজা রূপে, কখন পতি, কখন সখা বা হৃদয় বন্ধুরূপে।

নর। তাঁহার লীলা দর্শনের সময় কখন?

কেশ। তাঁহার লীলা দর্শনের সময় পরিমিত হইলেই জীবনে পাপ দুঃখ প্রবেশ করিবার অবসর হয়। তাঁহার লীলার বিরাম নাই, ভক্তেরও দর্শনে অবসর নাই। জল স্থল শূন্য উপবেশন পান ভোজন ইত্যাদি সমুদয় ব্যাপারের ভিতরে তিনি কর্ত্তারূপে আছেন। ফুলের গাছে তিনি আছেন, শুধু এই কথা ভাবিলে চলিবে না; ফুলের গাছে থাকিয়া তিনি কাজ করিতেছেন, ইহা দেখিতে হইবে, কি কাজ করিতেছেন—মাটী হইতে রস তুলিতেছেন, পাতা গঠন করিতেছেন, ফুলের ভিতরে রঙ পরাইতেছেন। এই প্রকার অন্নে বস্ত্রে গৃহে সর্ব্বত্র।

এই জীবন্ত কথা গুলি শুনিয়া নরহরির প্রাণের ভিতরে আনন্দের উনুই খুলিয়া গেল। তাঁহার হৃদয় ভাবে পূর্ণ, চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ, সেই ভাবে পার্শ্ব ফিরিয়া হরিহরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন তাঁহারও সেই অবস্থা! তদ্দর্শনে তাঁহার আনন্দ আরও বাড়িল। গলবস্ত্র হইয়া করযোড়ে কেশবচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া বলিলেন "ইহাত কাহারও ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। যে ধর্ম্ম চায়, পরিত্রাণ চায় তাহাকে নববিধান চাহিতেই হইবে, আমি আর বিলম্ব করিব না। মহাশয়! কৃপা করিয়া আমাদিগকে দীক্ষিত করুন।"

কেশ। আগামী কল্য ৯টার পর স্নান করিয়া এই গৃহে আগমন করিবেন, পরিবারদিগকেও এ সকল কথা বলিবেন। যদি সপরিবারে স্বর্গের পথের যাত্রী হইতে পারেন তবে আরও ভাল। পতি পত্নী এক মত না হইলে জীবনের অর্দ্ধাংশ পতিত থাকে। এই সকল কথা হইতে হইতে সায়ং সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখন সকলে মিলিয়া ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরের উপাসনা উপদেশ শুনিয়া দুই ভাই আরও সুখী হইলেন। পরদিন নরহরি ও হরিহর সপরিবারে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহাদের এই প্রকার পরিবর্ত্তনে কলিকাতা সহরে হিন্দু ও ব্রাহ্ম বিদ্বেষীদিগের ভিতরে ভারি মনঃক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইল।

৮ম অধ্যায়।

ঈশ্বরের অভিপ্রায় অতি দুর্জ্ঞেয়।

মানুষ যে পথ দিয়া সুখী হইতে চায়, তিনি সে পথ দিয়া তাহাদিগকে যাইতে দেন না। মানুষের ইচ্ছা নিরাপদে থাকিয়া সুখী হয়, তিনি তাহাদিগকে দুঃখ বিপদের ভিতর দিয়া সুখের রাজ্যে লইয়া যান। মানুষ সুখী হইতে চায়, তিনিও মানুষকে সুখী করিতেই চাহেন। অভিপ্রায় এক কিন্তু প্রণালী বা পথ ভিন্ন ভিন্ন। কেহ ঈশ্বরের লোক বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেই তিনি তাহাকে নানা পরীক্ষাতে ফেলিয়া দগ্ধ করেন। হরিহর একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া ভজন সাধন করিতেছেন, দুই ভ্রাতার যেমন সদ্ভাব, তাঁহাদের পত্নীরাও তেমনি মিষ্ট স্বভাব লাভ করিয়াছেন। ছেলে মেয়েরা সকলে স্কুল কলেজে পড়িতেছে। নিজেরা প্রাতঃকালে উঠিয়া আত্মচিন্তা—নামগান, পাঠ, উপাসনা, ধ্যান, মনন, সংকীর্ত্তন ও সঙ্গীতাদি করিয়া দিন কাটান। উপাসনা সঙ্গীতাদি ক্রমেই অতিমিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা আপনাদিগকে অতিসুখী, ভাগ্যবান গৃহস্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে অপর ভদ্র পরিবারের সুখ দুঃখের তুলনা করিতেন তখন তাঁহাদের মনে আনন্দ আর ধরিত না এবং সকৃতজ্ঞচিত্ত ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেন। এইরূপে সুখে দুই ভাই দিনযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক দিন হরিহর বাবু বাহিরে বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, সহসা একজন অপরিচিত লোক সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিল। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে পুলিষের ইনস্‌পেক্টার পাঁচ ছয়জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রবেশ করিবামাত্র পূর্ব্বাগত ব্যক্তি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এই ইনি হরিহর গুপ্ত, ইহাঁরই নামে খুদিরাম চাটুর্য্যে অভিযোগ করিয়াছেন।"

তখন পুলিস ইনস্‌পেক্টার তাঁহার হস্তধারণ করিল এবং বলিল, "ফৌজদারি কোর্টে আপনাকে যাইতে হইবে, উঠুন।"

হরিহর মনোবুদ্ধির অগোচর, অচিন্তিত ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া অবাক হইলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্য সরে না। অল্পক্ষণ পরেই ঈশ্বর সকল বলের আধার ইহা মনে পড়িল, আর অমনি তাঁহার মুখকান্তি ফিরিল। তখন তিনি অতি শান্ত ভাবে ইনস্‌পেক্টারকে বলিলেন, "ভাল যেতে হয় পুলিসে যাইব, তাহার জন্য চিন্তা কি, আপনি উপবেশন করুন, শোনা যাক্ ব্যাপারটা কি?"

পুলি। আমিত আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে আসি নাই।

হরি। আপনার মত লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করা, আমিও সম্মানজনক

মনে করি না কিন্তু কেন আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন তাহার কারণ দর্শাইতে আপনি বাধ্য। কেবল আপনার বাক্য মাত্র শুনিয়া কোন কাজ করিতে আমি বাধ্য নাও হইতে পারি।

এই সকল কথা শুনিয়া পুলিস ইনস্‌পেক্টার, কিছু দমে গেলেন, মনে করিলেন, ইনি ভয়ে ভীত হইবার লোক নহেন। তখন হরিহরের হস্তত্যাগ করিয়া উপবেশন করিলেন। ইতিমধ্যে গোলমাল শুনিয়া নরহরিও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নরহরি পুলিস ইনস্‌পেক্টার বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, বলুন দেখি ব্যাপারটা কি?"

পুলি। ব্যাপারটা বড় সোজা নহে। খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে একজন লোক সীমলাতে অবস্থিতি করেন, তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্রী দুইটিকে হরিহর বাবু চুরি করিয়া আনিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি ফৌজদারিতে অভিযোগ করিয়াছেন, তাই আমার প্রতি এই পরওয়ানা দ্বারা হরিহর বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ হইয়াছে—এই দেখুন পরওয়ানা।

নরহরি বাবু কিছু সুচতুর, তিনি কলিকাতায় সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন বলিয়া, অচ্চোরদিগের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভাল, সেজন্য ভাবনা কি? "চলুন আমিও সঙ্গে যাইতেছি।"

এই বলিয়া নরহরি "হরি হরি" বলিয়া গত্রোত্থান করিলেন, ইনস্পেক্টার বাবু ভয়ে ফেলে কিছু আদায় করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা আর ঘটেনা দেখিয়া কিছু মলিন হইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, বসুন একটু বিশ্রাম করা যাক, অনেকটা দূর হেঁটেছি; আর বিশেষ আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের প্রতিত আর সাধারণ লোকদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারি না।" এই সকল কথাবার্ত্তা চলিতেছে ইতি মধ্যে আর একজন অপরিচিত ভদ্র লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। নরহরি তাহার মুখের পানে তাকাইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এও একজন শয়তানের চেলা। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, কি চান?"

আগন্তুক বলিল, "আমার নাম গোবর্দ্ধনধারী ঘোষাল, বাড়ী এই কলিকাতাতেই, আপনার বিপদের সংবাদ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে এসেছি।"

নর। আপনাকে ত আমি চিনি না, আপনার নামও যে কখন শুনিয়াছি মনে পড়ে না, সুতরাং আপনি আমার প্রতিবেশী (ভদ্র লোক) নহেন, ইহা নিশ্চিত। তত্রচ আমার বিপদের প্রকৃত সংবাদ আমি এখনও পাইনি, আর আপনি জানিলেন কিরূপে?

নরহরি বাবুর প্রশ্নে, ঘোষাল বাবুর মুখ শুষ্ক ও মলিন হইল, তখন সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞা

হ্যাঁ, তা বটে, তবে কি জানেন স্বভাবটা কেমন হয়েছে, কাহার বিপদ শুনিলে আর চুপ করে থাকিতে পারি না।”

নর। হ্যাঁ, আপনি, দয়ালু বটেন তা দেখেই টের পেয়েছি। আমার বিপদ আমি জনিবার পূর্ব্বে আপনি জানেন, একি সামান্য কথা? যা হউক আমার কোনই বিপদ ঘটে নাই আপনাকে কোন সাহায্যও করিতে হইবে না, আপনি এইক্ষণে যথাস্থানে প্রস্থান করুন।

গোব। তা যাব বৈ আর কি? একটু তামাক্ খেতে পেলাম না?

নর। আমরা তামাক খাই না।

গোব। কখন তামাক্ খেতেন?

নর। হ্যাঁ আগে খেয়েছি খুব।

গোব। এখন?

নর। এখন এই নববিধানের নূতন নিয়মে পুরাতন পাপ পরিত্যাগ করিয়াছি।

গোব। আপনি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন আমরাত আর পরিত্যাগ করি নাই?

নর। যাহা পাপ বলিয়া জানি, তাহ আমিও করি না অন্যকেও করিতে দিই না। আপনার অভিপ্রায় ভাল বোধ হইতেছে না, আপনি এখন প্রস্থান করুন।

গোব। আপনি যদিও আমার প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিতেছেন তত্রাচ আমি আপনার হিত বলিতে ছাড়িব না, বলি আপনি নূতন ধর্ম্মটা পরিত্যাগ করুন, পুরাতন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলেমিশে থাকিলে সুখী হইতে পারিবেন।

নর। ধর্ম্ম জীবনের ধন, তাহা কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে?

গোব। ধর্ম্ম যদি অত্যজ্য তবে আপনি পুরাতন ধর্ম্ম ছাড়িলেন কি রূপে?

নর। পুরাতন যাহা ছাড়িয়াছি তাহা যদি ধর্ম্ম হইত কখন ছাড়িতে পারিতাম না।

এই সকল কথাতে অনেক সময় অতীত হইল, পুলিস ইনস্‌পেক্টার বাবু দেখিলেন যে এ বড় শক্ত লোক, এখানে কিছু হইবার আশা নাই, তখন তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, “মহাশয়! আমার সময় ক্ষতি হইতেছে অনুগ্রহ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে ভাল হয়।”

এই শুনিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন, হরিহর পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অপরাধীর বেশে চলিলেন, নরহরি গৃহে পত্নীকে খুব সাবধান করিয়াও সাহস দিয়া, পাহারা ইত্যাদির খুব ভাল শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন।

আত্মচিন্তা।

মনে মনে ভাবি তাই,
কেমনে বা সুখ পাই,
শান্তিধামে যাব কি করিয়া;

সংসার মায়ার ঘোরে
ঘুরাতেছে সদা মোরে,
মিছে দিন যায় রে বহিয়া।

(২)

যোগাতে লোকের মন,
ধরি নাই এ জীবন,
হরিপদে যেন মতি রয়;
তা হইলে নাহি ভয়,
সদা ভাবি দয়াময়,
রিপুগণে করি পরাজয়।

(৩)

নাহি ভক্তি পুণ্যবল,
জীবন-পথ-সম্বল,
কি হইবে আমার উপায়;
যাহার আছে বিশ্বাস,
কাটিয়া মায়ার পাশ,
অনায়াসে স্বর্গে চলে যায়।

(৪)

সাধু সুখী চির দিন,
নহে সে ত মায়াধীন,
তারে সুখী সর্ব্ব লোকে বলে;
মায়াতে জড়িত কায়া,
সুখী হয় ধরি ছায়া,
কিন্তু তার দুঃখে প্রাণ জ্বলে।

(৫)

বুঝিয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম,
করে যেই সাধুকর্ম্ম,
চির সুখে থাকে তার মন;
এ সংসার প্রেতভূমি,
কেন তাহে ভ্রম তুমি,
সাধুসঙ্গ ধররে এখন।

(৬)

ভুলাতে অনেকে আছে,
ফিরে শত্রু পাছে পাছে,
করিবারে তোমারে বন্ধন;
সতত জাগিয়া থাক,
হরি হরি বলে ডাক,
তিনি ভয় বিপদভঞ্জন।

(৭)

ভুলিয়া আমিত্বজ্ঞান,
কর হরিরস পান,
পাবে শান্তি হৃদয় ভিতরে;
অবিশ্বাস পরিহরি,
পুণ্যবলে ভর করি,
থাক নিত্য নির্ভয় অন্তরে।

(৮)

জ্ঞান-অসি করে ধরি,
ভক্তিবস্ত্র অঙ্গে পরি,
শান্তিধামে যাও সত্য পথে;
সুখ শান্তি যত আছে,
পাবে সব মার কাছে,
শান্তিপ্রশ্রবণ তাঁর পদে।

(৯)

অসার ভবের মেলা,
গেল দিন গেল বেলা,
ওরে মন হরিপদাশ্রয়;
তিনি অগতির গতি,
দীনবন্ধু প্রাণপতি,
দয়াময় জীবন উপায়।

মত অপেক্ষা কাজ বড়।

মতে উচ্চ অনেকে হইতে পারেন, কিন্তু কাজ যাঁর সৎ তিনিই যথার্থ শ্রেষ্ঠ। কেবল ভাল ভাল মত প্রচার করিলে হয় না, কিন্তু ভাল ভাল কাজ করিতে হয়, নতুবা উচ্চ মত প্রকাশ করা বৃথা। কেবল মত দেখিয়া যদি আমরা সদসৎ লোক বিচার করি, তাহা হইলে এ সংসারে সকলেই ভাল। যিনি উচ্চ মত প্রচার করিলেন, দেখিতে হইবে তাঁহার জীবন আচার ব্যবহার কার্য্য কি প্রকার। যদি তাঁহার শ্রেষ্ঠ মতের অনুযায়ী ঐ সকল হয়, তবেই জানিব তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। নতুবা কেবল মত দেখিয়া লোকের বিচার করা ঠিক নয়। অনেকে এরূপ আছেন, খুব ভাল এবং উচ্চ উচ্চ মত প্রকাশ করেন, কিন্তু সেই সকল মত তাঁহার কার্য্য আচার ব্যবহারে এবং জীবনে প্রকাশ পায় না। আবার অনেকে এরূপও আছেন যাঁহাদের মত শুনিলে তাঁহাদের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে, কিন্তু হয় ত তাঁহাদের হৃদয় এবং কার্য্য সেই সকল মত অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। কেবল মতেই যদি মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইত, তবে মানুষ চেনা অত্যন্ত সহজ হইত। মতেই যদি মনুষ্যের প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ পাইত এবং কেবল উচ্চ মত দ্বারা যদি ভাল মন্দ বিচার করা যাইত, তাহা হইলে ভাল হওয়া অত্যন্ত সহজ হইত। আমরা মত দেখিয়া অনেক সময় মুগ্ধ হই, এবং মত দেখিয়া অনেক সময় ঘৃণা করি। কিন্তু জীবন ও কার্য্য মতের সহিত মিলাইয়া না দেখিলে অনেক সময় আমাদের প্রতারিত হইতে হয়। এমন কত সময় ঘটিয়াছে মত শুনিয়া যাহাকে আমরা অবজ্ঞা এবং নিন্দা করিয়াছি, সে ব্যক্তিই হয় ত শ্রদ্ধার পাত্র। আবার মত শুনিয়া যাহাকে শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞান করি, সে ব্যক্তি হয় ত শ্রদ্ধার অনুপযুক্ত। ভাল মত যদি কেবল আদৃত হয়, এবং যাহার মত উচ্চ সেই যদি মহৎ চরিত্র হয়, তবে এ সংসার স্বর্গ এবং সকলেই দেবতুল্য হইত। শুষ্ক মত কিছু নয়, কার্য্য এবং জীবনই প্রধান। মুখের কথা শুনিয়া কাহাকেও বিশ্বাস দেওয়া ঠিক নহে, তাহার জীবনের কার্য্য ভাব এবং ব্যবহারে মতের সহিত ঐক্য আছে কি না দেখা উচিত। অনেকে এরূপ আছে, ঠিক মতের বিপরীত কার্য্য সকল করে। কেবল মতকে আমরা বড় করিব না, কিন্তু জীবন এবং কার্য্য দেখিব। যাঁহার মতের সহিত জীবনের কার্য্য সকল মিলিবে তিনিই যথার্থ শ্রদ্ধার পাত্র, এবং উচ্চ আসন পাইবার উপযুক্ত। বৃথা মতের আড়ম্বর দেখাইলে কি হইবে, হৃদয় যখন ভাবশূন্য এবং জীবন যখন সেই সকল মতের অনুযায়ী কার্য্যশূন্য। উচ্চ মতও চাই, তাহার সহিত সৎ অনুষ্ঠানও চাই। যাহার মত উচ্চ এবং মতের সহিত

কার্য্যের সামঞ্জস্য আছে তাহার জীবনই প্রকৃত মহৎ জীবন।

কাব্যকাহিনী।

ইসাবেলা।

ওদিকে ক্লাডিওর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার পর এক বন্ধু ধর্ম্মাশ্রমবাসিনী ইসাবেলার নিকট এই সংবাদ লইয়া গেল এবং ভ্রাতার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ইসাবেলাকে লর্ড এঞ্জিলোর নিকট অনুনয় বিনয় করিতে অনুরোধ করিল। ইসাবেলা ভ্রাতার বিপদাশঙ্কা শ্রবণে ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ক্লাডিওর বন্ধুর পরামর্শ মতে লর্ড এঞ্জিলোর নিকট ত্বরায় উপস্থিত হইলেন, এবং সাধ্যানুসারে ভ্রাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আগমন করিলেন। কারাধ্যক্ষের সহিত লর্ড এঞ্জিলো ক্লাডিওর মৃত্যুদণ্ডসম্পর্কীয় কথা বলিতেছেন, এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল যে, "দোষী যুবার ভগিনী আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে।"

এঞ্জিলো। "তাহার কি ভগিনী আছে।"

কারাধ্যক্ষ। "হ্যাঁ প্রভু, ক্লাডিওর একটি অতি ধর্ম্মশীলা ভগ্নী আছেন। তিনি অতি শীঘ্রই চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিবেন।"

এঞ্জিলো। (ভৃত্যের প্রতি) "আচ্ছা, তাহাকে আসিতে বল।" ক্লাডিওর বন্ধু লুসিও এবং ইসাবেলা প্রবেশ করিলে কারাধ্যক্ষ প্রস্থানোদ্যত হইল, এঞ্জিলো তাহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং ইসাবেলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "তোমার কি ইচ্ছা এবং বলিবার কি আছে বল।"

ইসাবেলা। প্রভু আমি আপনার নিকট একটি অতি ক্লেশজনক আবেদন লইয়া আসিয়াছি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কর্ণপাত করুন।

এঞ্জিলো। ভাল তোমার কি আবেদন আছে?

ইসা। একটি দুষ্কর্ম্ম আছে তাহা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, সে পাপের যে উচিত শাস্তি হয় তাহাও আমার ইচ্ছা, সে পাপের পক্ষ হইয়া কথা বলিতে আমি বাঞ্ছা করি না, অথচ বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে আসিয়াছি। আমি জানি এরূপ করিয়া আমি উচিত কার্য্য করিতেছি না কিন্তু ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা দুইয়ের মধ্যে আমাকে পড়িতে হইয়াছে আমি কি করিব।

এ। খুলিয়া বল, তোমার কথার অর্থ কি?

ইসা। আমার একটি ভ্রাতা আছে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। আমি আপনার নিকট মিনতি করিতেছি তাহাকে ক্ষমা করুন। তাহার দোষের শাস্তি দিন কিন্তু তাহাকে প্রাণ দান করুন।

কারাধ্যক্ষ (স্বগত) স্বর্গ তোমাকে মন ফিরাইবার ক্ষমতা দিন।

এ। এ কিরূপ কথা, দোষকে দণ্ড-দিব অথচ দোষীকে অব্যাহতি দিব? সে কি প্রকারে সম্ভব হয়? দোষীকে বিনা দণ্ডে মুক্তি দেওয়া যদি হয় তবে আর দোষের ন্যায্য দণ্ড কিরূপে হইবে। তবেত আমার বিচার করা নামমাত্র হইবে।

ইসা। কি কঠিন ন্যায় বিচার! স্বর্গ আপনার মঙ্গল করুন, আমার ভ্রাতার আর রক্ষা নাই। (প্রস্থানোদ্যত) যুনিও ইসাবেলাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "এত শীঘ্র ছাড়িও না আবার মিনতি কর লর্ড এঞ্জিলোর সম্মুখে জানুপাতিয়া ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হও। তুমি যে অত্যন্ত, শুষ্ক ও শীতল ভাবে ভ্রাতার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছ একটা সামান্য পিন চাহিবার সময়ও লোকে ইহাঅপেক্ষা আগ্রহের সহিত চায়।

ইসাবেলা পুনরায় এঞ্জিলোর নিকট গিয়া বলিলেন "আমার ভ্রাতা কি নিশ্চয়ই মরিবেন।"

এ। কুমারী, সত্যই সে মরিবে, তাহার কোন প্রতিকার নাই।

ইসা। আমার বোধ হয় যদি আপনি আমার ভ্রাতাকে দয়া করেন মনুষ্য কিংবা দেবতারা কেহই রুষ্ট হইবেন না।

এ। আমি দয়া করিব না।

ইসা। কিন্তু যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে কি আপনি পারেন না?

এ। দেখ, আমি যাহা করিতে ইচ্ছা করি না তাহা করিতে পারিব না।

ইসা। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনি ক্ষমা করেন তাহাতে কি অন্যের কোন অনিষ্ট হয়? যদি আমার তুল্য আপনার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় আপনি কি দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন না?

এ। তোমার ভ্রাতার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাহা ফিরাইতে পারি-না। বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে।

লু। ইসাবেলা, এখনো তুমি শীতল ভাবে কথা বলিতেছ।

ইসা। বিলম্ব? না এমন কথা বলিবেন না। কথা পর্য্যন্ত বলিয়া ফিরাইয়া লওয়া যায়। বিশ্বাস করুন, মহৎ লোকদের চরিত্রে দয়া যেমন শোভা পায় এমন আর কিছুই নয়। আপনি যদি আমার ভ্রাতার অবস্থায় পড়িতেন তবে আপনিও হয় ত তাহার তুল্য দোষ করিতেন। আমার ভ্রাতা যদি আপনার বিচারক হইত নিশ্চয়ই এত কঠোর হইত না।

এ। আমি মিনতি করিতেছি তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।

ই। ঈশ্বর যদি আপনার তুল্য ক্ষমতা আমাকে দিতেন আর আপনাকে আমার অবস্থার অধিন করিতেন, তবে আমি

দেখাইতাম বিচারক হওয়া কি, আর বন্দী হওয়া কি।

এ। তোমার ভ্রাতার আইন অনুসারে দণ্ড হইতেছে। তুমি বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ।

ইসা। হায় হায়! আপনি কি ভুলিয়াছেন যে সকল মানব আত্মাই দণ্ডনীয় দোষী। যদি বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর আপনার তুল্য কঠোর ভাবে বিচার করেন, তবে ভাবিয়া দেখুন, আপনার দশা কি হইবে। চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনি দয়া না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এ। নিরস্ত হও, আমি তোমার ভ্রাতাকে দণ্ড দিতেছি না আইন তাহার শাস্তি বিধান করিতেছে। যদি সে আমার আত্মীয় ভ্রাতা বা পুত্র হইত, তথাপি আমি তাহাকে ক্ষমা করিতাম না। কল্য নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে।

ইসা। কল্যই? এত শীঘ্র? রক্ষা করুন্ রক্ষা করুন্। আমার ভ্রাতা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নহে। আমরা পালিত পশুগণকেও অসময়ে বধ করি না দোহাই আপনার। ক্ষান্ত হউন। বিশ্বাস করিয়া দেখুন। বলুন এ পাপের জন্য কাহার প্রাণ দণ্ড হইয়াছে? অনেকেই এই অপরাধে অপরাধী।

লুসিও। (জনান্তিকে) উত্তম বলিয়াছে।

এঞ্জিলো। আইন যদিও এত কাল নিদ্রিত ছিল তাহার মৃত্যু হয় নাই। যে ব্যক্তি প্রথম এই পাপে লিপ্ত হইয়াছিল সে যদি সমুচিত শাস্তি পাইত তাহা হইলে আর কাহারও এরূপ পাপ করিবার সাহস হইত না। এখন আইন আবার জাগ্রত হইয়াছে, যাহার যাহা অপরাধ তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে।

ইসাবেলা। দয়া করুন্ দয়া করুন্।

এ। ন্যায়ই যথার্থ দয়া। এই অপরাধের জন্য তোমার ভ্রাতার এখন মৃত্যু হইলে আর দুষ্কর্ম্ম তিনি করিতে পারিবেন না। নিরস্ত হও কল্যই তোমার ভ্রাতার শেষ দিন।

ইসাবেলা। তবে আপনিই প্রথম এই আইন অনুসারে কার্য্য করিতেছেন, আর আমার ভ্রাতাই সর্ব্ব প্রথমে এই পাপের জন্য দণ্ডার্হ হইলেন। রাক্ষসের ন্যায় বিক্রম থাকা অতি উত্তম! কিন্তু সে বিক্রম অপরের উপর প্রকাশ করা অতি নিষ্ঠুরের কার্য্য।

লুসিও (জনান্তিকে) উত্তম বলা হইয়াছে।

ইসাবেলা। (ইঞ্জিলোর প্রতি) যদি এ পৃথিবীর বিক্রমশালী লোকদের দেবতার ন্যায় ক্ষমতা থাকিত, ভয়ানক বজ্রধ্বনি করিতেন। যদি তাঁহারা সক্ষম হইতেন তবে প্রত্যেক সামান্য ক্ষমতাশালী লোকেরাও বজ্রধ্বনিতে অপরকে শাসন করিত। দাম্ভিক মানব, যে জ্ঞানের দর্প করিয়াও অতি অজ্ঞান, সে সামান্য ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতা হস্তে পাইলেও বালকের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ করিয়া তাহা অপ-

রের নিকটে প্রকাশ করিতে যায়, দেবতারা তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করেন। যদি তাঁহারা আমাদের সদৃশ হইতেন নিশ্চয়ই মানুষের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া হাস্য করিতেন।

কারাধ্যক্ষ। (স্বগত) ঈশ্বর করুন, বালিকা যেন ইহাঁর মন ফিরাইতে পারেন।

ইসাবেলা। (পুনরায়) আমার ভ্রাতার সহিত আপনার নিশ্চয়ই তুলনা হয় না, কারণ বড় লোকেরা দেবতাকে ও উপহাস করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহা কিছুই দোষের নহে কিন্তু একজন সামান্য লোকের তদ্রূপ করিলে লোকে তাহাকে ভয়ানক পাপিষ্ঠ বলিবে।

এঞ্জিলো। কেন তুমি এরূপ কথা আমাকে বলিতেছ?

ইসা। ক্ষমতাপন্ন লোকেরা সামান্য লোকের ন্যায় দোষ করিলেও তাহা দোষের বলিয়া বোধ হয় না। নিজের হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করুন। অন্বেষণ করিয়া দেখুন আমার ভ্রাতার কৃত অপরাধের তুল্য কোন অপরাধ আপনার হৃদয়ে আছে কিনা। যদি সেরূপ কোন ভাব আপনার মনের মধ্যে থাকে, তবে সাবধান, আমার ভ্রাতার জীবননাশের বিষয়ে কোন কথা জিহ্বাগ্রে আনিবেন না।

এ। (স্বগত) অতি বুদ্ধিমতীর ন্যায় বালিকা কথা বলিতেছে (প্রকাশে) এখন তুমি বিদায় হও।

ইসা। প্রভু অনুগ্রহ করিয়া ফিরুন।

এ। আমি এ বিষয় চিন্তা করিব। কাল. তুমি আবার আসিও।

ইসাবেলা। শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে পুরস্কার দিব—

এ। পুরস্কার? সে কি?

ই। অকিঞ্চিৎকর স্বর্ণ রৌপ্য বা প্রস্তর নির্ম্মিত পদার্থ আপনাকে পুরস্কার দিব না, কিন্তু পবিত্রহৃদয় ধর্ম্মনিষ্ঠ কুমারীগণ যাঁহারা পার্থিব কোন বিষয়ে আসক্ত নহেন, তাঁহার আপনার কুশলের জন্য ঈশ্বরের নিকট পবিত্র প্রার্থনা করিবেন।

এ। ভাল—কাল আসিও।

ই। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন (প্রস্থানোদ্যত)

এ। (স্বগত) তাহাই হউক—আমার হৃদয় যে চঞ্চল হইল এবং প্রলোভনের পথে পড়িতে চলিল!

ই। কল্য কোন সময়ে আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইব?

এ। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে যে সময়ে হউক।

ইসাবেলা লুসিও এবং কারাধ্যক্ষ তখন প্রস্থান করিলেন। তখন এঞ্জিলোর মনমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইসাবেলার রূপ গুণ পবিত্রতা বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া দৃঢ়হৃদয় অবিচলিত এঞ্জিলো মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহার শাসিতচিত্তে কুভাব কুঅভিসন্ধি উদ্দীপ্ত হইল। ইসাবেলার

পবিত্রতা গুণ ও রূপই এঞ্জিলোর পক্ষে প্রলোভনের বিষয় হইল। তিনি আপন মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন;—একি? একি? তোমার এত সদ্‌গুণ রাশিই কি আমার পতনের কারণ হইল? ইহা কি আমার দোষ না ইসাবেলার দোষ? অধিক অপরাধী কে? যে প্রলুব্ধ হয়, কিংবা যে প্রলোভন দেখায়? না না—তরুণীও আমাকে প্রলোভন দেখায় নাই, ইহা সম্পূর্ণ আমারই নিজের দোষ। কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা কি নিলজ্জতা অপেক্ষা পুরুষের চিত্ত অধিক মুগ্ধ করিতে পারে? পুরুষেরা কি অবশেষে ধর্ম্মাশ্রমের পবিত্রতাকে কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইবে? কি ঘৃণা! কি লজ্জার কথা! এঞ্জিলো তোমার কি দশা হইল? তুমি কি করিতেছ? তুমি কি বালিকার সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে চলিলে? তবে তাহার ভ্রাতা জীবিত থাকুক। যখন বিচারক নিজে অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন তস্করেরা চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে কেন? সত্যই কি আমি এই নারীকে ভাল বাসি? তাহাকে দেখিবার জন্য আমার মন এত ব্যাকুল কেন? ধূর্ত্ত শয়তান তুই ধন্য, কারণ তুই সাধুকে পতিত করিবার জন্য সাধু দ্বারা প্রলোভন দেখাইতেছিস্। সেই প্রলোভনই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক যাহাদ্বারা আমরা সদ্‌গুণে মোহিত হইয়া পাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। মন্দচরিত্র স্ত্রী লোকেরা কখনও আমাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই কিন্তু এই পবিত্রচরিত্রা তরুণী আমাকে একেবারে পরাজয় করিয়াছে। যৌবনকাল হইতে আমি লোকের প্রেমের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতাম এবং হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি।" এইরূপে লর্ড এঞ্জিলো ইসাবেলার রূপগুণে মোহিত হইয়া আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত কিছুতেই দমন হইল না। পর দিবস নির্দ্ধারিত সময়ে ইসাবেলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে এঞ্জিলো একাকী চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি এই ভাবিতেছিলেন "আমি প্রার্থনা ও চিন্তা করিতে গিয়া নানা বস্তুর নিকট প্রার্থনা ও চিন্তা করি। স্বর্গে আমার শূন্যগর্ভ কথাগুলি যায়, কিন্তু মন ইসাবেলার দিকে রহিয়াছে, মুখে প্রার্থনা কিন্তু হৃদয় মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তি। * * * ইন্দ্রিয়, কার সাধ্য তোমাকে পরাজয় করে।"

* * * *

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "ইসাবেলা নামে একটি আশ্রমকন্যা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করে। এঞ্জিলো তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন, এবং ইসাবেলা উপস্থিত হইলে নানা বাগাড়ম্বরের পর আপনার মনের ভাব তাঁহার নিকট

প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন ইসাবেলা সম্মত হইলে তাঁহার ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা হইবে। ইসাবেলা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে ধর্ম্মপরায়ণ এঞ্জিলোর আবার এরূপ পতন হইবে, কিন্তু যখন বুঝিলেন সত্যই তাঁহার অভিপ্রায় ভাল নয়, অমনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সদর্পে বলিলেন "এঞ্জিলো, সাবধান, আমি তোমার দোষের কথা ঘোষণা করিয়া দিব। এখনি আমার ভ্রাতার প্রাণরক্ষার আজ্ঞা দাও, নতুবা মুক্তকণ্ঠে আমি সমস্ত পৃথিবীর নিকটে বলিব তুমি কিরূপ চরিত্রের লোক।" এঞ্জিলো বলিলেন, "তোমার কথা কে বিশ্বাস করিবে? আমার সুনাম, এবং খাঁটি জীবন সকলের নিকট পরিচিত। কেহই তোমাকে প্রত্যয় করিবে না, বরং ন্যায়ানুসারে তোমার ভ্রাতার প্রাণদণ্ড করিতেছি বলিয়া লোকে মনে করিবে আমার উপর আক্রোশ করিয়া তুমি আমার বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলিতেছ। যদি তুমি আমার কথায় সম্মত না হও তোমার ভ্রাতার যে কেবল প্রাণ বধ করিব এমন নহে কিন্তু ভয়ানক যন্ত্রণা দ্বারা তাহার জীবন শেষ করিব। অতএব এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ, কাল আমি উত্তর চাই। আর তোমার যাহা বলিতে ইচ্ছা তাহা বল। তোমার সত্য কথা অপেক্ষা আমার মিথ্যা কথা অধিক বিশ্বাস যোগ্য হইবে।" এই বলিয়া এঞ্জিলো প্রস্থান করিলেন। ইসাবেলা তখন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমি কাহার নিকট অভিযোগ করিব? এ কথা বলিলে কেইবা বিশ্বাস করিবে? * * * আমি আমার ভ্রাতার নিকট যাই। যদিও সে প্রলোভনে পড়িয়া একটি অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তথাপি তাহার ভগিনীর সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া অপেক্ষা সে শত বার মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিবে। তবে ইসাবেলা, তুমি সতীত্ব লইয়া জীবিত থাক, ভ্রাতার মৃত্যু হউক। ভ্রাতার জীবন অপেক্ষা সতীত্ব আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ। আমি এখন ক্লডিওর নিকট গিয়া এঞ্জিলোর কুঅভিপ্রায়ের কথা তাহাকে জ্ঞাত করি এবং মৃত্যুর জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে বলি।"

এঞ্জিলো এবং ইসাবেলার কথোপকথন কালে ইসাবেলা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কয়েকটি কথা এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

"আমি শত শত বেত্রাঘাত বহু মূল্য অলঙ্কার তুল্য আদরে অঙ্গে বহন করিব এবং আরামশয্যাতুল্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব তথাপি সতীত্বে কলঙ্ক হইতে দিব না।"

আর এক স্থলে "স্ত্রীলোকের মন অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহাদের সুন্দর মুখ যে সকল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় সেই সকল দর্পণের মত তাহাদের চিত্ত ভঙ্গপ্রবণ।" ক্রমশঃ

নারী চরিত্রের লক্ষণ।

(ইংরাজি হইতে)

স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়ে চরম সীমায় থাকেন; হয় তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হয়েন, নতুবা পুরুষ অপেক্ষা অনেক হীন হইয়া থাকেন।

নারীচরিত্রকুসুম কেবল ছায়াতে সৌরভ বিকীর্ণ করে।

যখন স্ত্রীলোকেরা প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হয়েন না, তখন তাঁহারা বালস্বভাব সুলভ রোদন করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন।

কোন স্ত্রীলোক প্রথমেই যেরূপ পরামর্শ দিবেন তাহা গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় পরামর্শ লওয়া উচিত নহে।

স্ত্রীলোকেরা আপনাদের হৃদয়ের ভাবের আধিক্যের জন্যই প্রতারিত হন।

গৃহিণী এবং তাঁহার দাসী যখন ঐক্যমত হইয়া কার্য্য করেন, তখন তাঁহারা বুদ্ধিতে শয়তানকেও পরাস্ত করিতে পারেন।

নারীগণ ক্রোধ হইলে যেমন ক্রন্দন করেন এমন আর কোন সময়ে নহে।

স্ত্রীলোকেরা আর সকল ক্ষমা করেন, কিন্তু যে অখ্যাতি করে তাহাকে কখন ও ক্ষমা করেন না।

স্ত্রীলোকদের হৃদয় অধিক ভাবুক এবং কল্পনাপ্রিয় সে জন্য তাঁহাদের বিচার যুক্তির দিকে দৃষ্টি নাই।

নারীজাতি তাঁহাদের পরিহিত দস্তানাতুল্য হৃদয় পরিবর্ত্তন করেন।

সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য নারীরা সকল ক্লেশই সহিতে প্রস্তুত।

হে নারী, তোমার দ্বারাই ঝটিকা উত্থিত হইয়া উহা সমস্ত মানবজাতিকে আন্দোলিত করে।

স্ত্রীজাতি সাধারণতঃ পুরুষজাতিকে অবিশ্বাস করে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোককে নহে।

স্ত্রীজাতির ভালবাসা চিরস্থায়ী। যখন পার্থিব ভালবাসা শেষ হয়, তখন তাহারা স্বর্গে আশ্রয় লয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ উপায়।*

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে প্রথমে আমাদের ভাল করিয়া জানিতে হইবে স্বাস্থ্য কি পদার্থ, এবং কিসে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। অনেকে মনে করে, মনকে উন্নত করা, মনের স্বাভাবিক বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন করাই মহৎ কার্য্য, কিন্তু শরীরের প্রতি যত্ন করা কিংবা শরীরকে ব্যাধিশূন্য রাখিবার চেষ্টা করা হীন কার্য্য তাহাতে কোন মহত্ত্ব নাই। বাস্তবিক দেখিতে গেলে

* বিক্‌টোরিয়া কলেজে প্রদত্ত ডাক্তার বিথি ফোগোর বক্তৃতার সারাংশ।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল পালন করাও আমাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদিগকে শরীর ও প্রাণ দিয়াছেন এবং এই সুন্দর জগতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের কোন অধিকার নাই অনাদর অবহেলা করিয়া শরীরকে অসুস্থ করি এবং তৎসঙ্গে মনকেও ত্যক্ত ও অসন্তুষ্ট করি। কারণ মনের সহিত শরীরের এত নিকট যোগ যে শরীর খারাপ হইলে মনও আপনাআপনি খিট্‌খিটে হইয়া যায়, কিছুই ভাল লাগে না। মন যদি খারাপ হইয়া রহিল কিরূপে মনকে উন্নত করা সম্ভব হইতে পারে? মনকে মহৎ এবং উন্নত করিতে হইলেও স্বাস্থ্য অবশ্যপ্রয়োজন। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল পালন করা সকলের পক্ষে দরকার। অনেকে মনে করিতে পারে, অর্থ বিনা স্বাস্থ্য থাকে না। শরীর ভাল রাখিতে হইলে যথেষ্ট অর্থ চাই। কিন্তু কতকগুলি সহজ উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সে উপায় গুলি আমাদের নিজের হস্তেই আছে। ১ম শরীরকে পরিষ্কৃত রাখা, ২য় গৃহ এবং বস্ত্র পরিছন্ন রাখা। ৩য়—প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইব দেহরক্ষার এই কয়েকটি নিয়ম পালন করিতে হইলে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ দেহ পরিষ্কার কিরূপে করিতে হইবে? প্রত্যহ স্নান। এদেশের লোকেরা স্নান দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত রাখেন তাঁহাদিগকে এবিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেবল শরীরে অজস্র জল ঢালিলে স্নানের প্রকৃত উপকার পাওয়া যায় না। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিয়া স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ খুব মর্দ্দন করা উচিত, তাহাতে লোমকূপ সকল পরিষ্কার হয়, শরীরের ময়লা চলিয়া যায় এবং দেহ সুপরিষ্কৃত এবং সুস্থ থাকে। নখ অত্যন্ত পরিষ্কার রাখা উচিত। নখের ভিতর অপরিষ্কার পদার্থ সঞ্চিত থাকিলে তাহা খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে উদরস্থ হইয়া বিষবৎ অনিষ্ট করে। দেহ পরিষ্কার হইবার আরও কয়েকটী প্রণালী আছে, সেই সকল উপায়ে দেহস্থ দূষিত রক্তের অংশ বাহির হইয়া যায়। উপযুক্ত পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া যাওয়া, প্রস্রাব এবং নিয়মিতরূপে মলত্যাগ করা। এই বিষয়ের উপরে সকলের বিশেষ মনোযোগ থাকা উচিত। কারণ ইহা দ্বারা দেহের ভিতরস্থ সকল জঞ্জাল ও দূষিত অংশ বাহির হইয়া যায়। বস্ত্র যাহাতে পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার জন্যও যত্নশীল থাকা উচিত। বস্ত্র অপরিষ্কার থাকিলে দেহও অসুস্থ হয়। গৃহ পরিষ্কার রাখাও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। গৃহের কোণে জঞ্জাল, দূষিত ময়লা জমিয়া থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। মধ্যে মধ্যে গৃহের সমস্ত আসবাব

নাড়িয়া চাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত। যত দরজা জানেলা আছে সমুদয় প্রতি দিন খুলিয়া দেওয়া ভাল। তাহাতে গৃহ মধ্যে বাহিরের মুক্ত বায়ু প্রবেশ করে এবং আলোক ও রৌদ্র প্রবেশ করে। সূর্য্যকিরণ দেখিতে যেমন সুন্দর আবার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও উপযোগী। আলোক দ্বারা মনে স্ফূর্ত্তি হয় এবং গৃহমধ্যে কোথায় কি জঞ্জাল মলিনতা আছে সকলই প্রকাশ করিয়া দেয়। আলোক উত্তাপে রক্তও বিশুদ্ধ হয়। দেহরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রধান উপায় যথেষ্ট বিশুদ্ধ বায়ু সেবন। বিশুদ্ধ বায়ু লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় সমুদয় দরজা জানেলা প্রতি দিন দুই তিন বার করিয়া খুলিয়া দেওয়া। এই উপায়ে গৃহমধ্যস্থ রুদ্ধ অবিশুদ্ধ বায়ু নির্গত হইয়া যায় এবং মুক্ত স্থানের ভাল বায়ু গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং নিশ্বাসের সাহত সেই বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের মধ্যে নীত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার এই কয়টি সঙ্কেত মনে করিয়া রাখিলে আমরা সহজেই তাহা পালন করিতে পারি এবং দেহকে সাধ্য মত সুস্থ রাখিতে পারি।

ধৈর্য্য।

স্বভাবতঃ নারীগণ অনেক যত্ন সাধ্য বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা ধৈর্য্যধারণে দুর্ব্বল। অধৈর্য্যবশতঃ জীবনের উচ্চ কার্য্যে অনেক সময় তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন না, অতএব ধৈর্য্যবিষয়ে আমরা কিছু কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। একটি মোহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বনে ধৈর্য্য বিষয়ে প্রবন্ধটি লিখিতে আরম্ভ করা গেল।

ধৈর্য্য মনুষ্যের প্রকৃতি। পশু ধৈর্য্যহীন। দেবতাদিগের ধৈর্য্যের প্রয়োজনাভাব, যেহেতু তাঁহারা নিষ্কাম ও পূর্ণ। পশু প্রবৃত্তির অধীন, তাহারা সর্ব্বদা প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দেবতাগণ ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কোন প্রতিবন্ধক নাই যে প্রতিবন্ধক নিবারণ করিতে তাঁহাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্য পাশবস্বভাবে প্রথম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। পান ভোজন বেশ ভূষা ও আমোদ প্রমোদের অভিলাষ তাহার মনে প্রবল। বয়ঃপ্রাপ্তি কালে এক স্বর্গীয় জ্যোতি তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, সেই জ্যোতিতে সে কার্য্যের পরিণাম দর্শন করিতে পায়, তদ্দ্বারা আপনাকে ও ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয়। বাসনার ও কামনার পরিতৃপ্তি কালে সুখ হইলেও পরিণামে মৃত্যু বুঝিতে পারে। সে জানিতে পারে যে ইহার সুখ ও আনন্দ অচিরে বিনষ্ট হয়, দুঃখ ও ক্লেশ বহুকাল থাকে। পশুদিগের এই জ্ঞান নাই। কি সে ক্ষতি করে এই জ্ঞান থাকিলেও যদি তাহা নিবারণের ক্ষমতা না থাকে তবে সেই জ্ঞানে কোন ফল হয় না। রোগী জানে যে রোগ অনিষ্ট-

কর, কিন্তু উহা নিবারণ করিবার তাহার শক্তি নাই, তাহার সেই জ্ঞানে কি ফল? পরমেশ্বর সেই প্রবৃত্তির বিরোধী একটী প্রবৃত্তি মনুষ্যের অন্তরে সঞ্চার করেন, সেই বিরোধী প্রবৃত্তি উক্ত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হয়। কুপ্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়-দিগকে যথেচ্ছ পরিচালন করিতে চাহে, সেই স্বর্গীয় ভাব তাহা হইতে মনুষ্যকে নিবৃত্ত রাখিতে চাহে, এ বলে ইহা কর, সে বলে ইহা করিও না। দুইয়ে সংগ্রাম চলে। প্রথমোক্ত প্রবৃত্তি কুপ্রবৃত্তি শেষোক্ত প্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তি পাপদৈত্যের সেনা, সুপ্রবৃত্তি ধর্ম্মের সেনা। প্রথমটি পাপের নিদান, শেষটি ধর্ম্মের নিদান। যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্থির অবিচলিত থাকে, সংসার প্রবৃত্তির সঙ্গে তাহার বিবাদ চলে, তবে এই বিরোধকে ধৈর্য্য বলা যায়। যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পাপ প্রবৃত্তিকে পরাভূত ও দূরীভূত করে, এই অবস্থাকে বিজয় বলা যায়। যে পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলে, সে পর্য্যন্ত এই সংগ্রামকে জীবনের সংগ্রাম বলা যায়। সংসার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অবিচলিত ভাবই ধৈর্য্য। যে স্থলে এই দুই সৈন্যের বিরোধের অভাব সে স্থলে ধৈর্য্য নাই। দেবতাদিগের নীচপ্রবৃত্তি নাই, সুতরাং তাঁহাদের ধৈর্য্যের প্রয়োজনাভাব। শিশু ও পশুদিগের ধৈর্য্য-শক্তি নাই। প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর এক একটি কারণ আছে। দুইটি বস্তু বিভিন্ন হইলে তাহার কারণও বিভিন্ন হয়। যে স্থানে সংগ্রাম সেস্থানে ধৈর্য্য, এবং সেই স্থানেই সংগ্রাম যে স্থানে দুই বিভিন্ন সৈন্য উপস্থিত। এই দুই সৈন্য দলের মধ্যে একদল দেবসৈন্য এক দল পাপ সৈন্য মানব হৃদয়ে প্রকাশ পায়। চিত্তক্ষেত্রে এইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই ধর্ম্মপথে প্রথম পদার্পণ।

প্রেরিত পত্র।

সুখ।

১

কোথা সুখ স্থান খুঁজিনু সদাই,
সহজে সন্ধান কোথাও না পাই,
ধনে, মানে, জ্ঞানে নৃপতিভবনে
সুখ স্থান কোথা পড়ে না নয়নে,
ধবল প্রাসাদ পর্ণের কুটীরে
নগরে প্রান্তরে গিরির গহ্বরে
করিনু কতই সুখের সন্ধান
কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান।

২

কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান
মানব করিছে সদাই সন্ধান,
অর্ণব গর্ভেতে তরঙ্গমঙ্কুল
নিবসে যথায় ভীম যাদোকুল
অনর্থের হেতু অর্থলাভ তরে
প্রবেশে আবাসে অর্ণব উদরে
করিতে তথায় তোমার সন্ধান
কে জানেরে, সুখ, কোথা তব স্থান।

৩

কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান,
করিছে মানব কোথা না সন্ধান
পৃথিবী বিবরে নির্ব্বাত প্রদেশে
বিষাণী ফণিণী যথায় নিবাসে,
প্রাণহারী বিষ-বায়ু রাশি যথা
প্রকাশে বিজ্ঞান যাহার বারতা,
করে তথা নরে তোমার সন্ধান,
কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান।

৪

কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান,
মানব করিছে কোথা না সন্ধান,
উন্নত অম্বরে, ঘন মেঘান্তরে,
উড্ডীন বিহগ যথায় বিচরে,
নর লক্ষ্যাতীত সুদূর প্রদেশে
বায়ুর প্রবাহ যথা না প্রকাশে,
সেখানেও করে তোমার সন্ধান,
কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান।

৫

কে জানে রে সুখ কোথা তব স্থান
মানব করিছে কোথা, না সন্ধান,
তরঙ্গ পূরিত সমুদ্রবাহিয়া
রাক্ষসের দেশ কেন্দ্র ভূমি গিয়া
তোমাশূন্য মরু, মেরুদেশান্তরে
অর্দ্ধ বর্ষ নিশা যথায় বিচরে
করে তথা নরে তোমার সন্ধান
কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান।

৬

কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান,
মানব করিছে কোথা না সন্ধান,
চির দাস হয়ে দাসত্বশৃঙ্খলে
দারা পুত্র কন্যা সবে অবহেলে
প্রবাসজীবনে প্রবাসী হইয়া
জীবনের ব্রত জলাঞ্জলি দিয়া
প্রবাসে করয় তোমার সন্ধান
কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান।

৭

কে জানে রে, সুখ, কোথা, তব স্থান,
মানব করিছে কোথা না সন্ধান,
মানব মানবে পাশব আচারে
সুশাণিত অস্ত্রে গৃহের দ্বারারে
নাশে অনায়াসে হীন বাসনায়,
ইন্দ্রিয়ের দাস সুরার সেবায়,
কিসে নাহি করে তোমার সন্ধান,
কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান।

৮

কে জানে রে, সুখ, কোথা তব স্থান,
ভ্রমে করে নরে তোমার সন্ধান
জানে নাক স্থান তোমার কোথায়
অনর্থের হেতু যথায় তথায়
পাগলের মত করিয়া ভ্রমণ
মনে করে সুখ—লব্ধ মান ধন
কিন্তু, সুখ, তোমা ভক্ত সাধুজনে
নিরখে নিয়ত পর্ণনিকেতনে।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।
সমস্তিপুর।